শ্রীশ্রীসারদা দেবী

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
[illegible] বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নবম সংস্করণ ঃ ১৩৭০

মুদ্রাকর ঃ
পবিত্রলাল দত্ত
প্রিন্টোগ্রাফ
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

উপক্রমণিকা

আরম্ভ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর লোকপাবনী জীবনকথা সমগ্রভাবে এই প্রথম প্রকাশিত। তাঁহার শ্রীপদে স্থানলাভের (১৪ই পৌষ, ১৩২৫) কিছুকাল পূর্ব হইতে প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার চরিতানুধ্যান ও তাঁহার আশ্রিত সন্তানগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে লেখকের মানস-পটে তাঁহার যে রূপ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাই ভাষায় প্রতিফলনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্তর্যামিনীরূপে তিনিই প্রেরয়িত্রী।

তাঁহার শিষ্য সন্তানগণের ভিতর দিয়া অনুপ্রেরণা আসে। বরিশালে ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র রায়ের নিকট স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কথা সংগ্রহ করিতে বসিয়া আপনা হইতে কিছু শ্রীশ্রীমার কথা লিখিত হইয়া যায় এবং সুরেনবাবু তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রকাশিত কথাসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য লেখককে অনুরোধ করেন। সেদিন ১৩৪১ সালের রথযাত্রা। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে রাঁচিতে গুরুভ্রাতা শ্রীসুরেন্দ্র সরকার ও শ্রীশ্রীশ ঘটকের উদ্দীপনায় অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মুখেও পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার সঙ্কল্প করা হয়।

উপাদান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীমার প্রথমার্ধ জীবনের কতিপয় মুখ্য ঘটনা সন্নিবেশিত আছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' নামক পুস্তকে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায়। জীবনী লিখিবার সময় এই পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। তজ্জন্য লেখককে কানপুর হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত নানাস্থানে গমন করিতে ও প্রায় দুইশত ভক্তের সঙ্গে মেলামেশা অথবা পত্রব্যবহার করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রশিষ্যগণের অনেকেই শ্রীশ্রীমাকে মাত্র দুইএক দিন দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার দুইএকটি উপদেশ বা দুইএকটি আচরণের কথা ছাড়া তাঁহার আর কিছুই বলিতে পারেন না। তাঁহাদের উক্তিতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অল্প। যাঁহারা মার প্রতিবেশী বলিয়া ঘনঘন তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন এবং যাঁহারা তাঁহার কাছে আসিয়া দুদশ দিন অবস্থান করিতেন তাঁহাদিগকেই তিনি নিজের জীবনের অনেক ঘটনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতেন ; কখন বা তাঁহারাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন। এই সকল কথা অল্প সময়ের ব্যবধানে লিখিত না হইলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অধিক। আমরা লিখিত ও অলিখিত দুইপ্রকার বিবরণই পাইয়াছি, এবং সম্ভবস্থলে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তি মিলাইয়া গ্রন্থের উপাদান নির্দোষ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীশ্রীমার ভাষা

শ্রীশ্রীমা দেশে অবস্থান-কালে, বিশেষতঃ দেশের লোকদের সহিত কথাবার্তায়, দেশে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে, বিশেষতঃ কলিকাতার লোকদের সহিত কথাবার্তায়, কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করিবার সময়ও উহার সঙ্গে দেশের ভাষার কতকগুলি বিশেষত্ব মিশিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। মার মুখোচ্চারিত ভাষা বিবরণদাতারা যেমন বলিয়াছেন আমরা প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি।

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র একরূপ ভাষার প্রচলন নাই। জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্য-ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

(১) জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্যভাষায় তিনকালেই ক্রিয়ার পরে 'নি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতীতকালে 'নি' ও 'নাই' দুইটি শব্দেরই প্রয়োগ আছে ; 'নি' অপেক্ষা 'নাই' শব্দের প্রয়োগ অধিক। 'নেই' শব্দের ব্যবহার একেবারেই নাই। (২) ক্রিয়ান্তে কেবল 'লুম' ব্যবহৃত হয় ; 'লেম' বা 'লাম' ব্যবহৃত হয় না। (৩) 'ভিতর' 'উপর' প্রভৃতি শব্দ অবিকৃত থাকে ; উহাদের আদ্যস্বরের গুণ হয় না। কোন কোন ক্রিয়াপদে আদ্যস্বরের বিকল্পে গুণ হয় ঃ যেমন, দিবে, দেবে। কোন কোন শব্দে অন্ত্যস্বরের বিকল্পে পরিবর্তন হয় ঃ যেমন, পুজা, পুজো ; (বহুবচনসূচক) গুলি, গুলো ; ইচ্ছা, ইচ্ছে। (৪) কতকগুলি শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে কলিকাতার মত দ্বিত্ব হয় না ঃ যেমন,—এখুনি, সবাই। (৫) কতকগুলি ক্রিয়াপদে মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ অ-কারান্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ঃ যেমন,—কুলত (কুলাইত), জুড়বে (জুড়াইবে), শুকতে (শুকাইতে), ঘুমব (ঘুমাইব), বেরয় (বাহির হয়), উঠতেন (উঠাইতেন), ফুরতে (ফুরাইতে), বুলতে (বুলাইতে)। (৬) 'কাউকে' শব্দের প্রয়োগ নাই ; 'কারুকে' বা 'কাকেও' ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত পদগুলিতেও কলিকাতাদি স্থানের সঙ্গে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে ঃ বোজাতুম (বোঝাতুম), দুফুর, জ্যোৎসনা, শীঘ্রি, অদিষ্টে, রান্তে (রাঁধতে), নপুরে (নেপুরে), গিরস্তের, ঠিঁয়ে।

সংকেতের অর্থ

গ্রন্থমধ্যে [আ], [ই] ইত্যাদি চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। [আ]=আশুতোষ মিত্র প্রদত্ত বিবরণ। [ই]=ইন্দুমতী দেবী-প্রদত্ত বিবরণ। [উ]=উমেশ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণ। [গ]=গণেন্দ্রনাথের সংগ্রহ ; বা গণেন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবরণ। [ত]=তপানন্দ-প্রদত্ত বিবরণ। [ধ]=ধর্মানন্দস্বামীর সংগ্রহ। [ন]=নলিনবিহারী সরকার-প্রদত্ত বিবরণ। [নি]=নিকুঞ্জদেবী-প্রদত্ত বিবরণ।* [প্র]=প্রভাকর মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত বিবরণ। [বি]=বিভুতিভূষণ ঘোষ-প্রদত্ত বিবরণ। [ম]=মহাদেবানন্দ-প্রদত্ত বিবরণ। [স]=সৎসঙ্গানন্দ-প্রদত্ত বিবরণ। [সু]=সুরেন্দ্র সরকার-প্রদত্ত বিবরণ। [দি]=স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি। [পুঁ]=শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি। [লী]=শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

---

* নিকুঞ্জদেবী-প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ কথামৃতকার 'শ্রীম' কর্তৃক শ্রুত-লিখিত। উহা শ্রীম-লিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সুরেন্দ্র সরকার, নলিনবিহারী সরকার, বিভূতিভূষণ ঘোষ, উমেশ দত্ত ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচটি পূর্ণনামের পরিবর্তে সুরেন্দ্রবাবু, নলিনবাবু, বিভূতিবাবু, উমেশবাবু ও প্রবোধবাবু লেখা হইয়াছে।

চরিত্রাংকনের ধারা

শ্রীশ্রীঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমার জীবনেও মানবসুলভ বা লৌকিক এবং দেবত্বের সূচক বা অলৌকিক ঘটনাবলী পাশাপাশি বিদ্যমান। মানবভাবের প্রাধান্য সত্ত্বেও মানবীয় আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দেবস্বরূপ যেখানে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত, লৌকিক ও অলৌকিক মধুর সামঞ্জস্যে সম্মিলিত, মানুষ দেবতাকে ও দেবতা মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া অভিন্ন মূর্তিতে প্রতিভাত, সেখানে আলৌকিক ব্যাপার ছাঁটিয়া বাদ দিয়া কেবলমাত্র লৌকিক ব্যাপার লইয়া চরিত্রাঙ্কন-চেষ্টা অস্বাভাবিক। ঐরূপ চেষ্টার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াও মনে হয় না। শ্রীশ্রীমার লীলা বর্ণনা করিবার কালে আমরা অনেকস্থলে তাঁহার দেব-মানব রূপটি দেখিতে পাইয়াছি এবং লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পদানুগ হইয়া উহাই দেখাইতে চাহিয়াছি।

শেষ কথা

এই গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার অনেক ত্যাগী ও গৃহী সন্তানের উদ্যম জড়িত। মার উপর ঐকান্তিক ভক্তি-ভালবাসার জন্যই তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে লেখককে সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে মার সেবক-সন্তান শ্রীগণেন্দ্রনাথ ও শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুহৃদ্বর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী বিচার করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর তিরোভাবের সতর বৎসর পরে (১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৪) এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার আবির্ভাবের শততম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার মুখে যখন ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল তখন পর্যন্ত তাঁহার অপর কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছিল না। তাঁহার শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সতর বৎসর পরে, কয়েকখানি জীবনচরিত বা তজ্জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাদের প্রায় সকলগুলিতেই এই গ্রন্থখানিকে অন্যতম আকরগ্রন্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

এই সংস্করণে অনেক নূতন উপাদান সন্নিবেশিত করিয়াছি। কতকগুলি বিতর্কিত বিষয়ে আমার যাহা নিশ্চিতরূপে জানা ছিল তাহাও বলিয়াছি। মায়ের অশেষ করুণায় বহু বাধা অতিক্রম করিয়া, অন্যূন ত্রিশ বৎসরের অনুধ্যানের ফলাফল দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে আজ দায়মুক্ত জ্ঞান করিতেছি। নিবেদনমিতি—

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৭২ — গ্রন্থকার।

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

প্রথম অধ্যায়

জয়রামবাটী

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্বর্তী গ্রাম জয়রামবাটী পল্লীলক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি। এই অঞ্চলের ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামগুলির মধ্যে ইহা সমধিক শস্যপূর্ণ ও জনাকীর্ণ। বাঁকুড়ার বহু স্থান পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষকবলিত হইয়াছে, কিন্তু জয়রামবাটীকে মোটা ভাতকাপড়ের অভাবগ্রস্ত হইতে কখনও দেখা যায় নাই।

গ্রামের উত্তরাংশে একখানি ছোট মাঠ; তাহাতে রবিশস্য, ইক্ষু, গম ও বিবিধ শাকসব্জি উৎপন্ন হয়। মাঠখানি পার হইয়া গেলে দেখা যায়, স্বচ্ছসলিল নদ 'আমোদর' উত্তরদিক্ হইতে আসিয়া জয়রামবাটীর সন্নিকটে পূর্বাভিমুখে বাঁকিয়া গ্রামের উত্তরসীমা নিরূপণ করিতেছে। নদের ওপারে দেশড়া নামে বৃহৎ গ্রাম। পশ্চিম বাঙ্গলার অনেক ছোট নদীই মজিয়া আসিলেও এই স্বল্পপরিসর নদটি আয়তনের তুলনায় গভীর, বারমাসই তাহাতে জল থাকে। শ্রীশ্রীসারদামাতা বালিকাবয়সে ছোটছোট ভাইদিগকে সঙ্গে নিয়া এই আমোদরে 'গঙ্গাস্নান' করিতে আসিতেন। ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকার ধূলিলুণ্ঠিত বস্ত্রাঞ্চলের মত আমোদর এমনই বিচিত্র ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির উত্তর প্রান্তেই দুইটি রমণীয় উপদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্বোত্তর কোণের উপদ্বীপটি কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশান। উহা বট-অশ্বত্থ-আম্রাদি-বৃক্ষসমাকীর্ণ হওয়ায় ছায়ানিবিড় এবং বকুল-গুলঞ্চাদি-পুষ্প-গন্ধে আমোদিত। শ্রীসারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) মাতৃদর্শনে আসিয়া এই শ্মশানের কেন্দ্রস্থলে অধুনালুপ্ত আমলকীবৃক্ষের তলায় ধ্যানমগ্ন হইতেন।

জয়রামবাটীর পূর্বদিকে আমোদরের অপর পারে তাজপুর নামে গ্রাম; দক্ষিণে জিবট্যা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মসিনাপুর, পশ্চিমে শিহড়। ঐ সকল গ্রামের কোনটিই জয়রামবাটী হইতে এক মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। জয়রামবাটীর নিজস্ব কোন হাট না থাকায় কায়িক পরিশ্রমে নিজেদের জমিতে উৎপন্ন যৎসামান্য তরিতরকারিতেই গ্রামের লোক সন্তুষ্ট থাকে। কদাচিৎ বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে হইলে তাহাদিগকে সাড়ে তিনক্রোশ উত্তরে কোতুলপুর, তিনক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়াপাট, কিংবা দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে কামারপুকুর যাইতে হয়। কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান—পুণ্যভূমি।

জয়রামবাটীকে কেন্দ্র করিয়া অদূরবর্তী অনেকগুলি গ্রাম শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার একতরের কিংবা উভয়েরই স্মৃতিচিহ্ন বুকে লইয়া ধন্য হইয়া আছে। তন্মধ্যে আনুড়, শ্যামবাজার, শিহড় ও কোয়ালপাড়া প্রধান। গ্রামস্থ ভক্তিমতী মেয়েদের সঙ্গে আনুড়ে ৺বিশালাক্ষী-দর্শনে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বালক শ্রীগদাধর দেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনরঙ্গ—উহার আকর্ষণী শক্তি দেখিতে অভিলাষী

হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবাজারে সাত অহোরাত্র সংকীর্তনবিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন। শিহড়ে ঠাকুরের পিসতুত ভগিনীর বাড়ী এবং মার মাতুলবাড়ী থাকায় বাল্যাবধি উভয়েরই তথায় বহুবার গমনাগমন হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর হইয়া কলিকাতায় যাওয়ার বা কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে মা কোয়ালপাড়ায় বিশ্রাম করিতেন; তিনবার সেখানে কিছু অধিককাল বাসও করিয়াছিলেন। কোয়ালপাড়া তাঁহার 'বৈঠকখানা'।

আয়তনে জয়রামবাটী বড় না হইলেও এবং উহাতে জমিদার বা তেমন ধনী লোকের বাস না থাকিলেও গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব ছিল না। এখনও চব্বিশপ্রহরীয় বা অষ্টপ্রহরীয় হরিবাসরে এবং বারোয়ারী কালীপূজা, শীতলাপূজা ও দুর্গাপূজায় গ্রামের লোক যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে; এবং সম্ভব হইলে সকলে মিলিয়া যাত্রাগানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যাত্রাগান শুনিবার জন্য মাদুর-বগলে গ্রামান্তরে যাওয়ার প্রথা জনসাধারণের মধ্যে আজও অব্যাহত আছে।

জয়রামবাটীর যাত্রাসিদ্ধিরায় নামক ধর্মঠাকুরের মন্দির এক সময়ে ঐ অঞ্চলে ধর্মপূজার প্রভাব বিজ্ঞাপিত করে। যাত্রাসিদ্ধিরায় ও সুন্দরনারায়ণ নামে আর এক ধর্মঠাকুর প্রাচীনকাল হইতে এখানে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সুন্দরনারায়ণ গ্রামস্থ মুখুজ্যে-গোষ্ঠীর কুলদেবতা বলিয়া কথিত হন।

জয়রামবাটীর অপর দেবতা ৺সিংহবাহিনী এখন লোকবিশ্রুতা। তিনটি ছোট প্রতীকবিগ্রহে বিরাজিতা এই দুর্গাদেবী ভক্তগণের সংকল্পিত পূজাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সর্বোপরি, শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানের উপর ইষ্টকনির্মিত বৃহৎ মন্দিরের দুগ্ধধবল চূড়া ও সেই চূড়ার শিখরদেশে 'মা'-নামাঙ্কিত নিশান বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া সকলকে আজ জয়রামবাটীর মহাপীঠত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দূরদূরান্তর হইতে, এমনকি সুদূর আমেরিকা হইতেও, তীর্থযাত্রীর দল যানবাহনাদির অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া জয়রামবাটীর পূতমৃত্তিকা-স্পর্শে ধন্য হইবার বাসনায় ছুটিয়া আসিতেছে। যাঁহার আবির্ভাবভূমি বলিয়া, যাঁহার দিব্য লীলাবিলাসের অক্ষয় স্মৃতিসমূহ চিত্তলোকে সঞ্চিত রাখিয়াছে বলিয়া জয়রামবাটী চিন্ময়ধামরূপে ভক্তমানসে স্ফুরিত হইতেছে সেই মানবীরূপা দেবীর চরণপদ্মে বারবার প্রণত হইয়া তাঁহার জন্মাদি কথা যথাশক্তি বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্মকথা

জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে স্বধর্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।[১] পুরুষানুক্রমে রামমন্ত্রের উপাসক রামচন্দ্রের স্বীয় ইষ্টে ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। তিনি দরিদ্র হইলেও পরোপকারী এবং নিরতিশয় নিরভিমান ছিলেন। শিহড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্যামাসুন্দরী সর্বগুণে স্বামীর অনুরূপা ছিলেন। তাঁহার নির্মলচরিত্র ও দৃঢ়চিত্ততার কাহিনী এখনও জয়রামবাটীর লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই দরিদ্র অথচ পরমভক্ত মাতাপিতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া শ্রীমতী সারদা সংসারে আগমন করেন। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বীয় পিতামাতার গুণাবলী এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন ঃ আমার বাবা পরমভক্ত ছিলেন, পরোপকারী। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন, নৈষ্ঠিক। মার কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন কত্তেন। কত সরল!

---

১ রামচন্দ্রের বংশধারা নিম্নোক্তরূপ ঃ

মুখুজ্যে ব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকাল হইতে জয়রামবাটী গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণুপুরের রাজার দানপত্র দেখিয়া এইচ্. ডসন্ সাহেব নিষ্কর জমি ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ছাড় ও তায়দাদ করিয়া দেন সেই সকল হইতেই ইহা সপ্রমাণ। গ্রামের বাড়ুজ্যে ব্রাহ্মণেরা মুখুজ্যেদের দৌহিত্রবংশ।

ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব নামে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তিন সহোদর তাঁহার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীলমাধব অবিবাহিত।

শ্রীমতী সারদার জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি এইরূপ: এক সময়ে শিহড়ের উত্তরপাড়ায় পিত্রালয়ে অবস্থান-কালে শ্যামাসুন্দরীর খুব পেটের অসুখ করে। তিনি তথাকার এল্লা-পুকুরের পাড়ে শৌচে যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি স্থান-নিরূপণ করিতে না পারিয়া একটি বেলগাছের তলায় বসিয়া পড়েন। ঐ বেলতলার ঈষৎ ব্যবধানে গ্রামের কুমারদের একটি পোয়ান ছিল, এখনও আছে। শ্যামাসুন্দরী শুনিতে পাইলেন সেই পোয়ান হইতে ঝন্ঝন্ করিয়া শব্দ উঠিল; আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন বেলগাছ হইতে একটি কচি ছোট মেয়ে লাফাইয়া পড়িয়া বাহুপাশে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান। অনেকক্ষণ পরে খুঁজিতে গিয়া সকলে তাঁহাকে বেলতলায় পড়িয়া আছেন দেখিতে পায়। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী অনুভব করিলেন মেয়েটি তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।[২]

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে রামচন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা-গমনের সঙ্গেও অনুরূপ এক ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর সংসারের অভাব অনটনের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, একটি ছোট হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পিঠের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। বালিকার রূপ ও হাতের মূল্যবান অলংকার তাহার অসাধারণত্বের পরিচয় দিতেছিল। শান্তস্বরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে গো তুমি? মেয়েটি কোমলকণ্ঠে কহিল, এই আমি তোমার কাছে এলুম! ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে তাঁহার মনে হইল মা-লক্ষ্মী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন। এই সময়ে অর্থার্জনের চেষ্টা সফল হইবে ভাবিয়া তিনি কলিকাতায় যাওয়ার সংকল্প করেন।[৩]

---

[২] শ্রীশ্রীমার ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী দেবীর নিকট ঘটনাটি যেমন শুনিয়াছি সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইন্দুমতী তাঁহার শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বারবার শুনিয়া ইহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। সুশীলা দত্ত বলেন: একদিন সন্ধ্যার পর আমি মার পায়ে তেল মালিশ করিতেছি এমন সময়ে নলিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বলিল,—পিসীমা ঠাকুরকে লোকে ভগবান বলে আর ভগবান বলে শ্রদ্ধাভক্তিও করে: তা না হয় মানলুম—শুনেচি যে, তাঁর মার গর্ভে হাওয়া ঢুকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে লোকে এত দেবতা বলে মান্য করে কেন? মা বলিলেন,—আমার মা আমার মামার বাড়ীতে বেলতলায় শৌচে যান। সেই সময় দেখেন এক ছয়সাত বছরের পরমাসুন্দরী কন্যা বেলগাছে ঝুলচে। দেখেই মা বসে পড়েন। কন্যাটি বেলগাছ থেকে নেমে এল: মা আর কন্যাটিকে দেখতে পেলেন না, তাঁর মনে হল একটা হাওয়া তাঁর গর্ভে ঢুকেচে। তখন তিনি অচৈতন্য হয়ে যান।

[৩] শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার মুখে শ্যামানন্দ ইহা শুনিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীমার কাছে শুনিয়াই নীচে প্রসাদ দিতে আসিয়া গোলাপ-মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ব্রাহ্মণের কিরূপ অর্থাগম হইয়াছিল বলিতে পারি না। গৃহে ফিরিয়া তিনি পত্নীর দর্শন ও অনুভবের কথা অবগত হন। ঘটনা অভাবনীয় হইলেও তাঁহার সরলবিশ্বাসী ভক্তিপ্রবণ চিত্ত ইহাতে কোন সন্দেহ করিল না। ঈশ্বরের বিধান মানুষের অজ্ঞেয় ও অলঙ্ঘনীয় জানিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী দেহসুখে উদাসীন হইলেন এবং ভক্তিপূতহৃদয়ে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে দেব-সন্তানের জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন অপগত হইয়া গর্ভসঞ্চারের কাল হইতে দশমাস পূর্ণ হইয়া আসিল, হেমন্তের অবসানে শীতের কুজ্ঝটিকায় দশদিক আবৃত হইল দেখিয়া গর্ভাশ্রিতা দেবীও স্বরূপ গুণ্ঠিত করিয়া ধরাতলে অবতরণের উদ্যোগ করিলেন। সন ১২৬০ সাল বা ১৭৭৫ শকাব্দে, সৌর পৌষের অষ্টম দিনে, গুরুবারে মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল সময়ে অতিশুভক্ষণে শ্যামাসুন্দরী এক দিব্যলক্ষণা সুকুমারী প্রসব করিলেন। রামচন্দ্রের কুটীর মঙ্গলধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির ঘরে ঘরে সেই শুভবার্তা বিজ্ঞাপিত করিল।

অনন্তর বিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া রামচন্দ্র জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া কন্যার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইলেন।[৪] লগ্নাদি নিরূপণান্তে তাঁহার রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীমতী ঠাকুরমণি দেবী এবং লোকপ্রচলিত নাম শ্রীমতী সারদা রাখিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী কন্যার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

---

[৪] মূল কোষ্ঠীতে শ্রীশ্রীমার সাধারণ নাম 'সারদাসুন্দরী' লেখা ছিল। পরবর্তীকালে 'সুন্দরী' স্থলে 'মণি' ব্যবহৃত হয়। নামের এই মধ্যবর্তী অংশ আমরা অনতি-প্রয়োজনীয় মনে করি।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহ

শ্রীমতী সারদার অলৌকিক জন্ম-ঘটনা অপরের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার না করিলেও তাঁহার মাতাপিতার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। উহা তাঁহাদের বাৎসল্যরতিকে ভক্তিমিশ্রিত করিয়া এক নূতন আকার দান করিয়াছিল। ইহার ফলে, রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী অনেক সময় বিস্মিতনেত্রে কন্যার মুখপানে তাকাইয়া কত কী ভাবিতেন; কিন্তু পরক্ষণেই অপত্যবাৎসল্য এবং সংসারের শত তাড়না আসিয়া তাঁহাদিগকে সকল কথা ভুলাইয়া দিত। মায়িক জগতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কন্যার প্রতি রামচন্দ্র আজীবন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন শুনা যায়। আর শ্যামাসুন্দরী শেষ বয়সেও কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কতবার বলিয়াছেন,—মাগো, তুই যে আমার কে মা, আমি কি তোকে চিনতে পাচ্ছি না?' কন্যা তাহাতে বাহ্যিক বিরক্ত প্রকাশ করিয়া উত্তর দিয়াছেন,—কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েচে? তা হলে তোমার কাছে আসব কেন? যদি বা গর্ভধারিণী কখনও বলিতেন, সারদা, তোমার মতন আমার যেন একটি মেয়ে হয় মা, স্বামীর ধন থাকবে, ছেলেপুলে নিয়ে বড় জ্বালাতন! তাহাতেও কন্যা রাগিয়া উত্তর দিতেন, আবার আমাকে টানচ? তোমার ছেলেপুলে আমি আবার এসে মানুষ করি' তথাপি গর্ভধারিণী পুনঃপুনঃ বলিতেন, তোমাকেই যেন আবার আমি পাই মা! [ই]

খুল্লতাত নীলমাধব শ্রীমতী সারদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করেন। অবিবাহিত নীলমাধবের সংসারে অন্য অবলম্বন না থাকায় এই ভ্রাতুষ্পুত্রী বিশেষভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

মুখুজ্যেদের তুলার চাষ ছিল। শ্যামাসুন্দরী তুলার ক্ষেতের মধ্যে বালিকাকে—পরবর্তী কালে অন্যান্য সন্তানদিগকেও—শোয়াইয়া রাখিয়া নিজে তুলা তুলিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রীমতী সারদার স্বভাবের এক অপরূপ স্বতন্ত্রতা বিকশিত হইয়া উঠিল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে চঞ্চলা হইয়া খেলাধুলা করিতে তাঁহার তেমন আগ্রহ দেখা যাইত না। বালিকা যেন আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণা—আপনাতেই আপনি বিভোরা! শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: আমার যখন খুব কম বয়েস সে সময় আমি একলা থেকে যখন যে কাজ কত্তুম, ঠিক আমারই মতন আর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ কত্ত—হাসত, তামাসা কত্ত; কিন্তু অন্যলোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল। [উ][1]

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়া শ্রীমতী সারদা ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তৎকালে ঐ দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

---

[1] ঠাকুর তাঁহার সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে নিজের অনুরূপ আকারবিশিষ্ট এক যুবক-সন্ন্যাসীর দেখা পাইতেন। ঐ সন্ন্যাসিমূর্তি তাঁহার ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিতেন।

উপযুক্ত সম্বন্ধ আসিলে বালিকাকে পাত্রস্থা করিতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না, বিধিনির্বন্ধে উপযুক্ত সম্বন্ধ আসিতেও বিলম্ব হইল না।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এই সময়ে শ্রীগদাধরের দ্বাদশ বৎসর-ব্যাপী সাধনার প্রথম পাদ অতীত হইয়াছে ; এবং ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা ও তন্নিবন্ধন কার্যগুলি সংসারী লোকের চক্ষে বায়ুরোগীর আচরণবৎ প্রতীত হইয়া কামারপুকুরে অতিরঞ্জিত আকারে জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণির কর্ণে পৌঁছিয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের বিয়োগদুঃখ অপগত হইতে না হইতে অতি আদরের কনিষ্ঠপুত্র বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না : পুত্রকে তিনি কামারপুকুরে আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহার রোগশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক হইতে আরম্ভ করিয়া ওঝা আনাইয়া চণ্ড-নামানো পর্যন্ত লোক-প্রচলিত অনুষ্ঠানসকল একে একে করাইয়া যাইতে লাগিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া জগন্মাতার প্রায় নিত্য দর্শনাদি লাভ হইতে থাকায় গদাধরও ক্রমশঃ সুস্থির ভাব ধারণ করিলেন।

সাংসারিক সকল বিষয়ে একান্ত উদাসীনতাই গধাধরের বায়ুরোগের প্রধান কারণ মনে করিয়া মাতা চন্দ্রমণি ও মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর এখন তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। মাতাপুত্র গোপনে পরামর্শ করিয়া সকল বিষয় স্থির করিলেও গদাধরের উহা জানিতে বিলম্ব হইল না। আপত্তি করার পরিবর্তে তিনি আনন্দই প্রকাশ করিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া মনোমত পাত্রীর অন্বেষণে ব্যর্থকাম ভ্রাতাকে পাত্রীর সন্ধানও বলিয়া দিলেন : 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্‌গে যা।' শ্রীগদাধরের স্বয়ং পাত্রীনির্বাচনের কথায় শ্রীমতী সারদার শৈশবের একটি কৌতুকাবহ ঘটনা মনে পড়ে :

> একবার প্রভুদেব হৃদয়ের ঘরে ।
> অনেক গায়ক তথা গায় একদিন ।
> শুনে জুটে নরনারী নবীন প্রবীণ ॥
> নারীদের মধ্যে এক কন্যা করি কোলে ।
> শুনে গান এক সঙ্গে নারীদের দলে ॥
> ... ...
> অল্পবয়াঃ শিশুমেয়ে কোলে ছিল যার ।
> গীত সমাপনে এক আত্মীয় তাঁহার ॥
> আদরে কহিলা বালিকায় সম্বোধিয়া ।
> এত লোক – কারে চাহ করিবারে বিয়া ॥
> অমনি দেখান বালা তুলি দুই করে ।
> সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধরে ॥ [পুঁ:]

অল্পদিনের মধ্যেই বিবাহের সকল কথা স্থির হইয়া গেল এবং শুভদিনে শুভক্ষণে রামেশ্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জয়রামবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন

করাইলেন। বিবাহে কন্যাপক্ষকে তিনশত টাকা পণ দিতে হইল। তখন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগ; শ্রীগদাধর চতুর্বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহকালের আর একটি ঘটনা:

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে ঘবে বরে ঘেরে রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কী হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সূতা॥
হরিদ্রা-মাখান সূতা ছিল বাঁধা হাতে।
... ...
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন॥ [পু°]

যথাকালে বরবধূকে লইয়া রামেশ্বর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, চন্দ্রমণিও বিদ্যারূপিণী বধূর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনে স্বস্তি অনুভব করিলেন। বরবধূকে দর্শন করিবার জন্য প্রতিবেশী ও স্বজন-সমাগমে কামারপুকুরের দরিদ্র সংসারখানি আজ আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কেবল একটি চিন্তা সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া চন্দ্রমণির মাতৃহৃদয়কে ব্যথাভারাক্রান্ত করিতে লাগিল। বিবাহের দিনে সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রতিবেশী জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ী হইতে কয়েকখানা অলংকার চাহিয়া নিয়া নববধূকে সাজাইতে হইয়াছিল, এখন সেগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। কন্যাপ্রতিম বালিকার অঙ্গ হইতে কোন্ প্রাণে অলংকার উন্মোচন করিবেন ভাবিয়া বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল। মাতার মনোবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে মাতৃভক্ত পুত্রের বিলম্ব হইল না; চতুর-গদাধর নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে এমন কৌশলে অলংকারগুলি খুলিয়া নিলেন যে তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। বালিকা জাগ্রত হইয়া অলংকারের অন্বেষণ করিতে থাকিলে চন্দ্রমণি তাঁহাকে কোলে বসাইয়া সাশ্রুনয়নে সান্ত্বনাপূর্বক কহিলেন, মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল অলংকার পরে কত দেবে।[২] কন্যার খুল্লতাত বালিকাকে দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিতে পারিলেন এবং বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া সেইদিনই জয়রামবাটীতে প্রস্থান করিলেন।

মাতার আগ্রহে ঠাকুর দুই বৎসরের অধিক কাল কামারপুকুরে বাস করেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়া দ্বিতীয়বার শ্বশুরগৃহে যান। সাত বছরের বালিকা বধূ তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর পদ-প্রক্ষালন ও অঙ্গে বাতাস করিয়াছিলেন।[৩] কয়েকদিন তথায় থাকিয়া ঠাকুর পত্নীর সহিত 'জোড়ে' কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন এবং পুনরায় সাধনসমুদ্রে

---

[২] ঠাকুর তাঁহার জননীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

[৩] পরবর্তী কালের অনুরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: জয়রামবাটীতে যখন ছিলুম তখন উনি এলেন; আমাকে বল্লেন, সাজিমাটি দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো। তা দেওয়াতে অন্য মেয়েরা বলাবলি কত্তে লাগল,—ওমা, সারদার কী গো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হল না, তবু দেখ! [নি]

ডুবিয়া গিয়া সংসারের সকল বিষয় এককালে ভুলিয়া যান। আর শ্রীমতী সারদা জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহে থাকিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ হইতে থাকেন।

বিবাহের কথায় শ্রীশ্রীমা পরে বলিয়াছিলেন: খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নাই।…যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েচি। ধর্মদাস লাহা এসে বল্লে, এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েচে? সুজুর বাপ (ঈশ্বর মুখুজ্যে) কোলে করে আমাকে কামারপুকুরে নিয়ে গিয়েছিল।[৪]

"হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল' আনিয়া হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল।" [লী]

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

চতুর্থ অধ্যায়

পিতৃগৃহে শিক্ষা

পল্লীগ্রামে দরিদ্র ঘরের বালিকারা অল্পবয়সেই রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকর্মে নিপুণা হইয়া উঠেন, শ্রীমতী সারদার জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাত্যহিক গৃহকর্মে মাতাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে এবং মাতা রন্ধন করিতে অপারগ হইলে স্বহস্তে উহা নিষ্পন্ন করিতে তিনি শৈশবেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও অপরিণত কচি হাত দুইখানিতে ভাতের হাঁড়ি উত্তোলন করিবার শক্তি না হওয়ায় পিতাকে উহা নামাইয়া দিতে হইত। তাহা ছাড়া, ক্ষেতে মুনিষদিগকে মুড়িগুড় জলখাবার দিয়া আসা, আকণ্ঠ জলে নামিয়া গরুর জন্য দলঘাস কাটা[1], তুলার ক্ষেত হইতে জননীর সঙ্গে তুলা সংগ্রহ করা, এই সকল কাজও তিনি বয়ঃসুলভ আনন্দের সহিত করিতেন। এক বৎসর পঙ্গপাল সমস্ত ধান নষ্ট করিয়াছিল, সকলের সঙ্গে ক্ষেত্রপতিত সেই শস্য তিনি কুড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, ক্ষেত থেকে তুলো এনে আমরা কত পৈতে কেটেচি, আজকালকার মেয়েরা কি আর অত কষ্ট করবে! [ন] স্বদেশী যুগে কতিপয় যুবক মিলিয়া কোয়ালপাড়ায় তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করিলে মা বলিয়াছিলেন, আমারও ইচ্ছে হয় একটা চরকা পেলে সুতো কাটি; তখন তো কাপড় সব ঘরেই তৈরী হত।

শ্রীমতী সারদা সামান্যভাবে সন্তরণ-শিক্ষা করিয়াছিলেন। মা, আপনি সাঁতার জানেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে জয়রামবাটীতে বলিয়াছিলেন, একটু একটু জানি; এখানে আর কামারপুকুরে ছেলেবেলায় ঘড়া নিয়ে একটু আধটু সাঁতার দিয়েচি। [আ]

শ্রীমতী সারদার জন্মের পরে রামচন্দ্রের কাদম্বিনী নামে কন্যা এবং প্রসন্ন, উমেশ, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।[2] অধিকাংশ সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই তাঁহার ছোট ছোট ভাইগুলির দেখাশুনা করিতে হইত। এই ভাইগুলি তাঁহাদের দিদির কিরূপ স্নেহযত্নে মানুষ হইয়াছিলেন তাহা পরিণত বয়সেও তাঁহাদের প্রতি শ্রীশ্রীমার আচরণ দেখিয়া বুঝা যাইত।

তখন স্ত্রীশিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকায় শ্রীমতী সারদা বিদ্যাশিক্ষার ততটা সুযোগ পান নাই, কিন্তু আজীবন তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ দেখা গিয়াছে। অরূপানন্দ শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কখন কখন রামায়ণ পড়তে দেখি; পড়তে কবে শিখলে? তাহাতে মা বলিয়াছিলেন: ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায়

---

[1] স্বামী ধীরানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: দলঘাস কাটবার সময় দেখতুম, আমারই সমান বয়েসী আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দল কাটচে। একটি দল কেটে ওপরে রেখে এসে যেই আর একটা কাটতে যাব, দেখতুম সেটি আগে থেকে কাটা হয়ে রয়েছে। মেয়েটি কে, কিছুই বুঝতে পারিনি।

[2] উমেশ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। কাদম্বিনীর কোকন্দ গ্রামে সুধারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল; অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান।

যেত ; ওদের সঙ্গে কখন কখন একটু আধটু পড়তুম। তাইতে একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী[৩] আর আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগ্নে[৪] বই কেড়ে নিলে। বল্লে, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নাই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে? লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না—ঝিউড়ী-মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার লুকিয়ে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত, সে এসে আবার আমাকে পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে ; ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্যে শ্যামপুকুরে। একলা একলা আছি, ভব-মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে : সে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পড়া নিত ও দিত। আমি তাকে শাকপাতা বাগান থেকে যা আমার এখানে দিত তাই খুব করে দিতুম।

শ্রীশ্রীমার নিজের উক্তি হইতেই উপলব্ধি হয় যে, বিদ্যাশিক্ষার কোন সুযোগই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। তিনি মুদ্রিত গ্রন্থ সুন্দর পড়িয়া যাইতে এবং অনায়াসে অনেক দুরূহ শব্দের অর্থবোধ করিতে পারিতেন। ১৩১৯ সালে যখন মা ৺কাশীতে ছিলেন সেই সময় একদিন বিভূতিবাবু তাঁহাকে গীতার দশম অধ্যায় পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং' -এই কথা পড়িবামাত্র মা নিজেই বুঝাইয়া দিলেন—মার্গ-শীর্ষ মানে অগ্রহায়ণ।[৫]

---

[৩] ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা।

[৪] হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

[৫] 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' পুস্তকে লিখিত আছে, ঠাকুরের ব্যবস্থায়, বাগানের কর্মচারী পিতাম্বর ভাণ্ডারীর এগার বছরের ছেলে শরতের সাহায্যে, লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীশ্রীমা দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং সামান্য লিখিতেও পারিতেন। নিজের বিদ্যাশিক্ষা-প্রসঙ্গে মা শরতের নামোল্লেখ না করায় মনে হয়, তাহার সাহায্য লক্ষ্মীদেবী যতটা পাইয়াছিলেন অবসরাভাবে মা ততটা পান নাই। মা লিখিতে শিখিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন ; পরবর্তী জীবনে কখনও তাঁহাকে লিখিতে দেখা যায় নাই। অথবা লিখিতে জানিলেও তিনি লিখিতেন না। তাঁহার আত্মগোপন এতই স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁহার অনেক আচরণের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া মহৎ ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত হইতেন। তাঁহাকে টাকা পয়সা মুঠা করিয়া দিতে ও নিতে দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে, মা গণিতে জানেন না। এই সিদ্ধান্ত যে সর্বাংশে সমীচীন নহে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। প্রখর গ্রীষ্মে বর্ধমান হইতে কিছু কাঁচামিঠা আম সঙ্গে নিয়া এক ভক্ত কলিকাতায় আসিয়াছেন ; মা তাঁহাকে জলে ভিজানো ভাত খাইতে দিয়া আমগুলি গণিতে বসিলেন। ১, ২, ৩ করিয়া যেমন ৬ পর্যন্ত গণনা হইল অমনি ভুল হইয়া গেল। আবার গণিতে সুরু করিলেন, আবার ভুল। শেষে যেন নিরুপায় হইয়াই বলিলেন, বাবা, তুমি গুণে দাও। [বি] জয়রামবাটীতে মা স্মিতমুখে অপর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা ছয় গণ্ডায় কত হয়? ছয় গণ্ডায় চব্বিশ হয় মা!—এই উত্তর শুনিয়া ছোট মেয়ের মত হাসিতে থাকেন। [উ] প্রত্যেক শিষ্যকেই তিনি করে জপসংখ্যা রাখার বিধি (১০ × ১০ + ৮) দেখাইয়া দিয়াছেন। নিজের জপসংখ্যা, বিশেষতঃ লক্ষজপের সংখ্যা তিনি কিভাবে রাখিতেন সেকথাও চিন্তনীয়।

বাঙলার পল্লীগ্রামে তখন যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদির খুব প্রচলন ছিল। গ্রামসুদ্ধ লোক একত্র হইয়া পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রা ও কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিত। শ্রীমতী সারদাও মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া শুনিতেন; একাগ্রমনে শুনিবার ফলে অনেক শ্লোক (ছড়া) তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও নৈতিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইলে তিনি ঐসকল শ্লোক অবিকল আবৃত্তি করিতেন।

দরিদ্র হইলেও ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রের সংসারে দয়ার অভাব ছিল না; আর ঈশ্বরে নির্ভর থাকায় কার্যকালে ভবিষ্যতের চিন্তা আসিয়া দয়ার পথ রোধ করিয়াও বসিত না। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: একবার [১২৭১] সেখানে কী দুর্ভিক্ষই হল, কত লোকই যে না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ী আসত। আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। বাবা সেইসব ধানে চাল করিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন—এই বাড়ীর সবাই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে; আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে, সে আমার তাই খাবে। এক এক দিন এমন হত, এত লোক এসে পড়ত যে, খিচুড়িতে কুলত না। তখনি আবার চড়ান হত। আর সেই গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শিগ্গির জুড়বে বলে আমি দুহাতে বাতাস কত্তুম। আহা, ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে![৬]

শ্রীমতী সারদার জন্য স্বতন্ত্র অন্নের ব্যবস্থা তাঁহার প্রতি পিতার বিশিষ্ট স্নেহের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। বীজনরতা বালিকা-মূর্তির অন্তরালে এক পরদুঃখকাতরা মাতৃমূর্তি আমাদিগকে চকিতে দেখা দিয়া মুগ্ধ করে। পরবর্তী জীবনে স্বয়ং পাখা-হাতে কাছে বসিয়া শ্রীশ্রীমা কত গ্রীষ্মতপ্ত সন্তানকেই না পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইয়াছেন।

---

৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে সংকলিত।

পঞ্চম অধ্যায়

পতিসন্দর্শন ও দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বিবাহের পর শ্রীশ্রীমা একবার মাত্র স্বামীর দর্শন পাইয়াছিলেন; তিনি তখন নিতান্ত বালিকা। তারপরে তের ও চৌদ্দ বছর বয়সে পরপর দুইবার তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন এবং প্রথমবারে একমাস ও দ্বিতীয়বারে দেড়মাস তথায় বাসও করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। এই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২২ সালের ভাদ্রমাসে মা যখন জগদম্বা-আশ্রমে[১] ছিলেন সেই সময় একদিন আরতির পর দুইজন সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতে বাড়ীর ভিতরে যান। মা তখন উঠানে বসিয়াছিলেন ও কথাচ্ছলে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন: আমার তের বছর বয়সের সময় কামারপুকুরে গিয়েছিলুম। হালদার-পুকুরে নাইতে যাব, ভয় হত! খিড়কীর ছোট দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে ভাবচি, নূতন বৌ, কী করে একলা নাইতে যাই। ভাবতে ভাবতে দেখি কী, আটটি মেয়েমানুষ এল; আমিও রাস্তায় নামলুম। নামবার পরেই তারা চারজন আমার আগে, চারজন আমার পেছনে হয়ে, আমাকে মাঝে নিয়ে হালদার-পুকুরের ঘাটে চল্ল। আমি স্নান কল্লুম, তারাও কল্লে। পরে আবার সেরকম করে বাড়ী ফিরে এল। ঐ সময়টায় যতদিন ওখানে ছিলুম, রোজ এইরকম হত। অনেক দিন মনে করেচি, মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় রোজই আসে; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। [ম]

কামারপুকুর হইতে শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে প্রত্যাবর্তনের চারিমাস পরে ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া দেশে আগমন করেন। তখন নববধূকে আনাইয়া আনন্দের মাত্রা পূর্ণ করিবার অভিলাষে আত্মীয়ারা পুনরায় তাঁহাকে কামারপুকুরে লইয়া আসেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাঁহার জীবনে প্রথম পতিসন্দর্শন।

ইতঃপূর্বে স্বয়ং আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, যখন পত্নী আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ঠাকুর সর্ববিষয়ে তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী বালিকার প্রতি নিজের কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। প্রথমতঃ ভালবাসায় তাঁহাকে সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইলেন; তারপর নিজের ত্যাগোদ্দীপ্ত জীবন সম্মুখে রাখিয়া, গৃহস্থালীর প্রত্যেক ছোটবড় ব্যাপার—প্রদীপের শলিতাটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ীতে যাইয়াই বা কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, গাড়ীতে বা নৌকায় যাইবার সময় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কিরূপে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবায় টাকার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, ইত্যাদি—হইতে আরম্ভ করিয়া মানবজীবনের গভীর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা

---

[১] কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার বাসের জন্য নির্দিষ্ট বাটী।

দিতে লাগিলেন।[২] পতির কামগন্ধহীন দিব্য সঙ্গ ও সপ্রেম শিক্ষায় সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা বালিকা আপনাকে তখন কিরূপ আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী বোধ করিতেন তাহা পরবর্তী কালে স্ত্রীভক্তদের নিকট এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন: "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীরস্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" [লী]

ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে শ্রীশ্রীমা শ্বশ্রূবৎ সেবাযত্ন করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী যে বধূমাতার সৌভাগ্যে সুখী হইতে পারিতেন না তাহা তাঁহার উগ্র মেজাজ ও কথাবার্তায় পরিব্যক্ত হইত। বালিকা মা তাঁহার সম্মুখে ভীতা ও সঙ্কুচিতা হইতেন। যাহা হউক, অচিরে নিজের দুর্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও কাছে থাকিলে উহা জয় করিতে পারিবেন না বুঝিয়া সাধিকা ব্রাহ্মণী কামারপুকুর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

প্রায় সাত মাস দেশে থাকিয়া ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, শ্রীশ্রীমাও জয়রামবাটীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাওয়ার কথা এই সময়ে কেহ উত্থাপন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমা আত্মসদৃশী আর একটি বালিকার দেখা পাইতেন, সেই বালিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাজকর্ম ও হাস্য-পরিহাসাদি করিয়া বহির্জগৎ হইতে তাঁহার মনকে বিচ্ছিন্ন রাখিতেন। ঐ প্রতিবিম্বরূপিণী এখন অন্তর্হিতা হইলেন। পতিরূপে ইষ্টদেবতা আসিয়া সর্বকালের জন্য সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

ভিতরে, যাঁহার দিব্যসঙ্গ হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত করিয়াছে সেই মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ স্বামিরূপী নরদেবের অনুধ্যানে শ্রীশ্রীমা এখন অহরহ নিমগ্না—প্রেমিকা প্রেমাস্পদে আত্মহারা! আর বাহিরে,—নিজের সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত হওয়ায় তিনি সকলের দুঃখকষ্টে অশেষ সহানুভূতিসম্পন্না—করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমা! মানবের বহুভাগ্যে সংসারে এমন চিত্র কদাচিৎ একবার প্রকটিত হয়। কিন্তু জন্মজন্ম জড়নিবদ্ধদৃষ্টি মানব তৎকালে তাহা দেখিতে পায় কি? যদি পাইত তাহা হইলে এমন দেবীমূর্তিকেও 'পাগলের স্ত্রী' আখ্যা দিয়া দয়ার পাত্রী বিবেচনা করিত না; আর তাঁহার দেবদুর্লভ বল্লভকে পাগল জ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ইতর জল্পনা করিতে বসিত না।

অন্তর যতই পরিপূর্ণ থাকুক আর পতি সম্বন্ধে নিজের ধারণা যতই উচ্চ হউক না কেন, পতিনিন্দা সতীর কোমল হৃদয়ে বিষম বাজে; সে আঘাত মারাত্মক হইয়া দেহান্ত পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। শ্রীশ্রীমা পতিনিন্দা শুনিবার ভয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন ও দিবারাত্র গৃহকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। কচিৎ বাড়ীর বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইলে গ্রামের ভক্তিমতী রমণী ভানুপিসীর[৩] ঘরের বারান্দায় যাইয়া আঁচল বিছাইয়া শুইয়া থাকিতেন।

[২] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: শ্বশুরবাড়ী বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর আমাকে শুতে যেতে বলতেন আর উনি কেবল হাসতেন। সেই সময় একসঙ্গে শুতুম আর সারারাত গল্পেই কেটে যেত। [নি]

[৩] ভানুপিসীর পরিচয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার'—একথা শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন। নিঃস্বার্থ প্রেম প্রেমাস্পদকে জন্মজন্ম আপনার করিয়া রাখে। আবার প্রেমরাজ্যে এমন একটা নিয়ম লক্ষিত হয় যে, প্রেমিক দীর্ঘকাল প্রেমাস্পদের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এই নিয়ম কেবল যে স্বার্থদুষ্ট, মুখ্যতঃ দেহসম্বন্ধে পর্যবসিত মানবীয় ভালবাসা সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে। ভক্ত-ভগবানের রাজ্যেও সেই একই বিধান। ভগবানও ভক্তের অদর্শনে বিরহোচ্ছল। 'বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে।'

প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছেন, এত আপনার করিয়া নিয়াছেন, সেই দেবতা সময়ে নিশ্চয়ই ডাকিয়া লইবেন -এই আশা বুকে নিয়া শ্রীশ্রীমা একটি একটি করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন। দিন গণিতে গণিতে হয় মাস, মাস গণিতে গণিতে হয় বৎসর। এইরূপে সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর প্রতীক্ষার পরেও যখন দয়িতের কোন আহ্বানই আসিল না তখন তাঁহার সীমাহীন ধৈর্যের বাঁধও যেন ভাঙ্গিল। স্বামীর সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার প্রবল বাসনা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, কিন্তু লজ্জাবশতঃ মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়া সেই বাধা দূরে অপসারিত করিল।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কতিপয় দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া কলিকাতা যাইবেন জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের কাছে গঙ্গাস্নানের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সেকথা শুনিয়া ও কন্যার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। তদনুযায়ী সকল বন্দোবস্ত করা হইল ও সকলে মিলিয়া পদব্রজে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীমা পূর্বে আর কখনও অত দূরের পথ পদব্রজে গমন করেন নাই। তাঁহার সুকোমল চরণযুগল বারবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সংকোচবশতঃ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। দুইতিন দিন পথ চলিবার পর তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন ; বাধ্য হইয়া পিতা কন্যাকে লইয়া চটিমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে জ্বরের প্রবল যন্ত্রণা, ভিতরে ততোধিক মনোবেদনা। এমন অবস্থায় রাত্রে এক দিব্যদর্শন উপস্থিত হইয়া উভয়বিধ কষ্টের লাঘব করিয়া দিল। সেই দর্শনের কথা শ্রীশ্রীমা স্ত্রীভক্তদের কাছে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন : "জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জা-সরম-রহিত হইয়া পড়িয়া আছি তখন দেখিলাম, পাশে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই। —বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথা থেকে আসছ গা ? রমণী বলিল, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, দক্ষিণেশ্বর থেকে ? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হল না। রমণী বলিল, সে কী ! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে।

তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি। আমি বলিলাম, বটে? তুমি আমাদের কে হও গা? মেয়েটি বলিল, আমি তোমার বোন হই। আমি বলিলাম, বটে? তাই তুমি এসেছ! ঐরূপ কথাবার্তার পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।" [লী]

রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। শরীর দুর্বল হইলেও মন দর্শনজনিত উৎসাহে পরিপূর্ণ। সকালে পিতা-পুত্রী পরামর্শ করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অল্পদূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। সেই দিন জ্বর আসিলেও পূর্বদিনের মত প্রবল হইল না; পিতা জানিতে পারিলে উদ্বিগ্ন হইবেন ভাবিয়া শ্রীশ্রীমা কাহাকেও জ্বরের কথা জানিতে দিলেন না। ক্রমে দিনের সঙ্গে পথেরও অবসান হইল। কন্যাকে সঙ্গে নিয়া রামচন্দ্র রাত্রি নয়টায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন।

"ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন,—তুমি এত দিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে! ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিনচারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্য লাভ করিলেন। ঐ তিনচারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন। পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।[৪] ···প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন; এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন ঐ স্থানে অবস্থানপূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।" [লী]

শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন কালের আরও দুইটি ঘটনা এখানে তাঁহার নিজের ভাষায় প্রদান করিতেছি: প্রথমবার যখন নৌকো থেকে দক্ষিণেশ্বরে নামচি, শুনতে পেলুম ঠাকুর হৃদয়কে বলচেন, ও হৃদু, বারবেলা নাই তো?—প্রথমবার আসচে! আমি মনে মনে জানি, আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেচি। [বি][৫]

যখন আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুর একাইক আমাকে প্রশ্ন কল্লেন, কিগো, তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেচ? আমি বল্লুম—না। আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব, তোমার ইষ্টপথে সাহায্য কত্তে এসেচি! [ন]

---

৪ ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবী জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাবাস করেন।

৫ ১২৭৮ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র সোমবারে পড়িয়াছে। সুতরাং চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেলা বিশেষভাবে মানিতেন। এখানে বারবেলা বলিতে কালরাত্রিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ঐদিন ১১ই চৈত্র শনিবার ছিল। শনিবার মধ্বোর, ঠাকুর বলিতেন। মধুমাসে মধ্বোরে, সম্ভবতঃ বৈদ্যবাটী হইতে নৌকাযোগে মা আসিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পতিসম্মিলন

চৌদ্দ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে আসেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ব্রহ্মবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, তখন তাঁহার বিজ্ঞানীর অবস্থা বা সহজ অবস্থা। সহজভাবে অবস্থিত ঠাকুর সহজভাবেই সহধর্মিণীকে গ্রহণ করেন এবং সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সকল বিষয় তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে যত্নবান হন। কিন্তু এই শিক্ষাদান-কার্য কামারপুকুরে তিনি সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন নাই; মাও তখন জীবনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব বুঝিবার মত বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ইহার চারি বৎসর পরে শ্রীশ্রীমা যখন প্রাণের টানে দক্ষিণেশ্বরে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তাঁহাকে মরমী স্বামীর সমগ্র দরদ দিয়াই গ্রহণ করিলেন ও কামারপুকুরে আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

শ্রীশ্রীমা এই সময় একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেন। তিনি বলিয়াছেন: আমার বয়স তখন আঠার উনিশ বছর হবে, ও'র সঙ্গে শুতুম। একদিন বল্লেন, তুমি কে? বল্লুম, আমি তোমার সেবা কত্তে আছি। 'কী?' 'তোমার সেবা কত্তে আছি।' 'তুমি আমা বই আর কাকেও জান না?' 'না।' 'আর কাকেও জান না?' 'না।' 'আর কাকেও না?' 'না।' [নি]

এই কালে প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের মন উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিত। যদি বা কখনও নীচে নামিত, তাহাতে সাধারণ-মানব-সুলভ দেহবুদ্ধির উদয় হইত না। এক এক দিন উহা সমাধিতে এমন লীন হইয়া যাইত যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত না। ভাব, সমাধি ইত্যাদি ব্যাপারে তৎকালে অনভিজ্ঞা বালিকা তাহাতে ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেন। একদিন কিছুতেই সমাধি-ভঙ্গ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে ঠাকুর তাঁহাকে কিরূপ ভাব হইলে কোন্ নাম বা বীজ শুনাইতে হইবে তাহা শিখাইয়া দেন। তথাপি যখন তখন সমাধি হইবার আশঙ্কায় মা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর পরিশেষে নহবতে নিজ জননীর কাছে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময় বাহ্যভূমিতে বিচরণ-কালেও ঠাকুর প্রকৃতি-ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে জগদম্বার দাসী জ্ঞান করিতেন, আর তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দিত

হইয়া অলঙ্কার, কাঁচুলি ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সুন্দর রমণী-বেশে সাজাইয়া দিতেন। মা তখন তদ্ভাবে ভাবিতা—জগদম্বার দাসী—দাসীভাবে ভাবিতা ঠাকুরের সখী।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার এই পরস্পর সম্বন্ধ ও তদুচিত আচরণ সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগম্য নহে। তাঁহাদের অলৌকিক আচরণের কথা শুনিয়া এক এক সময়ে দেবতা জ্ঞান করিলেও রক্তমাংসে গড়া মানুষরূপেই সে তাঁহাদিগকে চিরকাল ধরিতে বুঝিতে চাহিবে, নিজস্ব মাপকাঠিতে তাঁহাদের চরিত্র বিচার করিবে। ঠাকুরের চরিত্রবল ও সংযম একাধিক লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে, জগৎ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু সাধ্বী পত্নীর দেবচরিত্র ও সংযমের কথা পতি স্বয়ং প্রকাশ না করিলে লোকে জানিতে পারিবে কিরূপে? বোধ হয় সেইজন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় ভক্তদিগকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: 'ও যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে?' [লী]

ঈশ্বরলাভ-রূপ লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি ঠাকুর সংসারী লোকের অবিবেকপ্রসূত মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিলেও, আজীবন অনেক ছোটখাট ব্যাপারে সরল বালকের মত সকলের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন দেখা যায়। শ্রীশ্রীমাও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। কোন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সন্তান না হইলে সংসারধর্ম রক্ষিত হয় না, সুতরাং সংসারবিমুখ পতিকে ঐ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া সহধর্মিণীর অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীলোকটির পরামর্শে মা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তাই তো ছেলেপুলে একটা হবে নি, সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে? ঠাকুর উত্তর দিলেন, একটা ছেলে কী খুঁজচ গো, তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি মা-বোলে তিষ্ঠাতে পারবে নি। পরবর্তী জীবনে শিষ্য সন্তানের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াই মা বলিয়াছিলেন, তাই আজ দেখচি বাবা, কত দেশদেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসচে। [ন]

অন্তর্দর্শী ঠাকুরের উত্তর ও উহার সমর্থনে শ্রীশ্রীমার মন্তব্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্যের পরামর্শ এখানে নিমিত্তরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মাতৃত্বের সুপ্ত কামনা অলক্ষ্যে থাকিয়া ঠাকুরের কাছে ঐরূপ বলিতে তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল। যিনি মাতৃত্বমহিমায় ভবিষ্য মানব-সন্তানের হৃদয়ে পূজার আসন অধিকার করিবেন, যৌবনে তাঁহাতে মাতৃভাবের উন্মেষ যে অতি স্বাভাবিক তাহা আর বলিতে হইবে না।

যাহা হউক, এই একটি দিনের একটি কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোনদিন শ্রীশ্রীমা নিজের জন্য স্বামীর সেবাধিকার ছাড়া আর কিছু যে কামনা করিয়াছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। আর ঐ সেবার বাসনাও তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন নাই; অন্তরের অন্তস্তলে উহা গোপন রাখিয়া সময় ও সুযোগের

প্রতীক্ষা করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন। ঠাকুর ইচ্ছাপূর্বক যখন যেটুকু সেবাধিকার তাঁহাকে দিয়াছেন তিনি সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, আর সেই সেবার সুযোগে দিনের মধ্যে একটিবার স্বামীকে দর্শন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কতদিন সেই দর্শনের সুযোগটুকু হইতেও অপরে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তবুও তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই বা অন্যের উপর দোষারোপ করেন নাই। ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিয়া তিনি নিত্য তাঁহার দর্শন পাইতেন। কোনও সময়ে গোলাপ-মা[১] কিছুদিন যাবৎ প্রত্যহ ঠাকুরের থালা নহবত হইতে তাঁহার ঘরে লইয়া আসিতে থাকায় মা সেই দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহার তৎকালীন মনোভাব কত সুন্দর, কত মধুর! 'কখন কখন দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম,—মন, তুই এমন কী ভাগ্য করেচিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?' ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের কথা।[২] ঠাকুরের উপর তাঁহার যে অন্য ভক্ত অপেক্ষা অধিক দাবি আছে তাহা তিনি যেন ভাবিতেই পারিতেন না। শেষ বয়সেও কোন কোন ভক্তকে মা এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—ভয় কী! আমাদের ঠাকুর আছেন!

এই বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেমের বলেই তিনি সকলের উপর জয়ী হইয়া ঠাকুরকে সর্বাপেক্ষা অধিক আপনার করিয়াছিলেন, কামকাঞ্চনত্যাগী ঠাকুরও নিত্যকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন। সেই আত্মিক মিলনের এক অপূর্ব অভিনব দৃশ্য পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

---

১ ঠাকুরের শিষ্যা ও শ্রীশ্রীমার সেবিকা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী—ডাকনাম 'গোলাপ'।

২ গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ওর সহ্যগুণ কত! ওকে নমস্কার।' [নি]

সপ্তম অধ্যায়

পূজাগ্রহণ

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে ঠাকুরের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় জননীর সেবায় শ্রীশ্রীমা এখন দিবারাত্র আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। একদিন যখন ঠাকুর তাঁহার ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় কৌতুক-পরবশ হইয়া নহবতের নিকট হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাক না? কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ও ইতস্ততঃ না করিয়া সরলা মা উত্তর দিলেন, বাবা কী বলচ হৃদু, পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—সবই উনি।[১]

এই কালের আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন; একদিন দুপুরবেলায় ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে, আমি, ঘর ঝাঁট দিচ্চি; কেউ কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা কল্লুম, আমি তোমার কে? তিনি অমনি উত্তর দিলেন, তুমি আমার মা-আনন্দময়ী। [বি][২]

ব্রহ্মজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টিতে জীবমাত্রই ব্রহ্ম; সুতরাং উপরিধৃত উক্তি তিনি বেদান্তের দৃষ্টিতে করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীশ্রীমার ঐশ্বরিক স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া সহজভাবেই করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। তবে ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ের উক্তি পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া সেবাপরায়ণ সহধর্মিণীরূপে নিজেকে প্রকটিত করিলেও, মার ঐশ্বরিক স্বরূপ ও শক্তি অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের চক্ষে কোনকালেই আবৃত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সময়ে গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ও সারদা—সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেচে।' ভাগিনেয় হৃদয়কে মার সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় দুর্বিনীত হইতে দেখিয়া বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন:

> একদিন মিষ্টভাবে বিনয় করিয়া।
> হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া॥
> উনি যদি হন রুষ্ট রক্ষা নাহি আর।
> সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার॥ [পু]

---

১ 'শ্রীমা'-কথিত।

২ লীলাপ্রসঙ্গে আছে: "শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কী বলিয়া বোধ হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!'

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ফলহারিণী কালী-প‌ূজার দিন ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ৺ষোড়শী জ্ঞানে প‌ূজা করেন।[৩] যেভাবে সমাধিস্থ হইয়া মা সেই মহাপ‌ূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তিনি যে কত বড় মহাশক্তির আধার কিছ‌ুটা অন‌ুমান করা যাইতে পারে। ঘটনা এইর‌ূপ ঃ

ঠাকুর অন্তরের এক অপ‌ূর্ব প্রেরণায় চালিত হইয়া নিজের ঘরে জগন্মাতার বিশেষ প‌ূজা করিতে মনস্থ করিলেন। ভাগিনের হৃদয় ও দীন‌ু-প‌ূজারীর[৪] সাহায্যে দেবীর 'রহস্যপ‌ূজার সর্বাঙ্গস‌ুন্দর আয়োজন করিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে প‌ূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর প‌ূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুর প‌ূজায় বসিলেন।

প‌ূজার প‌ূর্বকৃত্যসকল দর্শন করিতে করিতে মা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন ; এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতে, প‌ূর্বম‌ুখে উপবিষ্ট প‌ূজকের দক্ষিণভাগে আলিম্পনভূষিত পীঠে উত্তরাস্যা হইয়া উপবেশন করিলেন। "সম্ম‌ুখস্থ কলসের মন্ত্রপ‌ূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,—'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরি মাতঃ ত্রিপ‌ুরাস‌ুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্ম‌ুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর !'

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপ‌ূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবী জ্ঞানে তাঁহাকে প‌ূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার ম‌ুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্প‌ূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ প‌ূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বর‌ূপে প‌ূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।" [লী]

> প‌ূজা-প‌ূজকেতে দ‌ূরে, ভাবরাজ্য ত্যোগিয়ে,
> ভাবাতীতে একত্র মিলন।
> দেহ দ‌ুটি পড়ে হেথা, মিলিয়া গিয়াছে সেথা,
> বিয়ের বারতা ব‌ুঝ মন ॥ [প‌ুঁ]

এইভাবে বহ‌ুক্ষণ অতীত হইল। নিশার তৃতীয় প্রহরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া, সেই বিল্বপত্র

[৩] শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ৺ষোড়শীপ‌ূজার কালনির‌ূপণে আমরা লীলাপ্রসঙ্গের অন‌ুসরণ করিলাম। আমরা জানি যে, গ্রন্থকার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে লিখিত যাবতীয় বিষয়ের খ‌ুঁটিনাটি তাঁহারই নিকট হইতে শ্রীব‌ুক্ত যোগীন-মার মধ্যবর্তিতায় জানিয়া লইতেন এবং লেখার পরেও তাঁহাকে পড়িয়া শ‌ুনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। যোগীন-মার পাশে ঘোমটা দিয়া বসিয়া মা শ‌ুনিতেন।

[৪] বালক দীননাথ জ্ঞাতিসম্পর্কে ঠাকুরের ভাইপো ছিলেন।

সহযোগে পূর্বপূর্ব সাধনকালে ব্যবহৃত বস্ত্র, আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রব্য, সেই সকল সাধনার ফল এবং নিজেকে দেবী-পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।

এ পূজা পূজার ইতি, আর দেবদেবী-মূর্তি,
কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার,
পরিণাম সকলের শেষ ॥ [পুঁ]

পূজা সম্পূর্ণ হইলে শ্রীশ্রীমার সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নহবত ঘরে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শীপূজা-কালে শ্রীশ্রীমার আচরণ সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন: ষোড়শী-পূজার সময় মা এতই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, কী যে হচ্ছে, তাঁর একেবারেই হুঁশ ছিল না। ঠাকুর তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন, প্রণাম করে তাঁর পায়ে মালা রাখলেন, মা কিছুই জানতে পারেন নাই। মার এত লজ্জা ছিল যে, লক্ষ্মীদিদি মাকে বলতেন, তোমার কাপড় খুলে ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিলেন এতেও তোমার হুঁশ হল না? এইদিন মা প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খেয়েছিলেন, অথচ কখনো তিনি মাংস খেতেন না![৫]

৫ গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীশ্রীসারদানন্দ-প্রসঙ্গ।

অষ্টম অধ্যায়

সিংহবাহিনী-জাগরণ

১২৮০ সালের সম্ভবতঃ কার্তিক মাসে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। তাঁহার দেশে গমনের অল্পকাল পরে ২৭শে অগ্রহায়ণ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর মানবলীলা সংবরণ করেন। এই বৎসরেই শুভ ৺রামনবমী তিথিতে তাঁহার রামভক্ত পিতা রামচন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টপদে মিলিত হন। স্নেহময় পিতার পরলোকগমনে পিতৃবৎসলা কন্যা যে শোকে কাতর হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন এবং পূর্বের ন্যায় ঠাকুরের জননীর সঙ্গে নহবত ঘরে বাস করিতে থাকেন।

স্বল্পপরিসর ঘরে মাতাঠাকুরাণীর থাকিতে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া ঠাকুরের রসদ্দার শ্রীশম্ভূচরণ মল্লিক মন্দিরের নিকটে কিছু জমি আড়াই শত টাকায় মৌরসী করিয়া লন, এবং নেপালের রাজকর্মচারী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়-প্রদত্ত শালকাঠের সাহায্যে মার বাসের জন্য তথায় একখানি চালাঘর নির্মাণ করাইয়া দেন।[১] সেই ঘরে সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবার এবং তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি পরিচারিকাও নিযুক্ত হইয়াছিল। এখানে মা ঠাকুরের জন্য প্রত্যহ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং মন্দিরে লইয়া গিয়া কাছে বসিয়া পরিতোষপূর্বক তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মার তত্ত্বাবধান ও মনস্তুষ্টির জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে মাঝে মাঝে এই গৃহে শুভাগমন করিতেন। একদিন অপরাহ্নে ঠাকুরের আগমনের পর হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বৃষ্টি হইতে থাকায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এখানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল: সেই রাত্রে মা তাঁহাকে ঝোলভাত রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সেবানিরতা মাকে হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ী যায় না? এ যেন আমি তাই এসেচি!

বৎসরকাল ঐ ঘরে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমা কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শম্ভূবাবুর বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থায়[২] রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে মা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সম্ভবতঃ ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে জয়রামবাটী যান। কিন্তু সেখানে রোগের পুনরাক্রমণে তাঁহাকে শয্যাশায়িনী হইতে হয় এবং তাঁহার শরীররক্ষা পর্যন্ত সংশয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সেই অসুখের সময় তিনি গৃহসন্নিকটে

---

[১] শম্ভুবাবুর পত্নী শ্রীশ্রীমাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, মার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে প্রত্যেক জয়-মঙ্গলবারে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন। নিকুঞ্জদেবীকে মা বলিয়াছিলেন : শম্ভু মল্লিক থাকার জন্যে ঘর করে দিলে ; তা বৌমা, সেখানে থাকতে মন চাইত না। সেকথা শুনে তিনি হৃদয়কে বল্লেন, হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন্। হৃদু বল্লে, আমার স্ত্রীর জন্যে কি শম্ভু বাড়ী করে দিলে?

[২] ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করেন।

কল্‌পুকুরের ধারে শৌচে যাইতেন, বারবার যাইতে কষ্ট হইত বলিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িয়া থাকিতেন। পুকুরের জলে নিজের অস্থিচর্মসার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহার দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত মনে উদিত হইয়াছিল!

অতঃপর রোগশান্তির কামনায় শ্রীশ্রীমা গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মণ্ডপে যাইয়া হত্যা দেন। এই হত্যাদান সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, আমাকে পাঁচ মিনিটও পড়ে থাকতে হয় নাই; তুমি কেন পড়ে আছ গো?—এই বলে সিংহবাহিনী আমাকে তুলে দিয়েছিলেন। [ন] শুনা যায় সিংহবাহিনী ঔষধরূপে তাঁহার ওলতলার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে মাকে আদেশ দিয়াছিলেন। [ই][৩] সিংহবাহিনীর নির্দিষ্ট ঔষধ সেবন করার ফলে মার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্বে জয়রামবাটীর সিংহবাহিনীকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও বড় একটা জানিত না। মা হত্যা দিয়া দেবীকে জাগ্রত করার পর তাঁহার মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে, লোকে তাঁহার কাছে মানত করিয়া সিদ্ধকাম হইতেছে এবং পূজাদানার্থী লোকের সমাগমে দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ কোলাহলমুখর হইয়া উঠিতেছে।

এই বৎসরের শেষভাগে শ্রীশ্রীমার পেটের প্লীহা অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় উহা দাগাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া কয়াপাটের হাটতলায় আসেন। তথাকার শিবমন্দিরে

---

[৩] এই 'সিংহবাহিনীর মাটি' মা সঙ্গে রাখিতেন ও প্রত্যহ তাহা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন।

[৪] ৺সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্যপ্রচার সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন: আমার অসুখের সময়—তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক-কান দিয়ে রস ঝরচে—উমেশ বল্লে, দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে? সেই আমাকে নিয়ে গেল ধরে ধরে। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যে। চোখে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চোখ গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশয়, তিনচার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই বাহ্যে গেলুম। উমেশের ভিক্ষে-মা ছিল—ঐখানেই তার ঘর—সে মাঝে মাঝে গলা খেঁকরি দিত, আমি না ভয় পাই। পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে বলচেন,—কামারদের একটি মেয়ের বেশ, রাধুর মত অতবড় মেয়েটি—'যাও যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? এখুনি আনগে। এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হয়ে যাবে।' এদিকে আমাকে বল্লেন 'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে টোপ দিও, ভাল হয়ে যাবে।' তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম, আর লাউফুলের রস চোখে টোপ দিলুম। দিতে, যেমন জাল টেনে আনে তেমনি চোখের সব ময়লা টেনে বার করে দিলে। সেই দিনই চোখ ভাল হয়ে গেল আর শরীরের সব ফুলোটুলো কমে গেল। শরীর বেশ ঝরঝরে হল—সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা কত্ত তাকে বলতুম, মা ওষুধ দিয়েচেন। সেই হতেই মা সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য প্রচার হল—আমিও, ওষুধ পেলুম জগৎও ধন্য হল। [গী]

একদিন শ্রীশ্রীমার বাড়ীর বাগালকে পুণ্যপুকুরের বাঁশবনে শাঁখামুটি-সাপে কামড়ায় বাঁহাতের তর্জনীর ডগায়। মা বলিলেন, সিংহবাহিনীর মাড়োতে ওকে নিয়ে যাও—স্নানজল খাওয়াও আর আঙ্গুলে মাটি লাগাও। সেইরূপই করা হইল এবং ছেলেটিও সারিয়া গেল। [বি] একদিন মাঠের আলপথ দিয়া আসিবার সময় মার ভাইপো ভূদেবকে জাত সাপে কামড়ায় ও সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। সর্পদষ্ট স্থানে সিংহবাহিনীর মাটির প্রলেপ দিয়া সারারাত্রি মা তাহাকে ঘরে শোয়াইয়া রাখেন। সকালে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। [ই]

তখন অন্যলোকের প্লীহা দাগানো হইতেছিল। কয়েকজনের কাজ হইয়া যাওয়ার পর, যে প্লীহা দাগায় তাহাকে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, বাবা, বেলা হয়েচে, তুমি চান করে এই নূতন কাপড়খানি পর, একটু জল খাও, আর ঐ পাতা আগুনে ফেলে দিয়ে, সব নূতন করে নিয়ে, আমার মেয়েটির পীলে দেগে দাও। সহনশক্তিময়ী মা প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন, প্লীহা দাগাইবার সময় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই, একটু লাগিয়াছিল মাত্র! যাহা হউক, প্লীহাটি ইহাতেই সারিয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, প্লীহা দাগাইবার জন্য ঠাকুরও কোন সময়ে ঐ কয়াপাটের হাটতলায় আসিয়াছিলেন।

১২৮২ সালে ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের রত্নগর্ভা জননী চন্দ্রমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দেবতনয়ের সাক্ষাতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং একটি ঝি ও গোঁসাইদাস নামক একটি লোককে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন। (৫ই চৈত্র, ১২৮২)।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীমা পূর্ববৎ শম্ভুবাবু-নির্মিত চালাঘরেই বাস করিতে থাকেন। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ঐ ঘরে থাকিতেন। এই সময় ঠাকুরের কঠিন আমাশয়-রোগ হয়। একজন প্রাচীন স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া সেবা করিতে থাকেন ও কাশীবাসিনী বলিয়া নিজের পরিচয় দেন।[৫] ঠাকুরের সেবা-প্রয়োজনে তিনিই মাকে চালাঘর হইতে নহবতে আনয়ন করেন।

ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সম্মুখে সলজ্জ বধূটির মত অবস্থান করিতেন, মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকটিই তাঁহার এই সংকোচের ভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি মাকে ঠাকুরের গৃহে লইয়া গিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেন, আর ঠাকুর তাঁহাদিগকে ভগবৎকথা শুনাইতে থাকেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পানে তাঁহারা উভয়ে এমনই বিভোর ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কখন যে সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে জানিতেও পারেন নাই!

১২৮৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীমা সাবিত্রীব্রত করিয়াছিলেন।[৬]

[৫] শ্রীশ্রীমা যখন প্রথমবার ৺কাশীতে যান বহু অনুসন্ধানেও এই স্ত্রীলোকটির দেখা পান নাই।

[৬] শ্রীশ্রীমার গোঁসাইদাসের সঙ্গে আসা ও সাবিত্রীব্রত করা—এই দুইটি ঘটনার সন-তারিখ 'শ্রীম'-লিখিত। সাবিত্রীব্রতের উল্লেখ স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতেও আছে।

নবম অধ্যায়

৺জগদ্ধাত্রীপূজা

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ছেলেরা সকলেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সংসারের কাজকর্ম দেখিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। চাষ-আবাদের তত্ত্বাবধান ও যাজনকার্য করিয়া রামচন্দ্র কোনরূপে সংসার চালাইয়া নিতেন। তাঁহার অভাবে যাজনলব্ধ আয়ের পথ কতকটা রুদ্ধ হইল; এবং চাষবাসও নিজেরা দেখিতে না পারায়, জমি হইতে যে ধান পাওয়া যাইত তাহাতে সম্বৎসরের ব্যয়-সংকুলান হইত না। তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় ভট্টাচার্যের কার্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিলেও সংসারে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন না।

এইরূপ সংকট অবস্থায় রামচন্দ্রগৃহিণী শ্যামাসুন্দরী কায়িক পরিশ্রমে অন্নের সংস্থান করিয়া যেভাবে সংসার প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের বাঁড়ুজ্যেরা সেই সময়ে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বাঁড়ুজ্যে পুকুর[১] এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহাদের এক আড়া ধান ভানিয়া শ্যামাসুন্দরী চারি কুড়ি[২] করিয়া ধান পাইতেন। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকিলে স্বীয় জননীকে ধান ভানার কাজে সাহায্য করিতেন।

শ্যামাসুন্দরীর যেমন মনের বল তেমনি দেহের সামর্থ্য ছিল। পুত্র-বধূদিগকে বলিতেন: ঘরে সবই আছে, তবু তোরা রান্নার জন্যে কষ্ট পাচ্চিস! আমরা ঘরে ভাত বসিয়ে দিয়ে শিওড়ে গিয়ে তরকারি নিয়ে এসেচি। ষোল-পাখা উনুন চলেচে, তাতে রান্না করে এসেচি এক হাঁড়ি ভাত আর এক ধুচুনি চালের জন্যে! [ই]

যে সময়ে শ্যামাসুন্দরী এইরূপ কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেছিলেন সেই সময়ে পুত্রগণের মধ্যে প্রসন্নকুমার জিবট্যায়, বরদাপ্রসাদ শিহড়ে হরেরাম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে এবং অভয় মাতুল-বাড়ীতে[৩] থাকিয়া কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তারপরে প্রসন্নকুমার যাজনাদি কার্য করিবার জন্য এক জ্ঞাতি-কাকার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। দুঃখকষ্টে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরে শ্যামাসুন্দরী দেবাদিষ্ট হইয়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-দেবীর অর্চনা করেন।[৪]

---

[১] এই বাঁড়ুজ্যে পুকুরে (বড়পুকুর বা তালপুকুরে) শ্রীশ্রীমা নিত্য স্নান করিতেন ও তথা হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতেন।

[২] এক আড়া=১৬ কুড়ি; এক কুড়ি=৪ মান। চাউল ও কলাই ১ মণ=১৬ মান; ধান ১ মণ=২৪ মান।

[৩] শ্যামাসুন্দরীর রামব্রহ্ম, রামতারক, কেদার, শ্রীপতি ও বৈকুণ্ঠ নামে পঞ্চভ্রাতা ছিল এবং দিনময়ী নামে এক ভগিনী ছিলেন। ভ্রাতৃবংশ লোপ পাইয়াছে।

[৪] জনশ্রুতি-অনুসারে প্রথম বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বুধবার ছিল এবং লক্ষ্মীবার, মাসের পয়লা ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন প্রতিমা বিসর্জন হইতে দেন নাই। এই সূত্র ধরিয়া আমরা ১২৮৪ সাল জগদ্ধাত্রীপূজার প্রথম বৎসর সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই সালে ৩০শে কার্তিক বুধবার সংক্রান্তির দিন পূজো পড়িয়াছে।

৺জগদ্ধাত্রীপুজোর কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন ঃ একবার গ্রামের কালীপুজোর সময় নব মুখুজ্যে আড়াআড়ি করে আমাদের পুজোর চাল নিলে না—ফেরত দিলে। মা চালটাল তৈরী করে রেখেছিলেন—পুজোর যোগাড়। আমাদের ঘর থেকে আর নিলে না! মা সমস্ত রাত্রি কেবল কাঁদচেন—'কালীর জন্যে চাল করেচি, আমার চাল নিলে না? এ চাল আমার কে খাবে? এ কালীর চাল তো কেউ খেতে পারবে না!' তারপর রাত্রে দেখেন কী, লালমুখী দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসেচেন: তখন ঐ একটি ঘর—বরদার ঘরটি। তিনি (ঠাকুর) এলেও ঐ ঘরে থাকতেন। জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গা চাপড়ে চাপড়ে উঠালেন। উঠিয়ে বল্লেন, তুমি কাঁদচ কেন? কালীর চাল আমি খাব, তোমার ভাবনা কী? মা বল্লেন, কে তুমি? জগদ্ধাত্রী বল্লেন, এই যে গো, এর পরেই যার পুজো। পরদিন মা আমাকে বলেচেন, ওরে সারদা, লাল রঙ, পায়ের উপর পা দিয়ে—ও কী ঠাকুর?—জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রীপুজো করব। জগদ্ধাত্রীপুজো করব, জগদ্ধাত্রীপুজো করব—একটা বাই হয়ে গেল। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন। এমন বৃষ্টি তখন, একদিনও ফাঁক নাই। মা-বল্লেন, কী করে তোমর পুজো হবে, ধানই শুকতে পাল্লুম নি! শেষটায় মা-জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, চারদিকে বৃষ্টি হচ্চে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ! কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল।[৫] প্রসন্ন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল! তিনি বল্লেন, মা আসবেন, মা আসবেন,—বেশ বেশ, তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে? প্রসন্ন বল্লে, আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম। তিনি বল্লেন, এই আমার যাওয়া হল, যা, বেশ পুজো কর্‌গে, বেশ বেশ, তোদের ভাল হবে। জগদ্ধাত্রীপুজো হল, দেশাঁও (দেশসুদ্ধ বা গ্রামসুদ্ধ লোক খাওয়ানো) হল; ঐ চালেই সব খরচপত্র কুলিয়ে গেল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রীমূর্তির কানে বলে দিলেন, মা জগাই, আবার আর বছর এসো, আমি তোমার জন্যে সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখব।

পরবছর মা আমাকে বল্লেন, তুমি কিছু দিয়ো, আমার জগাইয়ের পুজো হবে। আমি বল্লুম, অত ল্যাঠা আমি পারব নি, একবার পুজো হল, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নাই, ও পারবো না। রাত্রে স্বপ্নে দেখি কী, তিনজন এসে হাজির—জগদ্ধাত্রী, জয়া-বিজয়া।[৬] বলচেন, আমরা তবে যাব? আমি বল্লুম, কে তোমরা? বল্লেন,

---

[৫] এক অজ্ঞাতপরিচয় স্ত্রীলোক শিরাস গ্রামের কুঞ্জ মিস্ত্রীর কাছে গিয়া বলে, জয়রামবাটীর প্রসন্ন মুখুজ্যের ঘরে জগদ্ধাত্রী গড়তে তোমাকে যেতে হবে। যথাকালে মিস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। সকলে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে গেছল তোমাকে বলতে? মিস্ত্রী বলিল, আপনারা যে একটি মেয়ে-মানুষ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। [ই]

[৬] শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার দুই পাশে জয়া ও বিজয়ার মূর্তিদ্বয়ের পুজো হয়।

আমি জগদ্ধাত্রী। বল্লুম, না মা, তোমরা কোথা যাবে?—না, না, তোমরা কোথা যাবে, তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই। সেই থেকে বারবার জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় এখানে আসি—বাসন-টাসন মাজতে হয় কিনা। আর তখন তো আমাদের সংসারে লোকজন বেশী ছিল না, বাসন মাজতে আসতুম। তারপর যোগীন (যোগানন্দ) সব কাঠের বাসন করে দিলে। বল্লে, মা তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না। জগদ্ধাত্রী-পুজোর জমিও করে দিলে। [ধ][৭]

একবার ৺জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জনের সময় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, কানের গয়না একটি খুলে রাখবে, মা সেইটি মনে করে আসবেন। [বি]

[৭] কালীকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন: প্রথম চারি বৎসর আমার মার নামে, দ্বিতীয় চারি বৎসর আমার দিদির নামে, তৃতীয় চারি বৎসর আমার খুড়া নীলমাধবের নামে জগদ্ধাত্রীর সংকল্প হয়। যোগানন্দস্বামী কাঠের বারকোষ, লট্‌কন, সিংহাসনের চৌকী ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস করিয়া দিয়াছিলেন; আর তিনশত টাকা দিয়া তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়া দেন।

ইন্দুমতী দেবী বলেন: বার বৎসর পুজো হওয়ার পর মা [ইন্দুমতী শ্রীশ্রীমাকে 'মা' শব্দে নির্দেশ করেন] বলিলেন, আমরা আর পুজো করব নি, সবাইর নাম হল, আমরা আর মাকে আনতে পারব নি। সেই রাত্রে জগদ্ধাত্রী, পরে যেখানে মার বাড়ী হইয়াছে সেই জায়গায় দেখা দিয়া বলিলেন, তবে আমি যাই, তবে আমি যাই, সদুরা [সদু=মধু মুখুজ্যের পিসী] আনবে বলচে, তবে ওদের ঘরে যাই? তখন মা নিজের গলায় কাপড় দিয়া জগদ্ধাত্রীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, না মা তেসত্য করে বুঝি চলে যাচ্ছ এখান থেকে? আমি আর ছাড়ব নি তোমাকে—আমি বছর বছর তোমাকে আনব। মা নিজে জগদ্ধাত্রীর নামে নয় বিঘা আবাদী জমি দেবোত্তর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাইরা সেই জমির চাষী। তাহা হইতে তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর সাড়ে চারি আড়া ধান—প্রত্যেকে দেড় আড়া করিয়া—জগদ্ধাত্রীপুজায় দিতে হয়। এইটি শরৎ মহারাজের ব্যবস্থা। [মোট জমির পরিমাণ সাড়ে দশ বিঘা; দেড় বিঘা চাষের অনুপযুক্ত]।

দশম অধ্যায়

ডাকাত বাবা

শ্যামাপূজা, ফলহারিণীপূজো ও স্নানযাত্রা দিনত্রয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বিশেষ পর্বাহ বলিয়া পরিগণিত। স্নানযাত্রার পর প্রায়ই পঞ্চমীর দিন ঠাকুর দেশে যাইতেন; কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও শিহড়ে যাওয়া আসা করিতেন; এবং দুর্গাপূজার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন—লক্ষ্মীদেবীর উক্তি হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ১২৮৩ সাল হইতে পরপর চারি বৎসর তিনি দেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হয়।

১২৮৬ সাল হইতে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার কাছে আসিতে আরম্ভ করেন। কথামৃতে আছে, ঐ বৎসরের শেষভাগে দেশে যাইয়া পরবর্তী বৎসরের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় সাতমাস তিনি দেশে অবস্থান করেন; এই সময়ের মধ্যেই ৺রঘুবীরের সেবার জন্য জমিক্রয়াদি কার্য সম্পন্ন হয়। ইহার পর স্থূলশরীরে ঠাকুর যে আর দেশে যান নাই ইহা নিশ্চিত।

কলিকাতা হইতে ঘাটাল পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল আরম্ভ হইলে শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুর ষ্টীমারে একবার দেশে গিয়াছিলেন এবং পথে বালি নামক স্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। তথাকার এক ভক্তিমান মোদক নবনির্মিত গৃহে প্রবেশের পূর্বে কোন সাধুসজ্জনকে তিনদিন রাখিয়া সেবা করিতে বাসনা করিয়াছিল। অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতে থাকায় ঠাকুর ঐ সময়টা তাহার গৃহে অবস্থান করিতে বাধ্য হন ও সমাগত লোকজনকে ধর্মোপদেশ দানে কৃতার্থ করেন।[১] দেশে যাওয়ার পথে ঠাকুরের সহগামিনী হওয়ার স্মৃতি মার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল; নিকুঞ্জদেবীকে বলিয়াছিলেন: নৌকায় করে বালি হয়ে দেশে যাওয়া—একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া। বল্লেন, আমি জানি তুমি কে, কিন্তু এখন বলব না। আবার নিজেকে দেখিয়ে বল্লেন, আর এর ভিতর সব আছে।

একবার দেশ হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে শ্রীশ্রীমা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ঘটনা এইরূপ:

ভূষণ মণ্ডলের মা প্রভৃতি কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণী গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন শুনিয়া শ্রীশ্রীমাও যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী ও ছোট ভাইপো

---

১ ঠাকুর সম্ভবতঃ কলিকাতা-ঘাটাল ষ্টীমারে গিয়া বন্দর নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তথা হইতে নৌকাযোগে দ্বারকেশ্বর-নদের ভিতর দিয়া বালি গ্রামে যান। কামারপুকুর হইতে বালির দূরত্ব প্রায় চারিক্রোশ। ধ্রুবানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, নদের তীরে মোদকের ঘর ছিল আর নিকটেই অনেকগুলি গোস্বামীর বাড়ী ছিল। বালিতে লুপ্তবংশ সেই মোদকের ঘর নদগর্ভে বিলীন হইয়াছে, গোঁসাইদের বাড়ী আজও বিদ্যমান। পুঁথিতে বালির উল্লেখ নাই, দেওয়ানগঞ্জ লিখিত আছে। দেওয়ানগঞ্জ বালি হইতে অনেকটা দূরে। দেওয়ানগঞ্জের অর্ধক্রোশ ব্যবধানে প্রবাহিত কাটা খাল ঝুমঝমি তখন নৌকা-চলাচলের যোগ্য ছিল না, সেখানে গোস্বামীদের বাসও নাই।

শিবরামও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।[২] কামারপুকুর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত সাড়ে চারিক্রোশ পথ আসিতে মা বিশেষ ক্লান্তি বোধ করিলেন না। আরামবাগে সেই রাত্রি বিশ্রাম করিবার কথা; কিন্তু যথেষ্ট বেলা আছে দেখিয়া সঙ্গিনীরা তথায় রাত্রিবাসে অনিচ্ছুক হইল এবং পাঁচক্রোশব্যাপী ভয়সঙ্কুল মাঠ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারকেশ্বরে পৌঁছিবার সংকল্প করিল। একসঙ্গে এত অধিক পথ চলিতে নিজের বিশেষ কষ্ট হইবে বুঝিয়াও মা মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু প্রায় দুইক্রোশ পথ একযোগে চলিয়া ক্লান্তিবশতঃ পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। দুইবার সঙ্গিনীরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিল, এত ধীরে চলিলে যে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও মাঠ অতিক্রম করা যাইবে না ও সকলকেই ডাকাতদের হাতে পড়িতে হইবে ইহাও জানাইল। তাহাদিগকে একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মা যথাসম্ভব দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল; প্রান্তরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারে মা দেখিতে পাইলেন, লম্বা লাঠি উঁচাইয়া কৃষ্ণবর্ণ এক ভীষণাকার পুরুষ—তাহার হাতে রুপার বালা ও মাথায় ঝাঁকড়া চুল—তাঁহারই অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। সঙ্গিনীরা তখন দৃষ্টির বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি আসিয়াই কর্কশ কণ্ঠে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র ভাবান্তর হইয়া আবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মা কন্যার ন্যায় স্নিগ্ধকণ্ঠে তাহাকে পিতৃসম্বোধন করিলেন ও নিকটস্থ হইয়া পায়ের মল খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবা, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েচে, আমি পথ হারিয়েচি; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। এমন সময় লোকটির পশ্চাৎ দিক হইতে দ্রুতপদে একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই মা বুঝিতে পারিলেন, সে পূর্বাগত লোকটির পত্নী। তৎক্ষণাৎ উহার হস্তধারণ করিয়া কোমল মধুরকণ্ঠে কহিলেন, মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা; কী বিপদেই পড়েছিলুম মা, যদি বাবা আর তুমি না এসে পড়তে! রমণীর মাতৃহৃদয় বাৎসল্যরসে বিগলিত হইল।

নিজেদের হীন জাতি ও অবস্থার কথা ভুলিয়া বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নী সত্যসত্যই শ্রীশ্রীমাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নিকটবর্তী তেলোভেলো[৩] গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া গিয়া তাহারা রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল এবং মুড়িমুড়কি কিনিয়া আনিয়া রাত্রির মত তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন

---

[২] সৌখুনী নামে জয়রামবাটীর সদ্গোপজাতীয় শামুইদের এক বিধবা কন্যা এই দলভুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার শৈশবে সই পাতানো ছিল। [ই]

শ্রীমতী লক্ষ্মীর কাছে মুড়ির পুঁটুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমার গয়না লুকানো ছিল। বালবিধবা লক্ষ্মী চৌদ্দবছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বাস করিতে আসেন। ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে তাঁহার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়। সেইজন্য ডাকাত বাবার ঘটনাটি ১২৮৪ সালের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। উহা শীতকালীন ঘটনা, যেহেতু উহার সঙ্গে কড়াইশুঁটির সম্বন্ধ আছে।

[৩] তেলো ও ভেলে বা ভালিয়া দুইখানি সংলগ্ন গ্রাম।

করাইল। তারপর বাগ্‌দিনী মাতা কাপড় বিছাইয়া ছোট বালিকার মত তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল এবং বাগ্‌দি পিতা লাঠি-হাতে দ্বার আগলাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীমাকে লইয়া তারকেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে ক্ষেত্র হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া সস্নেহে মার হাতে দিতে লাগিল, আর মাও মুখ-না-ধোয়া অবস্থায়ই খাইতে খাইতে চলিলেন। বাগ্‌দি পাইক কৃষ্ণযাত্রার দলে অভিনয় করিত ও গাহিতে শিখিয়াছিল; পত্নীর আদেশে কন্যার পথশ্রম লাঘব করিবার জন্য সে এখন গানের পর গান গাহিয়া চলিল। এইরূপে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যখন তাহারা তারকেশ্বরে পৌঁছিল তখন প্রায় চারিদণ্ড বেলা হইয়াছে। পৌঁছিয়াই বাগ্‌দিনী তাহার স্বামীকে তাড়াতাড়ি বাবা ৺তারকনাথের পূজো দিয়া আসিতে এবং বাজার করিয়া আনিয়া মাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে বলিল। এমন সময় মাও তাঁহার অনুসন্ধান-নিরত সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রন্ধনভোজনাদি শেষ করিয়া সকলে যখন বৈদ্যবাটী অভিমুখে রওনা হইবেন তখন দেখা গেল, মার বাগ্‌দি মাতাপিতা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে, মার চক্ষেও জলধারা। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা অনেকদূর পর্যন্ত অনুগমন করিল। মাতা ক্ষেত হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া কন্যার আঁচলে বাঁধিয়া দিতে দিতে কহিল, মা সারদা, রাত্রে এগুলো দিয়ে মুড়ি খাস। আর পিতা কহিল, মা, যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সংগে না থাকত, তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম। তাঁহাকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া মাও অতিকষ্টে বিদায় লইলেন। বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী দৃশ্য মা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই; শেষ বয়সেও ডাকাত বাবার গল্প করিতে করিতে সজলনয়নে বলিয়াছেন: ডান দিকের রাস্তায় বাবা চলে গেল আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চল্লুম। যতদূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে। [বি]

ডাকাতি করিতে অভ্যস্ত, অমার্জিতবুদ্ধি এই গ্রাম্য বাগ্‌দি ও তাহার পত্নীর কঠিন চিত্ত কেবল যে শ্রীশ্রীমার কথায় ও ব্যবহারে এতদূর দ্রবীভূত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না। মার মধ্যে তাহারা এমন কী বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিল যাহা সেই পাষাণ গলাইয়া তাহাদের জীবন স্নেহবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল? ইহার উত্তর বাগ্‌দি দম্পতীর উক্তির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। কোন কোন ভক্তকে[৪] মা বলিয়াছিলেন: আমি তাদের বল্লুম, তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো? তারা উত্তর দিলে, তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখলুম! আমি বল্লুম, সে কী গো, সে কী গো, তোমরা এটা কী দেখলে? তারা বল্লে, না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম; আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন কচ্ছ। আমি বল্লুম, কি জানি, আমি তো কিছু জানি নি!

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কাছে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। পরবর্তী কালে বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নী যখনই মিষ্টান্নাদি সঙ্গে লইয়া তাহাদের মাঠে-পাওয়া প্রাণপুত্তলীকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিত, ঠাকুর ঠিক জামাতার ব্যবহারে ও সমাদরে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন।

---

[৪] লালবিহারী সেন ও সুরেন্দ্র সেন।

শ্রীশ্রীমা ঠিক কতবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়াছিলেন বলা কঠিন। দুইবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ: আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বর হয়ে গত অসুখের মানসিক নখচুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে কলকাতায় তার বাসায় উঠি। ফাল্গুন চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে যাই। যেতেই হৃদয় আপনা হতে বলতে থাকে,—কেন এসেচ? কী জন্যে এসেচ? এখানে কী? এই সব বলে তাদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেয় নি। হৃদয় শিওড়ের পুরুষ, আমার মা শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে কোন মান্য কল্লে না। মা বল্লেন, চল ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব? ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া হাঁ, না, কিছুই বলেন নি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে গেলুম। রামলাল (ঠাকুরের ভাইপো) পারের নৌকো এনে দিলে। আমি মনে মনে মা-কালীকে বল্লুম, মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।

তারপর হৃদয় ওখান থেকে চলে গেল (১২৮৮, স্নানযাত্রা)। রামলাল কালীঘরের পূজারী হল—হয়েই ভাবলে, আর কী, এবার মা-কালীর পূজারী হয়েচি! সে ঠাকুরের অত খোঁজখবর নিত না। উনি ভাবটাব হয়ে হয়তো পড়ে থাকতেন; এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকিয়ে থাকত। ঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হতে লাগল। তখন অন্য কেউ নাই। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে আসবার জন্যে খবর দিতে লাগলেন। ওদেশের যে আসত তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্যে। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে বলে পাঠালেন, এখানে আমার কষ্ট হচ্চে; রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেচে, এখন আমাকে আর অত খোঁজখবর করে না: তুমি অবিশ্যি আসবে—ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব। ঠাকুরের এই সংবাদ পেয়ে আমি শেষে এলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন)। [গ]

ইহার পর দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা ১২৯০ সালের মাঘ মাসে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁহার দেশ হইতে রওনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভাবের ঘোরে রেলিং-এর উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাঁ হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় ও কষ্ট হইতে থাকে। যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মা বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই তুমি বিষ্যুতবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেচ বলে আমার হাত ভেঙ্গেচে; যাও যাও, যাত্রা বদলে এস গে। পরদিনই মা যাত্রা বদলাইবার জন্য দেশাভিমুখে রওনা হন।

ইহার পর কোন সময়ে, সম্ভবতঃ ভাসুরপুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষে দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন।[৫] সঙ্গীর অভাবে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। নিকুঞ্জদেবীকে বলিয়াছিলেন, বৌমা, সেবার যখন নয়মাস আসি নি বড় কষ্ট হয়েছিল।

---

[৫] লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে। কথামৃতে আছে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফাল্গুনে তিনি নহবতে।

একাদশ অধ্যায়

সাধনভজন

শ্রীশ্রীমার সাধনভজনের কথায় অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যে দেবী সমাধিস্থা বা স্বরূপে স্থিতা হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করিলেন সেই সাধ্যরূপিণীর আবার সাধনার প্রয়োজন কী? সেই প্রশ্নের উত্তর একভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কালবশে পথভ্রষ্ট মানবকে উচ্চ ধর্মভাব এবং সেই ভাব প্রকাশের উপযোগী জীবনাদর্শ দান করিবার জন্য লীলাপ্রিয় ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন—অন্য কথায়, স্বকীয় দেবভাবকে মানবীয় ভাবাবরণে আবৃত করিয়া দেবমানব রূপ ধারণ করেন। বাল্যকাল হইতেই মধ্যে মধ্যে মানবীয় ভাবাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার দেবস্বরূপের প্রকাশ হয় বলিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দেবত্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না; আবার মানবদেহের সঙ্গে মানবের অপূর্ণতা স্বীকার করায় মানববৎ সর্বপ্রকার আচরণ—আহারনিদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত তাঁহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া তাঁহার মানবত্বও অস্বীকার করা চলে না। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ বোধ হইলেও এই অতিসত্য উভয়বিধ ভাব তাঁহার মধ্যে কিরূপ মধুর সামঞ্জস্যে মিলিত থাকে তাহার আলোচনা স্বামী সারদানন্দ তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন।

আগে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা স্বরূপ উপলব্ধির পরেও অবতার-পুরুষের—এমনকি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্তদেরও—সাধনভজন হইতে পারে ও হইয়া থাকে। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন, লাউকুমড়ার আগে ফল তারপরে ফুল।

ইষ্টপ্রাপ্তি পূর্ব হইতে হইয়া আছে বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেবমানব বা শ্রীশ্রীমার মত মানবীরূপা দেবী যে সমস্ত সাধনা করেন তাহাতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ থাকে না; শুধু সাধনা কেন, তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক কার্যই পরার্থে অনুষ্ঠিত হয়;[1] এবং পরার্থে বহুর কল্যাণে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই তাঁহাদের সাধনার মধ্যে এমন প্রবল তোড়, এমন সুতীব্র ব্যাকুলতা আসে যে, ব্যষ্টিমুক্তিকামী জীবের সেরূপ তোড় বা ব্যাকুলতা আসিতে দেখা যায় না। ব্যষ্টিমুক্তির জন্য যতটুকু উদ্যম বা শক্তিপ্রকাশ প্রয়োজন, সমষ্টিমুক্তির জন্য যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক সে কথা কে অস্বীকার করিবে? দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা দ্বারা অবতার পুরুষ যে বিপুল শক্তিপূর্ণ অধ্যাত্ম-তরঙ্গ উত্থাপিত করেন সেই তরঙ্গকে আশ্রয়মাত্র করিয়াই বহু মুমুক্ষু জীব স্বরূপে আনীত হয়। ঐরূপ দেবমানবই একমাত্র জগদ্গুরু; সাধনা দ্বারা তৎকর্তৃক পৃথিবীতে সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তিরাশিই গুরুশক্তি; এবং গুরুশক্তির আশ্রয় ব্যতীত কোন জীবই ভবসমুদ্র অতিক্রম

[1] কোন যোগ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা মেয়েদিগকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া উঠিয়া ঘাটপাণ্ডাকে একটি ভাব দিয়া বলিলেন, এই ফলটি লাও বাবা, ফলের ফলটিও লাও। [নী]

করিতে—ইষ্টদর্শন বা স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। জগদ্গুরুর শক্তিতে কথঞ্চিৎ শক্তিমান হইয়াই পবিত্রহৃদয় সাধারণ গুরুগণ কতক পরিমাণে লোককল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 'অবতারগুরু যেন সূর্য ও সাধারণগুরু যেন চন্দ্র'।[২] চন্দ্রের কিরণ নিজস্ব নহে, সূর্য হইতে প্রাপ্ত।

জগদ্গুরু স্বল্পকালের মধ্যেই বহুজীবকে ইষ্টদর্শন বা স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া মুক্তিপদবীতে আরূঢ় করান; এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব যাহাতে ধীরে ধীরে সেই বস্তুলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে সেইরূপ কালোপযোগী জীবনাদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দিয়া ঐ দুই কার্য কিরূপে কতদূর সংসাধিত করিয়াছিলেন, ক্ষীণদৃষ্টি মানব কখনও তাহা সমগ্রভাবে দেখিতে পাইবে না। ঐশ্বরিক কার্যের ইয়ত্তা নির্ধারণ করিতে যাওয়া জীবের পক্ষে অনধিকার চর্চা। তথাপি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উদার চিন্তা ও আলোচনা করিলে আমাদের অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে-- শ্রীভগবানের নরলীলা অনুধ্যান এবং যুগাদর্শ যথাশক্তি ধারণা ও জীবনে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা আমাদিগকে পরম শ্রেয়েরই সমীপবর্তী করিবে।

ঠাকুর আপনভাবে কখন কখন গাহিতেন ঃ

এসে পড়েচি যে দায় সে দায় ব বব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায় ?
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া এ কী দায়! [পুঁ]

আবার মাকেও বলিতেন, শুধু কি আমারই দায়? —তোমারও দায়। নিজে স্থূলদেহে লীলা সম্বরণ করিলে পাছে তদ্গতপ্রাণা মাও লীলাসম্বরণ করেন সেইজন্য ঠাকুর পূর্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল কচ্চে, তুমি তাদের দেখবে। [গ] 'আমি কী করেচি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী কত্তে হবে।' [ন] তথাপি ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পর যখন মারও চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতে লাগিল তখন ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, না, তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে। মা বলিতেন, শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি।

নিজের ভজনসাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা অনুরক্ত ভক্তদের কাছে কচিৎ দুই-একটি কথা কহিয়াছেন, ঘটনাচক্রে তাঁহার ভাব বা সমাধির অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অন্য ভক্তেরাও দুই-একটি কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্তই তাঁহাব সাধন-জীবনের ইঙ্গিত দিয়া থাকে। এই ইঙ্গিত হইতে তাঁহার সাধনার বিস্তার ও গভীরতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় না।

চৌদ্দ বছর বয়সে কামারপুকুরে যখন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার মিলন হইল তখন হইতেই তাঁহার সাধনার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ে ঠাকুরের শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন ঃ ঠাকুর যখন মেয়েদের উপদেশ দিতেন, শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তুম। অন্য মেয়েরা ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা কত্ত আর বলত,

[২] গ্রন্থকার-সংকলিত 'স্বামী সারদানন্দের পত্রমালা'

এমন কথাগুলো শুনলে নি, ঘুমিয়ে পড়লে! ঠাকুর বলতেন, নাগো, ওকে তুল নি, ও কি সাধে ঘুমিয়েছে? এসব শুনলে ও এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে। একথা মেয়েরা পরে আমাকে বলেছিল। [ন] ঠাকুর কী অর্থে যে 'ও এখানে থাকবে নি' ইত্যাদি উক্তি করিয়াছিলেন, বলা কঠিন। মার মনের স্বাভাবিক উর্ধ্বগতি ও তৎকালীন অন্তর্মুখ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি ঐ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। হয়তো ঠাকুরের মুখে তৎকালে ঐসকল ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিলে মার মন সমাধিতে এমনই লীন হইয়া যাইত যে উহাকে নিম্নভূমিতে ফিরাইয়া আনা দুষ্কর হইত।

তারপরে শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন তখন হইতে ঠাকুরের উপদেশানুসারে চলিয়া তাঁহার সাধন-জীবন যে উত্তরোত্তর গভীরতা প্রাপ্ত হইল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালীন হৃদয়াবেগ দুইএকটি কথায় মা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ

সে সব কী দিনই গিয়েছে! জ্যোৎসনা রাত্রে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাতে বলেচি, তোমার এ জ্যোৎসনার মতন আমার অন্তর নির্মল করে দাও। রাত্রে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থিরজলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কত্তুম, —চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।[৩]

শ্রীশ্রীমা পূর্ণানন্দ নামে কোন সন্ন্যাসীর কাছে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন।[৪] পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরও তাঁহার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের যেমন ইষ্টদেবী ছিলেন কালী, তেমনি মার ইষ্টদেবী ছিলেন জগদ্ধাত্রী।[৫] ঠাকুর যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন সেই সকল দেবদেবীর মন্ত্রও মাকে শিখাইয়া দেন এবং মা ঐসকল মন্ত্রেও সাধনা করেন।[৬] আধ্যাত্মিক রাজ্যের খুঁটিনাটি ব্যাপার ঠাকুর নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন; মাকে তিনি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্চক্র ইত্যাদি কাগজে আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

মন্ত্রের জপপুরশ্চরণ শ্রীশ্রীমা কতদূর করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণেশ্বরে এক সময়ে লক্ষজপ সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। শেষ বয়সেও জপধ্যানে তাঁহার অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। জয়রামবাটীতে অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অসুখের সময়েও ঠিক চারিটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া অন্ধকার থাকিতেই মা মাঠে যাইয়া শৌচাদি সারিয়া আসিয়াছেন; তারপরে গায়ে লেপখানা জড়াইয়া বিছানাতেই পা মেলিয়া জপ করিতে বসিয়াছেন। মন্ত্র জপ

---

[৩] শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে সংকলিত।

[৪] পুত্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাম রাখিতে ইচ্ছুক একজনকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, আমি এই নাম ধরে ডাকতে পারব নি, আমার গুরুর নামে নাম। পূর্ণানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। [বি]

[৫] ডাক্তার অক্ষয়কুমার মিত্র শ্রীশ্রীমার কাছে জগদ্ধাত্রীমন্ত্র নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমার মনে হয় মা জগদ্ধাত্রীমন্ত্র দেবেন না—জগদ্ধাত্রী তাঁর ইষ্ট। [বি]

[৬] শ্রীশ্রীমা পরে এই মন্ত্রগুলিই অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শিষ্যকে দান করিতেন। বিশ্বেশ্বরানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এত লোককে মন্ত্র দেন কেন? এতে কি তাদের সকলেরই কল্যাণ হবে? মা উত্তর দেন, এগুলি ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র—সিদ্ধমন্ত্র; জপ কল্পে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে।

করিবার জন্য তাঁহার একগাছি তুলসীর এবং একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সাধারণতঃ তিনি একবার ব্রাহ্মমুহূর্তে, একবার পূজার সময়, একবার অপরাহ্ণে এবং একবার সন্ধ্যায় জপধ্যান করিতেন। নিত্যকর্মের মত ইহা তাঁহার এমনই অভ্যস্ত ছিল যে, সহজে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না। দুর্বল শরীরে একদিন সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া কোন সেবক বলেন, মা, তোমার করবার কী আছে? তোমার তো সব হয়েই গেছে, আবার শুধু শুধু শরীরকে কষ্ট দিচ্চ কেন? তাহাতে মা উত্তর দেন, বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কী কচ্চে-না-কচ্চে, তাদের জন্যে দুটো করে রাখচি। [নি] অন্যদিন আর একজন তাঁহাকে বলিয়াছিল, আপনি রাত্রে ঘুমান না, আমি যখনই রাত্রে ঘর থেকে বার হই তখনই আপনি জিজ্ঞাসা করেন,—কে গো? এতে বেশ বুঝি যে আপনার ঘুম হয় না। মা বলিলেন, ঘুমব কখন? ছেলেগুলি এসে পড়েচে, নিজেরা তো কিছু কত্তে পারে না, তাদের কাজ কত্তেই সময় যায়।

শেষ বয়সের এই সাধননিষ্ঠা দেখিয়া যৌবনে শ্রীশ্রীমার প্রাথমিক সাধনার আবেগ ও তীব্রতা কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। তখন কত বিনিদ্র রজনী যে তিনি ধ্যান-সমাধিতে অতিবাহিত করিয়াছেন তাহার বিবরণ কেহই জানে না। নহবত ঘরের পশ্চিমধারের বারান্দায় দক্ষিণমুখী হইয়া বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। এক সুগভীর রাত্রে ঠাকুরের অন্বেষণে পঞ্চবটীতে যাইবার কালে স্বামী যোগানন্দ মাকে সমাধিমগ্না দর্শন করিয়াছিলেন:

বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী॥
প্রকাশ্য বদন, আবরণ নাহি তায়।
... ...
লজ্জাপরিপূর্ণ দেহে মোটে নাহি মন।
বিশ্বহিত ধিয়ানে যেমন নিগমন॥ [পুঁ]

কথিত আছে, যখন শ্রীশ্রীমা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি ভাব, সমাধি ইত্যাদি বড় একটা বুঝিতেন না; আর সেইজন্য ঠাকুরের ভাব কিংবা সমাধি হইতে দেখিলে ভয় পাইতেন। যাহা হউক, তাঁহারও যে ঐসকল অবস্থা পরপর উপস্থিত হইয়া পরিশেষে নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল, ইহার নিদর্শন বিরল হইলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। শ্রীযুক্তা যোগীন-মা[৭] বলেন,—

"...নহবতে আসিয়া...দরজা একটু খুলিয়া দেখি, মা খুব হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন, আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থা।

"একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর স্বরে মার ভাব হইল—থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন।..."

"বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপদিদি ছাদে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা

৭ ঠাকুরের শিষ্যা ও শ্রীশ্রীমার সঙ্গিনী-সেবিকা শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস।

তখনও একভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দহীনা সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পর হুঁশ আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই। আমরা মার হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম।...তবুও যে দেহটা রহিয়াছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা উহা বুঝিতে পারেন নাই।"[৮]

সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশি বাজাইতেছেন মনে করিয়া শ্রীশ্রীমা বংশীধ্বনি শুনিলেই সমাধিস্থ হইতেন; দক্ষিণেশ্বরে কেহ তখন রাত্রে বাঁশী বাজাইত। ইহা ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধি। বেলুড়ের বাড়ীর ছাদে মার যে সমাধি হয় উহা নির্বিকল্প সমাধি, সমাধিভঙ্গে তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায়।

পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমার ভাব, সমাধি ইত্যাদি অবস্থা অহরহ উপস্থিত হইলেও তিনি যে বাহিরে তাহা প্রকাশিত হইতে দিতেন না স্বামী প্রেমানন্দের উক্তি হইতে জানা যায়। ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষ প্রেমানন্দ মার অবস্থা যেমন বুঝিতেন সাধারণে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তিনি বলিয়াছেন, 'তিনি শক্তিরূপিণী কিনা, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুণের ভাব, সমাধি হচ্চে, কিন্তু কাকেও জানতে দেন?'[৯] তথাপি কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তের প্রতি কৃপায় মার সমাধিমগ্না মূর্তিও কচিৎ বাহিরে প্রকাশ পাইত।

তপানন্দ বলেন: একদিন জয়রামবাটীতে মা পা মেলিয়া চোখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, বাহিরের কোন হুঁশই নাই। আমি অনিমেষ নয়নে সেই ধ্যানমগ্না মাতৃমূর্তি দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মা প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ঈষৎ সঙ্কুচিত-ভাবে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিয়াছেন: জয়রামবাটীতে ৺বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা আমাকে বলিলেন, ঠাকুরের শীতল দেবে এস—কাপড় ছেড়ে এস। কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, মা শীতল দিবার ভোগ লইয়া মামার বাড়ীর দাওয়ায় পা দুইখানি ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার খুব কাছেই প্রাচীরের মধ্যে ঠাকুরঘর। মা বলিলেন, ঠাকুরঘর খুলে এসব শীতল দাও, ঠাকুর শয়ন করাও। আমি ঠাকুরদের শীতল ও শয়ন দিয়া আসিয়া দেখি মা সেই একই ভাবে বসিয়া আছেন। সেই পা-ঝুলানো অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে কেমন ইচ্ছা হইল ও খুব পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিলাম। মা তখনও স্থির, নিশ্চল প্রতিমা। তখন কী আর করি, দাওয়ার উপর তাঁহার কাছেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। জিতেন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়াছি, তিনি পা ঝুলাইয়া খাটের উপর বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঠাকুরের ফটো ও মা-কালীর পটের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ইনি আর ইনি এক। সঙ্গে সঙ্গে খট্ করিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া তাঁহার শরীর কাঠিনতা প্রাপ্ত হইল ও ডানদিকে ঈষৎ হেলিয়া গেল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে পটের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে শিথিল হইয়া শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল।

ভাবরাজ্যের সকল স্তর উপলব্ধিপূর্বক অতিক্রম করাতে এবং ভাবাতীত রাজ্যেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকাতেই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরেরই মত গভীররূপে বিভিন্ন ধর্মের সকল ভাব

৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

৯ ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত 'প্রেমানন্দ'।

অনায়াসে ধরিতে, বুঝিতে ও তত্তদ্‌ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে সক্ষম ছিলেন। একবার বৈদেশিক খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার এই শক্তি দেখিয়া নিবেদিতা-প্রমুখ পাশ্চাত্য ভক্তেরা বিস্মিত হন।[১০]

সাধনা ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখোক্ত কতিপয় উক্তি এইরূপঃ

বহু তপস্যা কল্লে এই মন শুদ্ধ হয়। 'সাধন বিনা 'সদ্ধবস্তু কভু না মিলয়।' ভগবান লাভ হলে কী আর হয়, দুটো কি শিং বেরয়? না, মন শুদ্ধ হয়—শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্য হয়।

নরেন বলেছিল, মা, আমার, আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে—সবই দেখছি উড়ে যায়। আমি বললুম, দেখো দেখো, আমাকে উড়িয়ে দিয়ো না। নরেন বল্লে, 'মা' তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান, গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা— মা —শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়—এই তো সোজা কথাটা।

জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়; কিন্তু ভগবানকে প্রেম ভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপতপের দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলো কেটে যায়। বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না; তারা আয় রে, খা'রে, না রে এই করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল। [ধ]

বিশ্বেশ্বরানন্দ বলেনঃ বাগবাজারে মার বাড়ীতে একদিন ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাধন সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা না কল্লে তত্ত্বজ্ঞান হয় না; সাধন কত্তে হয়—চন্দনের কাঠটি ঘসলে গন্ধ বেরয়, না ঘসলে বেরয় না। ১৩১২ সালে মার জন্মতিথির আগে জয়রামবাটীতে গিয়াছিলাম। জন্মতিথির পর মার খুব জ্বর হয়। তখন জ্বর সারিয়াছে কিন্তু দুর্বলতা কিছু কিছু আছে। মার ঘরের বারান্দায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, কী করে ভগবান লাভ হয়? আমার মনে অবশ্য এমন ভাব ছিল যে, তিনি হয়তো অনেক জপধ্যান করার কথা বলিবেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, তার কৃপাতে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কিছুতেই নয়? মা বলিলেন, না। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কিছুতেই নয়? মা বলিলেন, না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কিছুতেই নয়? মা বলিলেন, না। মাকে আমি আর কখনও প্রশ্ন করি নাই।

---

[১০] সিস্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেনঃ মাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীরা ঠাকুরঘরে বসিয়া খ্রীষ্টীয় পর্বের তাৎপর্য কিছু শুনিতে চাহিলেন। তারপরে আমাদের ছোট ফ্রেঞ্চ অর্গান লইয়া ইস্টারের গান ও গৎ বাজানো হইল। পুনরুত্থান স্তোত্রগুলির বিদেশী ভাব বা উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব কোনটাই বাধা জন্মাইল না, তৎক্ষণাৎ উহাদের মর্ম অনুধাবন করিয়া মা ভাবাবিষ্ট হইলেন। সারদা দেবীর উদার ধর্মসংস্কৃতির একটি অতি হৃদয়গ্রাহী দিক এই প্রথম আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহার যেসব পার্শ্বচারিণী শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পাইয়াছেন তাঁহাদের সকলের মধ্যেই এই ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু তাহার এই শক্তিটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ও কঠোর সাধনা হইতে লব্ধ, সন্দেহমাত্র নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের সেবা

পূর্বাধ্যায়ে শ্রীশ্রীমার সাধনভজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুরের সাধনার সঙ্গে মার সাধনার বাহ্য অভিব্যক্তিতে যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ইহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুরের সাধনা উদ্দামস্রোতা জাহ্নবীর মত দুইকুল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছিল; তাহার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ সমীপবর্তী লোকেরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু মার সাধনা অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মত নিঃশব্দে প্রবহমানা—লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিতা। ঠাকুরের মত মাকে প্রত্যেক ধর্মের সত্যতা সাধনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয় নাই; পূর্ব হইতে প্রমাণিত বস্তুকে সহজে বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সেই ভাবকে সমধিক মহিমান্বিত করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের সাধনা সমস্ত জগৎ ভুলিয়া এক ভগবানকে বিষয়ীভূত করিয়াছিল; কিন্তু মার সাধনা অন্য সমস্ত ভুলিলেও ঠাকুরের সেবা ভুলিতে পারে নাই, বরং উঁহাকে প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার সাধনা দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, ঠাকুরই ছিলেন তাঁহার সর্বসাধনার ফলরূপী। তিনি যেন ফলকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সমুদয় সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সাধনার অন্তে আবার তাঁহাকেই ফলরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কত ভক্তকে মা বলিয়াছেন, ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ঠাকুরের পূজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু শিষ্যকে বলিয়াছেন, তিনি সর্বদেবময়, তিনি সর্ববীজময়; ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই তাঁর পূজা হয়ে যাবে। এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভিতর সব দেবদেবী আছেন—এমনকি, শীতলা মনসা পর্যন্ত। এক সময়ে বাগবাজারের ৺সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী হইতে মার জন্য স্নানজল আসিত। বাসুদেবানন্দ ঠাকুরপূজা করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর ও ঠাকুরের স্নানজল দুইটি ভিন্ন পাত্রে লইয়া মাকে দিতে গেলেন। মা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, দুটো কিসের? বাসুদেবানন্দ কহিলেন, সিদ্ধেশ্বরীর আর আমাদের ঠাকুরের। মা বলিলেন, ও একই। বাসুদেবানন্দ তখন দিবার উদ্যোগ করিতেই বলিলেন, মিশিয়ে দাও। 'কাল থেকে দেব।' 'না, আমার সামনেই তুমি মিশাও।' দুইটি স্নানজল মিশাইয়া এক করিয়া দিলে তবে মা গ্রহণ করিলেন। কথামৃত লেখক 'শ্রীম'র কাছে শুনিয়াছি, ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হইলে 'আমার মা-কালী কোথা গেলে গো?' বলিয়া মা কাঁদিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার সেবিকা মূর্তি মনে হইলে মা-লক্ষ্মীর চিত্র অন্তরে জাগে—কখনও নারায়ণ-পদমূলে উপবিষ্টা, কখনও বা রন্ধনশালায় রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা। ঠাকুরের বিশ্রাম-কালে তিনি পদসেবা করিতেছেন; স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিতেছেন; ঠাকুরের দেহের অবস্থা বুঝিয়া যখন যেটি রুচিকর ও পুষ্টিকর হইবে বলিয়া বুঝিতেছেন তখন সেইটিই প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। সেবা করিয়া ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার মত কেহই সক্ষম ছিল না; তাঁহার মত ঠাকুরের অবস্থাভিজ্ঞও কেহ ছিল না। একবার মা তিনদিন ঠাকুরকে রাঁধিয়া দেন নাই। প্রচলিত সংস্কার এই যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসে ঐ তিনদিন নিজহাতে ঠাকুরদেবতা বা গুরুজনকে কিছু প্রস্তুত করিয়া দেওয়া চলে না।

অন্যের হাতে খাইয়া ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইল, তিনি মাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন ; এবং শরীরের রক্ত মাংস হাড় ইত্যাদি কোন জিনিসই অশুদ্ধ নয়, মনে বিকার না থাকিলে ঐ অবস্থায় সকল কার্যই করিতে পারা যায়, ইত্যাদি কথা বলিয়া তাঁহার পূর্ব ধারণা দূর করিয়া দিলেন। তদবধি মা ঐ অবস্থায় ঠাকুরকে রন্ধন করিয়া দিতে আর ইতস্ততঃ করিতেন না, ঠাকুরও তাঁহার রান্না খাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, দেখ তো, তোমার রান্না খেয়ে আমার শরীর কেমন ভাল আছে। ভাসুরপোর বিবাহ উপলক্ষে যাইয়া মাকে কিছু অধিক দিন দেশে থাকিতে হয় ; ঐ সময়ে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট অসহনীয় হওয়ায় ঠাকুর পত্র লিখিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন। তাহার আগে আর একবার অনুরূপ ব্যাপার ঘটে ও লোকমুখে উপর্যুপরি খবর দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেশ হইতে আনয়ন করান।

ঐশ্বরিক ভাবে সদা নিমগ্ন, বালকের অবস্থাপন্ন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীমা শিশুর মত ভুলাইয়া আহার করাইতেন ও সর্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চলিতেন। তিনি বলিয়াছেন : ঠাকুরের ভাত বাড়বার সময় (দুইহাত দিয়া দেখাইয়া) ভাতকে টিপে টিপে কম দেখাবে বলে সরুটি করে দিতুম। তিনি বেশী ভাত দেখলে ভয় পেতেন। গয়লার দুধ আধসের করে দিবার কথা ; দিবার সময় অন্য জায়গায় বিক্রি করে যে দুধটা বাঁচত, সবটা দিয়ে যেত। আমি সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখতুম। [বি] নিকুঞ্জদেবীকে বলিয়াছিলেন : ওখানে তখন একজন ব্রহ্মচারী থাকত, মনে বড় ভয় হত যদি ও'র কোন মন্দ করে। তাই দশ টাকা দিতে গেলুম যাতে খুশী থাকে। তা ঠিক টের পেয়েচেন, অমনি নবতে এসে বল্লেন, আমার মা আছে, কে মন্দ করবে ?

কখন কখন মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে পরাইতে শ্রীশ্রীমার সাধ হইত। মাল্যরচনায় তিনি কুশলা ছিলেন, মাঝে মাঝে সুন্দর গোড়ে মালা করিয়া মন্দিরে পাঠাইয়া দিতেন। নহবতে একদা সমস্ত দিন ধরিয়া মনের মতন মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে মালা পরিতে হইবে। ঠাকুর আসিলেন ও মালা পরিয়া গান ধরিলেন, 'ভূষণ বাকী কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেচি !' [নি]

নহবতের মত স্বল্পপরিসর ঘরে যে ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিতে প্রথম প্রথম কতবার শ্রীশ্রীমার মাথায় ঠোকা লাগিয়াছে, যে ঘরে একাকী থাকিতেও কত লোক কষ্ট বোধ করিবে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু ও রন্ধনের ব্যবস্থা, আর তাহারই মধ্যে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর থাকিয়া তিনি ঠাকুরের সেবায় ও সাধনায় সমাহিতা। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকাল ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিয়াও অনেক লোক তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। আবার ঐ ঘরে সকল সময়েই যে তিনি একা থাকিতেন তাহা নহে ; কখনও ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী[১] কখনও বা, ভক্তসমাগম বাড়িয়া যাওয়ার পর, দুই তিনটি ভক্ত স্ত্রীলোক। তাঁহার নহবতে বাস সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন : ঐ ছোট নহবত ঘরে কী করে যে তিনি মাসের পর মাস থাকতেন ! রাত

---

১ লক্ষ্মীদেবী শীতলার অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা ছিলেন ; মাকে মাঝে মাঝে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী গাহিয়া শুনাইতেন।

তিনটায় শৌচাদি সেরে, গঙ্গাস্নান করে² তিনি ঐ ঘরে ঢুকতেন, আর সন্ধ্যার পর বের হয়ে আবার শৌচাদি করতেন! দীর্ঘকাল এরকম চলবার পর যোগীন-মা আসেন; তিনি এতে মার অসুখ হবে বুঝে অনুযোগ করায় নহবতের নিকটে শৌচাদির স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ছোট ঘরে ভক্তদের আর ঠাকুরের জন্যে রান্না হত। ঠাকুরের অন্য খাবার সইত না, তাই মাছ জিয়ানো থাকত! শিকের উপর শিকে, তার উপর শিকে। ঐ ঘরের মধ্যেই দুইতিন জন, আবশ্যক হলে ততোধিক লোকের শোয়ার ব্যবস্থা! ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে একবার পঞ্চাশ ষাট জনের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকল খাবারই ঐ নহবতে তৈরী হয়েছিল; মেয়েভক্তেরাও ঐখানেই খেয়েছিলেন। রাত্রে যোগীন-মা ঠাকুরের কাছে গেলে ঠাকুর বলচেন, এত রাত্রে তোরা যাবি কোথা, শোবার জায়গাই বা কোথা হবে? আমার ঘরের পাশে ঘেরা বারান্দায় শুয়ে থাক। যোগীন-মা মার নিকট ঠাকুরের প্রস্তাব বলতে গিয়ে দেখেন, নহবত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—শোবার জায়গা হয়েচে![3] প্রয়োজন হইলে মা কিরূপ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজ করিতে সক্ষম ছিলেন, শরৎ মহারাজের উক্তিতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

পল্লীগ্রামের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের তুলনায় নহবত ঘরে বাস যে মুক্ত বিহঙ্গের পক্ষে পিঞ্জরবাসের তুল্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুর সত্যসত্যই নহবতের নাম দিয়াছিলেন 'খাঁচা' এবং খাঁচায় বাসকারী শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী লক্ষ্মীকে একসঙ্গে শুকশারী নামে নির্দেশ করিতেন। দ্বিতল নহবতের দক্ষিণদিকে একতলা বাড়ীতে ঠাকুর থাকিতেন; সম্ভবতঃ এই কারণেই মা উপরতলার ঘরটি ব্যবহার করিতেন না। অরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন, নহবতের নীচের ঘরটিতে ছিলুম, উপরের ঘরটি কখনো দেখি নি।

শ্রীশ্রীমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে ঠাকুর একান্ত উদাসীন ছিলেন না; তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পাড়ায় বেড়াইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর যখন পঞ্চবটী নির্জন হইত তখন মা ঠাকুরের উপস্থিতিতে কালীবাড়ীর খিড়কী-ফটক দিয়া নিকটবর্তী পাঁড়ে গিন্নীদের বাসায় যাইতেন; সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া ও কথা কহিয়া, আরতির সময় পঞ্চবটী পুনরায় নির্জন হইলে ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধভাবে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাঁহার পায়ে বাতরোগের সূত্রপাত হয়, সেই বাতে তিনি বাকি সমস্ত জীবনই কষ্ট পাইয়াছিলেন।

---

² শ্রীশ্রীমা নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটে স্নান করিতেন। একদিন সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় নামিবার সময় তিনি এক প্রকাণ্ড কুমীরের গায়ে প্রায় পা দিয়াছিলেন। বিভূতিবাবুকে বলিয়াছেন: তখন রাত্রি প্রায় তিনটে। অন্ধকার রাত্রি, বকুলতলার ঘাটে নামচি। একটা কালোপারা কী দেখলুম, মনে হল যেন জেলেদের হাঁড়ি। কাছে যেতেই হুস্ করে জলে নেমে গেল। আঁসটে আঁসটে গন্ধ। নবতে ফিরে এলুম, অনেকক্ষণ ধরে বুক দুড়দুড় কত্তে লাগল। আশুতোষ মিত্রকে বলিয়াছিলেন,—স্নান করিতে যাইবার কালে এক অন্ধকার রাত্রিতে অকস্মাৎ তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নহবত হইতে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আলোক দেখিতে পান; তদবধি স্নানের সময়ে ঐ আলোক নিত্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইত।

³ শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ।

বাঁকুড়ার ঈশ্বর চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমাকে অন্নপূর্ণাসদৃশ জ্ঞান করিতেন। তিনি মা-কালীর পাচক ছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে কলাইয়ের ডাল হিং দিয়া রাঁধিয়া ও ভাল ভাল জিনিস করিয়া মাকে খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার অনেক অলঙ্কার ছিল; ঠাকুর তাঁহাকে দুই ছড়া মূল্যবান তাবিজ, সোনার বালা ইত্যাদি গড়াইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমতী সীতাকে দর্শন করিবার সময় ঠাকুর তাঁহার হাতে ডায়মনকাটা বালা দেখিয়াছিলেন, ঠাকুরের নির্দেশে মার বালা উহার অনুরূপ করিয়া নির্মিত হয়।[৭]

প্রথমদিকে যখন ভক্তসমাগম তেমন বৃদ্ধি পায় নাই এবং শ্রীশ্রীমাকে কখন কখন একাও থাকিতে হইত তখন মেছুনীরা গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়া নহবতের বারান্দায় চুবড়ি রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখের কথা কহিত। কখন কখন সাধিকা ভৈরবীরা আসিয়া কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেন; তাঁহাদের আনীত ভিক্ষার দ্রব্য মা রন্ধন করিয়া দিতেন।

ক্রমে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যা যখন বাড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার সঙ্গ ও সাধনশিক্ষা ব্যপদেশে দুইচারি জন করিয়া ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন তখন শ্রীশ্রীমার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সমস্ত দিন তিনি একটুও বিশ্রামের সময় পাইতেন না। পানই কত সাজিতে হইত। তাহার মধ্যেও যদি একটুকু ফাঁক পড়িত, হয়তো ঠাকুর একগোছা পাট আনিয়া শিকা পাকাইয়া দিতে বলিতেন, ভক্তদের জন্য লুচি-মিষ্টির হাঁড়ি ঝুলাইয়া রাখিবেন! রাত্রে আবার কেবল ভক্তদের জন্যই তিন সের সাড়েতিন সের আটার রুটি হইত। যাহা হউক, ঠাকুর পরে ঐ কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সেবক জুটাইয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া লাটু (অদ্ভুতানন্দ) ধ্যান করিতেছিলেন, ঠাকুর ঐদিকে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, কার ধ্যান কচ্চিস রে লেটো? যার ধ্যান কচ্চিস তার গাড়ুতে যে জল নাই রে লেটো! ঐকথা শুনিয়াই লাটু আসন ছাড়িয়া উঠিলে ঠাকুর কহিলেন, ঐ নবতে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দেগে যা।

ঐরূপে দিবারাত্র নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না থাকিলেও শ্রীশ্রীমার একদিনের জন্যও নিরানন্দ ভাব লক্ষিত হয় নাই। যিনি মূর্তিমতী পবিত্রতা তিনি তো স্বয়ং আনন্দের

---

[৭] যোগীন-মার উক্তি: "মা সে সময় দক্ষিণেশ্বরে সীতে ঠাকরুণের মত থাকতেন। পরনে কস্তাপেড়ে শাড়ী, সীঁথের সিঁদুর, কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, গলায় সোনার কণ্ঠীহার, নাকে মস্ত বড় নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি—যে চুড়ি মথুরবাবু ঠাকুরকে সখীভাব সাধনের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কাছে থেকে বড় আনন্দ হত।"

—নির্বেদানন্দ-কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতি'।

উৎসরূপা। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে ঐ উৎসমুখ সর্বদাই উন্মুক্তঃ থাকিত।* ভক্ত-সমাগমে তখন ঠাকুরের নৃত্য, গীত, ভাব, সমাধি লাগিয়াই থাকিত ; আর নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া ছিল, মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহার ছিদ্রপথে সেই প্রেমচিত্র দর্শন করিয়া উল্লসিত হইতেন। তখন ঐ ভক্তদেরই একজন হইয়া ঠাকুরের কাছে থাকিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিত।

জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট-আত্মীয় ভ্রষ্টচরিত্র হওয়ায় সংসারে বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়। কিছুতেই অনর্থ দূর করিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটি প্রতিকারের বাসনায় ঠাকুরের কাছে আসেন। সাধুভক্ত লোক, নিশ্চয়ই কোন মন্ত্র বা দৈব ঔষধ জানা আছে, এইরূপ সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরের দয়া হইল। কিন্তু স্বয়ং কিছু ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাকে নহবত ঘর দেখাইয়া বলিলেন,--

দেখিতে পাইবে তথা নারী একজনা।
মনোমত মন্ত্রৌষধি আছে তাঁর জানা॥
পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে।
আমি কী বা জানি, তিনি আমার উপরে॥

শ্রীশ্রীমা পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি যাইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তখন -

রঙ্গ বুঝি শ্রীপ্রভুর বলিলা জননী।
তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি॥

স্ত্রীলোকটি ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া যাইতেই তিনি হাসিতে হাসিতে -

বিধিমতে বুঝাইয়া রমণীরে কন।
বাসনা পূরিবে তথা, হেথা অকারণ॥

স্ত্রীলোকটি মার কাছে পুনরাগমন করিলে এইবারে তাঁহার দয়া হইল।

বিল্বপত্র দিয়া মাতা বলিলেন তারে।
বাসনা পূরিবে, এই লয়ে যাও ঘরে॥ [পু]

---

* ঠাকুরের অনুধ্যানে শ্রীশ্রীমা এই সময়ে তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। সারদাপ্রসন্ন (নিগুণাতীত) দক্ষিণেশ্বরে যাইলে ঠাকুর প্রায়ই তাঁহাকে শেয়ারের গাড়ীভাড়া দিতেন। একদিন বলিলেন, নবত থেকে চারটে পয়সা চেয়ে নাও গে। এই সময় মা দুইএক জন ব্যতীত ভক্তদের কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সারদাপ্রসন্ন নহবতের নিকটে গিয়া দেখেন, চারিটি পয়সা বাহিরে রাখা আছে, অথচ এই পয়সা দেওয়ার কথা ঠাকুর কাহারও দ্বারা বলিয়া পাঠান নাই। এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সেবকে মা বলিয়াছিলেন : হ্যাঁ বাবা, কথা সত্যি। আমি নবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত। অতদূর থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম। ঠাকুরের মুখে ঐ কথা শুনেই আমি চারটি পয়সা রেখে দিয়েছিলুম। আর একদিন ঠাকুর নরেনকে খেতে বলেচেন। আমি নবত থেকে শুনেই, নরেন যা খেতে ভালবাসে—ছোলার ডাল চাঁড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখচি। ঠাকুর এসে দেখেন, তিনি যা বলতে এসেচেন, আমি আগে থেকেই তাই কচ্চি। [জা]

ঠাকুর যখন কামারপুকুরে যাইতেন, তখন এইরূপ রঙ্গরসের ব্যাপার নিত্যই ঘটিত। শ্রীশ্রীমাকেও সেখানে নহবতের মত ক্ষুদ্র ঘরে, লোকজনের মধ্যে সসঙ্কোচে থাকিতে হইত না। কামারপুকুরে ঠাকুর একদিন রন্ধনের ব্যবস্থা দিতেছেন : ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী, চার পয়সার পাঁচফোড়ন কিনে নিয়ে আয় তো! তারপর মাকে বলিলেন পাঁচমিশেলি ডাল কোরো, এমন সম্বুর' যেন শুয়োর গোঙায়! [বি]

আরও দুই দিনের ঘটনা শ্রীশ্রীমা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন :

কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁন্তুম। একদিন খেতে বসেচেন ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁন্তে পাত্ত। সে যেটা রেঁধেচে, খেয়ে বল্লেন, ও হৃদু, এটা যে রেঁধেচে সে রামদাস বদ্যি। আমি যেটা রেঁধেচি খেয়ে বল্লেন, আর এই ছিনাথ সেন! শ্রীনাথ সেন—হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলচে, তা বটে, তবে তোমার হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে - গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত, ডাকলেই হল; রামদাস বদ্যি, তার ষোল টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না! আর, লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে, সে তোমার সব সময় বান্ধব। ঠাকুর বল্লেন, তা বটে, তা বটে, এ সব সময় আছে। [গ]

রান্না-ঘরে কুকুর সেঁধুচ্চে। উনি বল্লেন হৃদয়কে, আমরা কি এখানে থাকচি? যেমন তেমন করে সেরে দাও। আমি শুনে বল্লুম, আচ্ছা তো স্বার্থপর! তিনি কোথা যাচ্ছিলেন -- শিওড়, আর যাওয়া হল না। দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, স্বার্থ ছাড়া আর কি কিছু আছে? এই বলে স্বার্থ সম্বন্ধেই নানা কথা বলতে লাগলেন— সে কী উচ্ছ্বাস! [বি]

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সন্ধ্যার পর মা ঠাকুরের ঘরে খাবার রাখিতে গিয়াছেন। ঠাকুর তখন খাটের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া ছিলেন, লক্ষ্মী খাবার রাখিয়া গেল মনে করিয়া বলিলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস। মা বলিলেন, হ্যাঁ, বন্ধ কল্লুম। মার গলা বুঝিতে পারিয়া ঠাকুর সংকুচিত হইয়া বলিলেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী, কিছু মনে কোরো নি। 'দিয়ে যেয়ো' না বলিয়া 'দিয়ে যাস' বলিয়া ফেলার জন্য ঠাকুরের এতই অনুশোচনা হইয়াছিল যে, সারারাত্রি তাঁহার ঘুম হইল না; সকালবেলা নহবতে মার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি— ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষু কথা বলে ফেল্লুম![৬]

আর একদিন শ্রীশ্রীমা অনেকগুলি ফলমিষ্টি লোককে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে ঠাকুর ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, অত খরচ কল্লে কী করে চলবে? মা একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া চলিয়া যাইতেই ঠাকুর অতি ব্যস্ততার সহিত রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে, তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর্, ও রাগলে আমরা সব নষ্ট হয়ে

---

[৬] বিভূতিবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার পর আমি যেমন যাই তেমনি গেছি, দেখি দরজাটি বন্ধ করা। আমি আস্তে আস্তে কপাটটি ঠেলে দিয়ে দেখি তিনি ঘুমুচ্চেন। আমি, কপাটটি দিয়ে চলে আসব, তিনি চোখ না চেয়েই বল্লেন, কপাটটা দিয়ে যে। আমি বল্লুম, দিচ্চি। তিনি আমার স্বর শুনেই বলচেন, তোমাকে তুই বলে ফেলেচি, তোমাকে তুই বলে ফেলেচি, আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী। যেন কত অপরাধ করেচেন!

যাবে ! [সু] মিষ্টান্নাদি খাদ্যবস্তু মা মুক্তহস্তে বিলাইতেন, কিন্তু তজ্জন্য ঘরে কখনও জিনিসের অভাব হইত না। একদিনের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন : দক্ষিণেশ্বরে খুব সরেস সন্দেশ এসেচে, আমি সবাইকে দিয়ে দিয়েচি। গোপালের মা আমার পাশে বসে, বলচেন, বৌমা, আমার গোপালের (ঠাকুরের) জন্যে কিছু রাখলে না ? আমি তো লজ্জায় মরি ! ঠিক সেই সময় ঘোড়ার গাড়ী করে নবগোপালবাবুর স্ত্রী এক চেঙ্গারি সেই সন্দেশ নিয়ে এল ! [বি]

দেহসম্বন্ধমাত্র না রাখিয়া অতি পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের যে আদর্শ এবার শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পাছে একটি দিনের একটি কথায় বা ব্যবহারে ঐ আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা মলিন হয় তজ্জন্য ঠাকুরের কী আকুলতা, কত সাবধানতাই না উপরিধৃত ঘটনা দুইটিতে প্রকাশ পাইতেছে।

ঠাকুরের সেবা শ্রীশ্রীমার অতি প্রিয় হইলেও তিনি কোন কালে তাহা নিজের একচেটিয়া করিবার প্রয়াস পান নাই ; বরং ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য করুণার্দ্রহৃদয়ে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ঠাকুরকে মিনতিও করিয়াছেন।

প্রবোধবাবু বলেন : কামারপুকুরে জমি-কেনার কাজে যাইয়া, কাজ সারিয়া প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ঠাকুরবাড়ীতে আসিতেই শিবুদাদার স্ত্রী কহিলেন, ঠাকুরপো, আজ তোমাকে রঘুবীরের পূজো কত্তে হবে। শিবুদাদা সেদিন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। রান্নাঘরে দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম একটি কালো অপরিচিতা মেয়ে রন্ধনের কাজে নিযুক্তা। বৌদিদির সংগে কথায় কথায় যাহা জানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি রহিল না যে, মেয়েটি চরিত্রহীনা। ইহাতে মন কেমন হইয়া গেল। এ ভোগ কি রঘুবীর গ্রহণ করিবেন ?—ইত্যাকার নানা সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গিয়া বৌদিদিকে বলিলাম, আমার এখনই জয়রামবাটী যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হল, আর থাকতে পারচি না। তাঁহার কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া একেবারে জয়রামবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অন্য সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, মা খাইতে বসিবেন। রামময় জানাইল একজনের ভাত অতিরিক্ত রাখাই আছে, মা একজনের চাল বেশী নিতে বলিয়াছিলেন !

রাত্রে যখন সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি, একজন প্রশ্ন করায় কামারপুকুর-সংক্রান্ত ঘটনাটি বিবৃত করিলাম, এবং রঘুবীরের প্রসাদ ত্যাগ করিয়া আসা আমার অন্যায় হইয়াছে কিনা মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। মা অতি প্রসন্নমুখে বলিলেন : বে—শ করেচ ; ভালই করেচ ; তুমি বিচা—র করে কাজ করেচ, বিচা—র করেই তো চলতে হয়।[৭] ঠাকুরকে ভোগ দিলেই কি হল ? যে-সে ভোগ কি তিনি নেন ? এক সময়ে

[৭] শ্রীশ্রীমা ড্যাস-চিহ্নিত স্থানগুলি টান দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

রামলালের মা ছেলেপুলেদের জন্যে ততটা শুচি পবিত্র হয়ে রঘুবীরের ভোগ রান্না করে দিতে পারত না। তাতে রঘুবীর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে স্বপ্ন দেন,—আজ দুদিন ধরে আমার খাওয়াই হচ্চে না।[৮] একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খাওয়া নিয়ে কী বিপদেই পড়েছিলুম শুন। রাত্রে ঠাকুরের খাওয়ার সময় সব ভক্তদের সরিয়ে দেওয়া হত: আমি তাঁর খাবার নিয়ে যেতুম, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতুম। একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবার জায়গা হয়েচে, আর আমি নবত থেকে থালা হাতে নিয়ে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েচি এমন সময় একটি মেয়ে-ভক্ত শশব্যস্ত হয়ে, দিন মা, আমাকে দিন—এই বলে, আমার হাত থেকে থালা নিয়ে ঠাকুরকে ধরে দিয়ে সরে গেল। আমি কাছে বসলুম। ঠাকুর আসনে বসেই বল্লেন, তুমি এ কী কল্লে? আমার খাবার নিজে না দিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? আমি খাই কী করে! তুমি কি ও মেয়েটাকে জান না? ও অমুকের ভাজ দেওরকে নিয়ে থাকে। আমি বল্লুম তা আমি জানি, আজকে খাও। ঠাকুর বল্লেন, আমি খেতে যে পাচ্চি না! তাঁকে একটু মিনতি করে বলাতে বল্লেন, আমার খাবার আর কোন দিন কারো হাতে দেবে না, বল? তাতে আমি জোড়হাত করে বল্লুম, তা যে আমি পারব নি ঠাকুর, চাইলেই যে আমাকে দিতে হবে, তবে তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। আমার কথায় খুশী হয়ে তখন ঠাকুর খেতে বসলেন।

---

৮ ৺রঘুবীরের সেবায় আনুকূল্য করিবার জন্য ঠাকুর পরে রামলালের মাসীমা অঘোরমণির কামারপুকুরে থাকার ব্যবস্থা করেন। রামলালের মা শাকম্ভরী দেবী ঠাকুরের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই, সম্ভবতঃ ১২৯৫ সালে, ৺পুরী গমনের পথে বৈতরণীতীরে দেহত্যাগ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহজ বুদ্ধিমত্তা

পানিহাটি গ্রামে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণের বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১২৯২ সালে ঠাকুর তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে ঐ দিনের 'আনন্দের মেলা—হরিনামের হাট-বাজার' দেখাইয়া আনিতে অভিলাষী হইলেন। অনেকগুলি ভক্ত যাইবেন স্থির হওয়ায় চারিখানি পানসি ভাড়া করা হইল।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সংগে যাইবেন কিনা স্থির করিবার জন্য ঠাকুরের অভিমত জানিতে চাহিলেন। জনৈক স্ত্রীভক্তকে ঠাকুর কহিলেন, তোমরা তো যাচ্ছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক। 'ইচ্ছা হয় তো চলুক'—এই কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন ঠাকুর মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। যদি মন খুলিয়া দিতেন তাহা হইলে বলিতেন, 'হ্যাঁ যাবে বইকি।' তিনি যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনেক লোক সংগে যাচ্ছে, সেখানেও ভিড়; অত ভিড়ে উৎসব দেখা আমার হবে না—আমি যাব না। মার অনুমতি লইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

উৎসবান্তে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঐ উৎসবের কথা-প্রসংগে কোন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন "অত ভিড়—তাহার উপর ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সংগে না যাইয়া ভালই করিয়াছে; ওকে সংগে দেখিলে লোকে বলিত, হংস হংসী এসেছে! ও খুব বুদ্ধিমতী!" [লী]

শ্রীশ্রীমার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ঠাকুর পূর্বেও কোন কোন ঘটনায় পাইয়াছিলেন। একবার মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায় দশহাজার টাকা দেওয়ার সংকল্প করে এবং ঐ পরিমাণ টাকার নোট সংগে লইয়া আসে। ঠাকুর তাহাতে নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত মাড়োয়ারীর অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন লছমীনারায়ণ মার নামে টাকাটা লিখিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, —"সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলেন, ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন—কী বল? শুনিয়াই ও বলিল, তা কেমন করিয়া হইবে?...আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে, কারণ আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না। টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না। ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।" [ল]

পরবর্তী কালে এবম্বিধ বহু ঘটনায় শ্রীশ্রীমার অসাধারণ বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার উচ্চশিক্ষিত শিষ্যেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে মা তাঁহাদিগকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

প্রবোধবাবু কয়েকদিন যাবৎ জয়রামবাটীতে বাস করিতেছিলেন, সন্ধ্যার পূর্বে হঠাৎ এক পত্র পাইয়া মহালয়া-রাত্রির অন্ধকারে আড়াইক্রোশ দূরবর্তী শ্যামবাজারে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পরদিন সকালে কার্যবিশেষে যোগ দিতে না পারিলে শত্রুদের দ্বারা তাঁহার ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধ্যার পর তাঁহার

সঙ্গে শ্রীশ্রীমার এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ 'প্রবোধ, এরাত্রে তোমার যাওয়া হবে না।' তুমি ভোররাত্রে উঠে যেয়ো।' 'সে কী মা, আমাকে যে যেতেই হবে।' 'যে লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল, সে তোমার জানাশুনা কি?' 'না মা, সম্পূর্ণ অপরিচিত।' 'যখন শত্রুতা চলচে, তখন এই অন্ধকার রাত্রে শত্রুরা তোমার মন্দ করবার জন্যে পথে লোক রেখে দিতে পারে। তারা কিছু না কল্লেও, বর্ষাকালে খালবিলের রাস্তায় সাপখোপ আছে, তা থেকে বিপদ হতে পারে। পুজোর মাথায় বিদেশ থেকে লোক চাকরি করে ঘরে ফিরচে এই মনে করে খালধারে কোন দুষ্টলোকও তোমার মন্দ কত্তে পারে। তাই বলচি, তোমার এরাত্রে যাওয়া হবে না। অম্বিকে ভোররাত্রে তোমাকে সঙ্গে করে শ্যামবাজার পেঁাছে দিয়ে আসবে। আর সোজা রাস্তায় যাবে না; জিবটে হয়ে ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে যাবে।'

শরৎ মহারাজ কোন সাধুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে আম পাঠাইয়াছেন, মা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। সেদিন বিকাল বেলা বদনগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু মাকে দর্শন করিতে আসিলে মা বলিলেন, দেখ বাবা, কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে আম নিয়ে পেঁাছে গেল; 'কোম্পানী' রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ এই সব করে কত সুবিদেই না করেচে! মার কথায় উৎসাহিত হইয়া প্রবোধবাবু বিজ্ঞানের নানা উন্নতি এবং ইংরাজ সরকারের দ্বারা আমাদের দেশের সুখ-সুবিধা কত বাড়িয়াছে তাহা সবিস্তার বলিয়া যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সায় দিয়া মাও শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রবোধবাবুব সব কথা বলা যখন শেষ হইল তখন মা মন্তব্য করিলেন, সব সুবিদে হয়েচে বটে বাবা, কিন্তু আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের অভাবটা বড় হয়েচে—কী বল? আগে অন্নবস্ত্রের অভাবটি এত ছিল না।

মহাযুদ্ধ-বিরতির সংবাদ আসিয়াছে। যতীন্দ্র ঘোষ পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ কৃত সন্ধি-শর্তের চৌদ্দ দফা শ্রীশ্রীমাকে শুনাইতে গেলেন। দুই-এক দফা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ। যতীনবাবু 'মুখস্থ' শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, মা পুনরায় বলিলেন, যদি অন্তঃস্থ হত তা হলে কথা ছিল না!

শেষোক্ত ঘটনায় শ্রীশ্রীমার শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্যও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন বিষয়ে জোর দিয়া কথা বলিবার সময় মা এমনভাবে শব্দবিন্যাস করিতেন এবং শব্দবিশেষে বা অক্ষরবিশেষে এমন জিগির বা টান দিয়া উচ্চারণ করিতেন যে, চিরকালের জন্য তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। তাঁহার সাধারণ কথাবার্তায়, এবং চলাচলনেও এমনই একটা স্বভাবসিদ্ধ মার্জিতরুচি ফুটিয়া উঠিত যে, সুসভ্য পাশ্চাত্ত ভক্তগণেরও তাহা বিস্ময় উৎপাদন করিত।[১]

---

১ সিস্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন: অতি অকপটচিত্তা নারী যে জ্ঞান ও মাধুর্য আয়ত্ত করিতে পারেন মায়ের মধ্যে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিদ্যামান দেখা যায়। তবুও আমার কাছে তাঁহার শিষ্টাচারের আভিজাত্য ও মহদুদার মন তাঁহার দেবীচরিত্রের মতই বিস্ময়কর। তাঁহার কাছে উত্থাপিত প্রশ্ন যতই অভিনব বা জটিল হউক না কেন, উহার প্রশস্ত ও উদার মীমাংসাটি বলিয়া দিতে কখনও তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।...তাঁহার অগোচর নূতন সমাজ-পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত হইয়া যদি কেহ তাঁহার কাছে আসে, অভ্রান্ত বোধির সাহায্যে তিনি বিভ্রাটের মর্ম গ্রহণ করেন এবং কিভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ঠাকুরের সেবা

(শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে)

১২৯১ সালের ২৫শে চৈত্র ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হয়। পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান করিয়া উহা বাড়িয়া গেল এবং ঔষধপথ্যের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ভাদ্র মাসের একদিন তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ হইতে রুধির নির্গত হইলে ভক্তগণ চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঐ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন এবং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ৫৫ নম্বর ভাড়াটে বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না বুঝিয়া প্রবীণ ভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকেও তথায় আনয়ন করিবার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে অন্দরমহল না থাকায় অত্যন্ত লজ্জাশীলা মা এখানে অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে কিরূপে বাস করিবেন তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। লজ্জারূপ পটে চিরকাল আবৃত থাকিলেও দেশকালপাত্র-ভেদে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে মা জানিতেন। ঠাকুরের জন্য সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাব হইয়াছে শুনিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে চলিয়া আসিলেন এবং ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

এখানে একমহল বাড়ীতে সকলের স্নানাদির জন্য একটি মাত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকায় শ্রীশ্রীমা রাত্রি তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং কখন যে ঐ সকল কাজ শেষ করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহই জানিতে পারিত না। সমস্ত দিন সেই সংকীর্ণ চাতালে থাকিয়া তিনি ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন, প্রস্তুত হওয়ার পর লোকজন সরাইয়া দেওয়া হইলে নিজেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। রাত্রি এগারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তিনি দ্বিতলে নামিয়া তাঁহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরে বড় জোর তিনঘণ্টা শুইয়া থাকিতেন। ঐরূপে দিনের পর দিন ঠাকুরের প্রধান সেবাকার্য সম্পন্ন করিলেও, যাহারা নিত্য সেখানে আসাযাওয়া করিত তাহাদের অনেকেও উহা কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। স্বল্পপরিমিত অথচ লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত গোপন করিয়া মানুষ যে দিনের পর দিন

নীরবে এমন কর্মময় জীবন কাটাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত এমনটি আর কখনও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-কার বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ

বিন্দুনিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে।
কৃপায় তাঁহার এবে দেখিনু নয়নে ॥

চিকিৎসায় প্রথমতঃ কিছু উপকার বোধ হইলেও, পরে অবস্থার আর কোনই উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন; এবং ডাক্তারের পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া ঠাকুরকে তথায় আনয়ন করিলেন। মাতাঠাকুরাণীও সেই সঙ্গে আসিলেন। সেদিন ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার। ত্যাগী যুবক ভক্তগণ, যাঁহাদের অনেকেই বাড়ী হইতে আসিয়া পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন, এখন একপ্রকার ঘরবাড়ী ছাড়িয়াই আসিলেন। মাকে রন্ধনাদি কার্যে সাহায্য করিতে ও তাঁহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য লক্ষ্মী-দেবীকে আনয়ন করা হইল। গোলাপ-মা-প্রমুখ স্ত্রীভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসাযাওয়া করিতে, কখনও বা থাকিয়া যাইতে লাগিলেন।

ফলফুল-সমন্বিত, সরসীদ্বয়শোভিত উদ্যানবাটীর সৌন্দর্য ও নির্জনতায় ঠাকুর আনন্দিত হইলেন। বিস্তীর্ণ স্থানের মুক্ত বায়ুতে ও সুচিকিৎসায় তাঁহার গলরোগেরও কিছু উপশম হইল। কতকটা সুস্থ বোধ করায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী বিকালে তিনটার সময় ঠাকুর সেবক-সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন ও নিচের হলঘরটি দেখিয়া উদ্যানেব পথে বেড়াইতে অগ্রসর হইলেন। সেদিন ছুটি থাকায় বহু গৃহস্থভক্ত উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের সকলের প্রতি করুণাময় হঠাৎ তাঁহাতে কল্পতরু-ভাবের প্রকাশ হইল এবং 'চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া, প্রায় সকলেরই বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের সুপ্ত আধ্যাত্মশক্তিকে জাগাইয়া দিলেন। ইহাতে বহু লোকের জন্মজন্মান্তরের পাপতাপ গ্রহণ করায় আবার রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। অশেষ যত্নে চিকিৎসা করিলেও কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন। গলার ক্ষত ক্রমে ভিতর হইতে বাহিরের দিকেও ফুটিয়া বাহির হইল। তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা একেবারে তারকেশ্বরে গিয়া বাবা তারকনাথের দরজায় হত্যা দিলেন।[১]

ঠাকুরের রোগমুক্তি সংকল্প করিয়া শ্রীশ্রীমা পড়িয়া রহিলেন। একে একে দুইদিন অতিবাহিত হইল। নিরম্বু উপবাসে দেহ ক্ষীণ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। আবিষ্টের মত পড়িয়া আছেন এমন অবস্থায় একটা শব্দ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অনেকগুলি একত্রসজ্জিত মৃৎপাত্রের উপর আঘাত করিয়া কেহ একটা-পাত্র ভাঙিয়া দিলে যেমন শব্দ উত্থিত হয়, শ্রুত শব্দটি উহার অনুরূপ। হঠাৎ তাঁহার মন ঊর্ধ্বগামী হইল—জাগতিক সম্পর্কের সীমারেখা অতিক্রম করিল—স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ, স্বামীর অসুখ, স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে স্ত্রীর ঐকান্তিক কামনা সমস্তই যেন কোথায় বিলীন হইতে চলিল। তিনি সংকল্পচ্যুত হইলেন বলা যায় না; সংকল্পাতীত

---

১ নিকুঞ্জদেবী বলেন, লক্ষ্মীদেবী ও একজন ঝি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তারকেশ্বরে গিয়াছিলেন। পুরুষ কে গিয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না।

হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি কি বিরাট মনে ঈশ্বরেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ তাহাই করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পরবর্তী আচরণ হইতে ইহাই অনুমিত হয়। পরক্ষণেই তাঁহার মন নিম্নভূমিতে অবরোহণ করিল, তিনি হত্যাদান হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন গভীর রাত্রি—অন্ধকার। দুর্বল শরীরে কোনরূপে মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া মা কুণ্ড হইতে স্নানজল লইয়া মুখে ও চোখে দিলেন এবং পরদিনই ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই ঠাকুর মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিগো, কিছু হল? আর সংগে সংগে নিজেই অংগুষ্ঠ নাড়িয়া উত্তর দিলেন,—কিছুই না।

কাশীপুরের বাগানে একদিন শ্রীশ্রীমা আড়াইসের দুধসমেত একটি বড় বাটি হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। তখন শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীবাবুরাম (বিবেকানন্দ ও প্রেমানন্দ) ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরেন। পায়ের গোড়ালির হাড়ে আঘাত লাগায় মার পা ফুলিয়া গিয়াছিল; তিনদিন তিনি ঠাকুরকে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই।

ঠাকুরের অসুখের সময়ের কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীমা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন:

তিনি নিজের ছিষ্টি যেন নিজেই খেয়েছিলেন। তখন অসুখ—মুখ দিয়ে লাল কাটচে; সে লাল আর বন্ধ হয় না। তখন গেঁড়িগুগলি সিদ্ধ করে তার ঝোল তাঁকে খাওয়ান হল, তাঁর লাল পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

গলার অসুখের সময় আমাকে বলচেন, 'উহু, কী কচ্চ? পলতে দিচ্ছ? আচ্ছা দাও।' পলতে দিয়ে পরিষ্কার কল্লুম, তিনি আর কিছু বল্লেন না। [বি]

আর একদিন বল্লেন, 'ইচ্ছা হচ্চে তোমার সংগে, আর কেউ থাকবে না—কেবল লাটু, রণজিৎ রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই।' [নি]

লীলাসম্বরণের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।' 'বরং পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়। কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট কোরো না।' 'কারো কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎকার কোরো না, তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।'[২] 'কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়।' 'তোমার কত নাতিপুতি, কিসের ভাবনা?' [নি]

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাত্রি একটার পর ঠাকুর গভীর সমাধিমগ্ন হন; পরদিন ১লা ভাদ্র দিবা দ্বিপ্রহরে সেই সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: যেদিন এমনি হবে, খিচুড়ি রান্না হয়েছিল, খিচুড়ি ধরে গেল—নীচেরটা পুড়ে গেল। ছেলেরা আমার উপর-উপর সেই খিচুড়িই খেলে। আমার একখানা দেশী কুঞ্জদার শাড়ী ছাতে শুকচ্ছিল, কে চুরি করে নিলে। পরদিন আমি হাতের বালা খুলতে যাচ্ছি,

---

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

তিনি খপ্ করে আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন,—আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর! [বি][৩]

---

[৩] শ্রীশ্রীমা ৺বৃন্দাবনে পুনরায় হাতের বালা খুলিতে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে মার তৎকালীন সঙ্গিনী নিকুঞ্জদেবী বলেন: বৃন্দাবনে মাকে ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি হাতের বালা খুলো না; গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিয়ো—কৃষ্ণ পতি যার, তার বিধবা হওয়া নাই, সে চিরসধবা। গৌরী-মার সঙ্গে দেখা হইলে মা তাঁহাকে ঠাকুরের কথা জানাইলেন, তিনিও বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে শ্লোকের পর শ্লোক মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গৌরী-মা এই সময়ে বৃন্দাবনের কোনও স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, ঠাকুরের আদেশে মাকে বৈষ্ণবশাস্ত্র শুনাইতে আসেন। [গৌরী-মার পূর্বনাম মৃড়ানী দেবী; তাঁহার বৈষ্ণবগুরুদত্ত নাম গৌরীদাসী।]

বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিবার পর তৃতীয়বার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসার পর, তখন সব লোকের ভয়ে—এ ও বলচে, ও তা বলচে—হাতের বালা খুলে ফেল্লুম: আর ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কী করে থাকব। গঙ্গাস্নানে যাব মনে কল্লুম, আমার বরাবর একটা গঙ্গা-বাই ছিল। একদিন দেখি কী, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসচেন আগে আগে; পেছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল—এইসব যত ভক্তেরা। কত লোক! দেখি কী, ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে আগে আগে আসচে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম, দেখচি ইনিই তো সব—এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাগাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম। [ধ] এই দর্শনের ফলে মার অন্তর হইতে সমাজের ভয় বিদূরিত হয়। তিনি বরাবর দুই হাতে দুইগাছি বালা রাখিতেন ও সরু লালপেড়ে কাপড় পরিতেন। সোনার তারে গাঁথা অতিক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা তাঁহার গলায় থাকিত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৃন্দাবনে সম্বৎসর

মহাসমাধির পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের দর্শন পাইয়া শ্রীশ্রীমা গভীর শোকের মধ্যেও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতা অপ্রকট হওয়ায় তিনি যে কী করিয়া শরীরের উপর মন রাখিতে পারিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অথচ ঠাকুরের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া যাইবেনই বা কিরূপে! ঠাকুর জীবোদ্ধার-কার্যের সূত্রপাত মাত্র করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে যে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে হইবে একথা তো ঠাকুরই নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার জীবন দ্বারা যে আদর্শ সংস্থাপিত হইবার কথা তাহার অনেকটাই তো বাকি!

ঠাকুরের অদর্শনে শ্রীশ্রীমা যেমন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তেমনি জীবনের কর্ণধার শ্রীগুরুদেবকে হারাইয়া বিষাদমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এখন পুণ্যস্থানসমূহে গমন করিতে এবং শ্রীগুরুর নির্দেশানুযায়ী তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে যত্নপর হইলেন। কাশীপুর হইতে মা ৬ই ভাদ্র বাগবাজারে শ্রীবলরাম বসুর বাড়ীতে আসেন; তথা হইতে ১৫ই ভাদ্র যোগীন (যোগানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), লাটু, (অদ্ভুতানন্দ), লক্ষ্মীদেবী, গোলাপ-মা ও নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে নিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন।[১] রাস্তায় প্রথমতঃ দেওঘরে নামিয়া দর্শনাদি করিয়াই পরবর্তী গাড়ীতে কাশীধামে যান ও কাশীতে তিনদিন মাত্র থাকিয়া তথাকার দর্শনাদি সম্পূর্ণ করেন। ৺বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া মার ভাব হয়, ভাবের ঘোরে সজোরে 'দুম্ দুম্' শব্দে পদক্ষেপ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাসায় আসিয়াই মা শুইয়া পড়িয়াছিলেন; প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন! [নি]

কাশী হইতে সকলে মিলিয়া অযোধ্যা গমন করেন এবং সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। বৃন্দাবনের পথে শ্রীশ্রীমা অভাবনীয়রূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন পাইলেন। ঠাকুরের হাতে যে ইষ্টকবচ ছিল তাহা অসুখের সময় তিনি মাকে দিয়াছিলেন। মা উহা সযত্নে নিজবাহুতে ধারণ ও যথাবিধি পূজা করিতেন। রেলগাড়ীতে তিনি ঐ কবচসুদ্ধ হাত জানালার পাশে উপরের দিকে রাখিয়া শয়ন করিবামাত্র ঠাকুর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, ওগো, হাতে সোনার ইষ্টকবচ এমন করে রেখেচ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে! মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচখানি হাত হইতে খুলিয়া নিলেন, এবং যে টিনের বাক্সে তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের ফটোখানি থাকিত তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ঐ কবচ তিনি আর কখনও হস্তে ধারণ করেন নাই।[২]

---

[১] নিকুঞ্জদেবী বৃন্দাবনে একমাস থাকিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন ও স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ৫।৬ মাস পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দও প্রত্যাবর্তন করেন।

[২] ঘটনাটি গণেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমার কাছে শুনিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের প্রথমভাগে মা ঐ ইষ্ট-কবচ মঠের ঠাকুরঘরে রাখিয়া নিত্যপূজা করিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দের হাতে দিয়া উহার পূজাবিধি শিখাইয়া দেন।

সম্ভবতঃ এই তৃতীয়বার দর্শনে তখনকার মত সান্ত্বনা লাভ করিলেও বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমার শোকসমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। ঠাকুরের তিরোভাবের অল্পদিন পূর্বে যোগীন-মা বৃন্দাবনে আসেন ; তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবামাত্র মা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, সঙ্গিনীরা কত বুঝায়, কিন্তু সেই ক্রন্দনের বেগ থামিয়াও থামিতে চায় না।

কত যুগ অতীত হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অবিরল অশ্রুমোচন করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী এই ব্রজভূমিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই অশ্রুর প্রতিবিন্দু অহেতুক প্রেমের পুণ্যজ্যোতিতে আজও সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। আর তাহার কতকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন-কাতরা শ্রীমতী সারদা-জননী নিজের বিরহাশ্রু মোচনের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া সুদূর কলিকাতা হইতে এখানেই ছুটিয়া আসিয়াছেন ! কোনও সময়ে ঠাকুরের মুখে শুনিয়া নিম্নোক্ত যে গানটি তিনি শিখিয়াছিলেন সেই গানটিই বা আজ তাঁহার মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কে বলিবে !

যদি কিশোরি, তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে ॥
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন,
শুনব না তোর বারণ, মানব না তোর রোদন,
প্যারী গো, আমরা থাকব না তোর সদন,
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে।[৩]

যাহা হউক, শ্রীমতী রাধারাণীর বহুবর্ষিত প্রেমাশ্রুধারা পূর্বেই বিরহের বৃন্দাবনকে মিলনের বৃন্দাবনে - নিত্যবাসস্থলীতে পরিণত করিয়াছিল। শ্রীশ্রীমাকেই তাই এখানে আসিয়া অধিক দিন কাঁদিতে হইল না ; ঘনঘন দর্শন দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আনন্দে ভরপুর করিয়া দিলেন। তাঁহার বাহিরের চালচলন, কথাবার্তা একটি কিশোরী বালিকার মত হইয়া গেল ; প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরে মন্দিরে তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমার এই বালিকামূর্তি পরেও কেহ কেহ নয়নগোচর করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ ঘটক বলেন : ১৩২৫ সালের চৈত্রমাসে দোলপূর্ণিমার পরদিন আমি মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, বেলা প্রায় দশটা হইবে। মা তখন কোয়ালপাড়া মঠে ঠাকুর-ঘরের পাশের ঘরটিতে ছিলেন। দুইটি অল্পবয়স্ক বালক ও একটি যুবক ঠিক সেই সময়ে মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে মা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ছেলে দুইটি প্রণাম করিয়া, মা তাহাদের মাথায় হাত দিবার পূর্বেই, তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে ! আমি ছেলে দুইটির মাথা আগাইয়া ধরিতেই মা তাহাদেরও মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহারা আবীর সঙ্গে আনিয়াছিল, 'আমরা আবীর দেব'—এই কথা শুনিবামাত্র মার ভাবান্তর হইল।

[৩] শ্রীশ্রীমার ভাইঝি রাধু হইতে প্রাপ্ত। মার সঙ্গে বহুবার গাহিয়া গানটি রাধুর কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

'আবীর দেবে ?'—বলিয়াই তিনি চটুলা বালিকার মত হইয়া গেলেন, আর ছেলেরা তাঁহার পাদপদ্মে আবীর দিতে-না-দিতে তাহাদেরই আবীর লইয়া চপল ভংগীতে তাহাদের গায়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়াই আমি নিজের কথা বলিয়া যাইতেছিলাম। আমার মাতৃভাব, আমার দিকে চাহিয়া যখন উত্তর দিতেছেন তখন প্রশান্ত মাতৃমূর্তি; আবার সংগে সংগেই চঞ্চলা হইয়া ছেলেদের গায়ে আবীর ছুঁড়িতেছেন। মার অমন মূর্তি আমি আর কোনও দিন দেখি নাই মনে মুদ্রিত হইয়া আছে, ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীমা কীর্তনগান শুনিতে ভালোবাসিতেন। বৃন্দাবনে লাটু ও লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়া তিনি মাঝে মাঝে ভগবানজীর আশ্রমে নামকীর্তন শুনিতে যাইতেন। কখনও বা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলের অলক্ষ্যে যমুনায় চলিয়া যাইতেন; পরে সংগিনীরা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে ফিরাইয়া আনিতেন। একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'আমিই রাধা।' [ন]

স্বগৃহে মাথুর-কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া বাগবাজারের কিরণ দত্ত শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। পদাবলীগায়ক যতীন্দ্র মিত্র[৪] পেশাদার কীর্তনীয়া ছিলেন না, অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই গান খুব জমিয়া যায়। সেইরাত্রেই অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া যতীনবাবু শ্রীমতীর বিরহের অবস্থায় গান শেষ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় গোলাপ মা চিকের ভিতর হইতে বলিলেন, একখানা মিলনের গান গেয়ে শেষ কর। কোনরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন করাইয়া দিয়া কীর্তন সমাপ্ত হইল, শ্রোতারাও একে একে আসর ত্যাগ করিয়া গেলেন! গানের সূচনাতেই মা কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, গান শেষ হইলেও সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ভাবভংগ হয় না দেখিয়া গোলাপ মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া কোনরূপ জলযোগের মত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন এবং গাড়ীতে উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াও মার ভাবের উপশম হইল না, ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন স্থানে যাইবার সময় ও তথা হইতে গৃহে ফিরিয়া মা ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। আজ তাহা না করিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জনৈক সেবক 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঐ ডাক ভিতরে প্রবেশ করিতেই মা চমকিয়া উঠিলেন ও ভাবাবেগ সংযত করিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর এই আজ দেখলুম! (আ)[৫]

---

[৪] গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে ইঁনি পাটনা হাইকোর্টের উকীল।

[৫] তপানন্দকে গাহিতে শুনিয়া শ্রীশ্রীমা রাধা-ভাবের এই গানটি সাগ্রহে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন:

হৃদি-বৃন্দাবনে আমারি কারণে সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাবে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর।
প্রমত্ত উজান মন-যমুনায় লুকাইয়া বাঁশী ডাকে—'সখি আয়';
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলংক রাধায়।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-অঙ্গধাতুর, সে কানু কেন লো দূরে—এতদূরে!
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব নিকুঞ্জ কানন,
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন, প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তাঁর।

রেকর্ড-গান যখন এদেশে নূতন হইয়াছে, কিরণবাবুর বাড়ী হইতে কয়েকখানি কীর্তনের রেকর্ড লইয়া আসা হয় এবং প্রত্যেকটি গান মা আগ্রহের সহিত পুনঃপুনঃ শ্রবণ করেন। [আ] জয়রামবাটীর নিকটবর্তী মির্জাপুর গ্রামের রামচন্দ্র সূত্রধর কৃষ্ণযাত্রার দল করিয়াছিল। একবার জগদ্ধাত্রীপূজার সময় মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া মা তাহার গান শুনিয়াছিলেন। [ই]

শ্রীশ্রীমা নিধুবনের সন্নিকটে রাধারমণের মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন। একদিন ভাবচক্ষে দেখিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী রাধারমণের পাশে দাঁড়াইয়া বীজন করিতেছেন। রাধারমণের কাছে মা নিজের দোষদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে কাহারও মন্দ চরিত্রের কথা উত্থাপন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখা দিয়া যোগানন্দকে ইষ্টমন্ত্র দান করিতে আদেশ করেন। তখন পর্যন্ত মা দুইতিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অন্যান্য সন্তান-গণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। ক্রমাগত তিনদিন ঠাকুরের আদেশ পাইবার পর পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি মন্ত্রদান করেন। যোগীন তাঁহার প্রিয়তম সেবক ও প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন। এখানে একদিন সকালে এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, যোগীন-মা অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম শুনাইলেও সমাধিভঙ্গ হয় নাই। পরে যোগানন্দ আসিয়া নাম শুনাইতে থাকিলে সমাধির গাঢ়তা কমিয়া আসে ও তিনি বলিয়া উঠেন, 'খাব'। সমাধিভঙ্গ হওয়ার মুখে ঠাকুর এইরূপ বলিতেন। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁহার সম্মুখে রাখা হইলে, ভাবাবেশে ঠাকুর যেমন করিতেন সেইভাবে মা খাবার ও জল একটু একটু গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের মত পানের তলার দিকটা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই পান চিবাইতে লাগিলেন। এই সময়ে যোগানন্দ মাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ঠাকুর যেরূপ উত্তর দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন। ভাবের উপশম হইলে মা বলিয়াছিলেন, তাঁহার উপর ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল। যোগীন মহারাজকে ঠাকুর বহুবার বলিয়াছেন, তাঁহার দেহে ও মার দেহে কোনও ভেদ নাই।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা সম্বৎসর বাস করেন, একবার পঞ্চক্রোশী পরিক্রমাও করিয়াছিলেন। মধ্যে কোন সময়ে যোগানন্দ, লক্ষ্মীদেবী ও যোগীন-মাকে সঙ্গে নিয়া হরিদ্বারে যান; হরিদ্বার হইতে ফিরিবার কালে জয়পুরে যাইয়া ৺গোবিন্দজী দর্শন করেন। জয়পুর হইতে তিনি পুষ্করেও গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নখ ও কেশ মা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেই নখ ও কেশের কিয়দংশ হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে দিয়া আসেন, অবশিষ্ট কেশ বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিবার পথে ৺প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। প্রয়াগে লক্ষ্মী মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন, মা করেন নাই।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার পায়ে বাতের সূত্রপাত হইলেও এই সময়ে উহা ততটা প্রবল হয় নাই, প্রবল হইলে পায়ে হাঁটিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে পারিতেন না। তিনি কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজায়, হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে এবং পুষ্করে সাবিত্রী-পাহাড়েও আরোহণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

পঞ্চতপা

শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বসুভবনে পক্ষকাল থাকিয়া, দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহসকলকে প্রণাম করিয়া যোগানন্দ ও গোলাপ-মার সংগে কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। [নি] বর্ধমান পর্যন্ত রেলে যাইয়া, অর্থাভাবে তথা হইতে উচালন পর্যন্ত আট ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হয় এবং মা তাহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। উচালনে ক্ষুধার মুখে গোলাপ-মার রান্না খিচুড়ি খাইয়া মা বলিয়াছিলেন, ও গোলাপ, কী অমৃতই তুমি রেঁধেচ!

এই সময়ে শ্রীশ্রীমার অর্থাভাবের একটি বিশেষ কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের সেবার জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল সেই টাকা সম্বন্ধে খাজাঞ্চীকে তিনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, যদি ওকে দাও তো দাও, না হলে গংগার জলে ফেল, কি অতিথিসেবায় দাও—যা ইচ্ছে কর। [নি] তখন হইতে মাকে প্রতিমাসে সাত টাকা করিয়া দেওয়া হইত। ঠাকুরের তিরোভাবের পর কালীবাড়ীর দীনুখাজাঞ্চী ও অন্যান্য সকলে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেয়। নরেন্দ্রনাথ ঐরূপ না করিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে পত্রে সে কথা অবগত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, বন্ধ করেচে, করুক—এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কী করব!

শ্রীশ্রীমাকে কামারপুকুরে রাখিয়া যোগানন্দ চলিয়া আসিলেন ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের মত তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মাকে এই সময়ে কখন কখন নিঃসংগ থাকিতেও হইয়াছে এবং সাধারণতঃ শাকভাত, ক্বচিৎ লবণের অভাবে শুধু ভাত খাইয়া তাঁহার দিন কাটিয়াছে। তাঁহাকে যে এতটা অভাব অনটনের মধ্যে দিনযাপন করিতে হইতেছে তাহা তাঁহার তপস্যানিরত ত্যাগী সন্তানগণ তৎকালে জানিতেই পারেন নাই। যাহা হউক, জানিবার পর অচিরে সকল বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা মাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন।[১] প্রসন্নকুমার কার্য-গতিকে কলিকাতায় থাকিতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে খবর দিয়া থাকিবেন। চিরকাল স্বল্পে ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট শ্রীশ্রীমা সংসারে অভাব অনটনের জন্য বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না। ঠাকুরের অদর্শন-জনিত অভাবই এই সময়ে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টের কারণ হইয়াছিল। যখনই এই অভাব-বোধ অসহনীয় হইয়া উঠিত তখনই ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিতেন, উপদেশাদি করিতেন, কখনও বা খিচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়াইতে বলিতেন।

---

[১] লক্ষ্মীদেবীর উক্তি হইতে জানা যায়ঃ শ্রীশ্রীমার ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য ঠাকুর বলরাম বসুর কাছে কয়েক শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন; বলরাম উহা নিজেদের জমিদারিতে খাটাইয়া ছয়মাস অন্তর মাকে ত্রিশ টাকা করিয়া সুদ দিতেন; পরে মা সেই মূল টাকা দিয়া ৺জগদ্ধাত্রীপূজার জন্য জমির ব্যবস্থা করেন।

কামারপুকুরে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে যাইয়া স্বীয় জননীর সঙ্গে কিছুদিন অন্ততঃ জগদ্ধাত্রীপূজোর সময়টা কাটাইয়া আসিতেন। ঠাকুরের তিরোভাবের পর তিনি যখন প্রথম প্রথম দেশে যাইতেন তখন কামারপুকুরেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। কিন্তু শেষের দিকে তিনি আর কামারপুকুরে বড় একটা যাইতেন না, জয়রামবাটীতেই থাকিতেন। বর্ধমান হইয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে কামারপুকুরে যাইতেই হইত, কিন্তু ১৩১২ সাল হইতে তাঁহাকে আর এই পথে গমনাগমন করিতে হয় নাই। মার এই পিত্রালয়প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া কেহ রহস্য করিয়া বলিয়াছিল, আপনি তো ঠাকুরের বাড়ী একবারও যান না, কলকাতা থেকে দেশে এলেই বাপের বাড়ীতে এসে থাকেন—এটি বোধ হয় আপনাদের পূর্ব পূর্ব ধারা? তাহাতে মা হাসিয়া উত্তর দেন, তা নয় বাবা, ঠাকুরের বাড়ী কি ভুলতে পারি? শিবু আমার ভিক্ষেপুত্র। তবে ঠাকুর এখন স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন, গেলে বড়ই কষ্ট বোধ হয়, এজন্যে যাই না। [৮] কামারপুকুরের পারিবারিক পরিস্থিতিও তাঁহার আজীবন তথায় বাসের অনুকূলে ছিল না। দুঃখ করিয়াই মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের এই একটি কথা আমি রাখতে পারি নি।

১২৯৫ সালের প্রারম্ভে দেশ হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটে বাড়ীতে ছয়মাস বাস করেন। এখানে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাকে স্বরচিত মাতৃস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া 'তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।[২]

বেলুড়ে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মা ও গোলাপ-মার সঙ্গে থাকিয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে একদিন রাত্রে ছাদে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে তিনি নির্বিকল্প-সমাধি মগ্ন হন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হওয়ার পরেও কিছুদিন যাবৎ তাঁহাতে ভাবাতীত ভাবের একটা আবেশ বিদ্যমান ছিল, এবং লাল নীল বিবিধ জ্যোতিতে তাঁহার মন লীন হইয়া যাইত। বিশ্বেশ্বরানন্দকে মা বলিয়াছিলেন, এভাব আরও কিছুদিন থাকিলে দেহে মন ফিরাইয়া আনা দুষ্কর হইত।

অতঃপর শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন মা, যোগীন-মার গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ৺পুরীধামে গমন করেন। কলিকাতা হইতে চাঁদবালি পর্যন্ত বড় জাহাজে ও চাঁদবালি হইতে কটক পর্যন্ত ক্যানেল স্টীমারে গিয়া তথা হইতে গোযানে পুরী যাইতে হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি পেঁছিবার জন্য শরৎ মহারাজ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি গাড়ী হাঁকাইয়াছিলেন। সকালবেলা পুরীতে পেঁছিয়াই সকলে মিলিয়া ৺জগন্নাথ দর্শন করিতে যান। এখানে মা বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসী' বাড়ীতে ২৫শে কার্তিক হইতে দুইমাস বাস করেন[৩] এবং ঠাকুর জগন্নাথ-দর্শনে যান

---

[২] লেখককে অভেদানন্দজী বলিয়াছেন, তিনি যখন শ্রীশ্রীমাকে স্তোত্র শুনাইয়াছিলেন শ্রীশ্রীমা তখন নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ীতে, মঠ বরাহনগরে।

[৩] 'শ্রীম'-দিনলিপিতে আছে: Ma's pilgrimage to Jagannath 5th November, 1888. Returns to our house Saturday at 12 noon—পৌ-শু-১১শ.—12th Jan, 1889. [পঞ্জিকানুসারে ১২৯৫ সালের ২৫শে কার্তিক ৯ই নভেম্বর, ৬ দণ্ড ৩৮ পলের পর হইতে ২৫শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী, ৫৬ দণ্ড ২ পল পর্যন্ত অশুদ্ধ কাল।]

নাই বলিয়া একদিন ঠাকুরের ছবি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে জগন্নাথ-দর্শন করান। মা বলিতেন, 'ছায়া কায়া ঘট পট সমান।' পুরীর পাণ্ডা গোবিন্দ শিংগারী শিবিকায় করিয়া জগন্নাথ-দর্শনে লইয়া যাইতে চাহিলে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, না গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি তোমার পেছনে পেছনে দীনহীন কাংগালিনীর মত যাব। ৺জগন্নাথকে দর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে আছেন. আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা কচ্চি। জগন্নাথকে তিনি স্বপ্নে শিব-মূর্তিরূপেও দর্শন করিয়াছিলেন।

পুরী হইতে কলিকাতা ফিরিবার তিনচারি সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীমা স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, নির্মলানন্দ, মাষ্টার মহাশয় ও লক্ষ্মীদেবীর সংগে বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুরে যান। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল পূর্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাকে পাইয়া স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দিত হন। আঁটপুরে সপ্তাহ কাল থাকিয়া মা গোঘাটে তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২৯৬ সালে দোলের পূর্বে শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় পুনরাগমন করেন। এখানে মাষ্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাসায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া চৈত্রমাসের মাঝামাঝি স্বামী অদ্বৈতানন্দের সংগে ৺গয়া যান।[৪] ঠাকুর স্বীয় জননীর উদ্দেশ্যে শ্রীগদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। গয়াকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া মা বোধগয়া দেখিতে গিয়াছিলেন; বোধগয়া-মঠের ঐশ্বর্য তাঁহার গৃহত্যাগী আশ্রয়হীন অর্ধাশনক্লিষ্ট সন্তানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদিগকেও ঐরূপ একটি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। গয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিবার কয়েক দিন পরেই তিনি বসু-ভবনে চলিয়া আসেন। বলরামবাবুর তখন অসুখ চলিয়াছে, ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ ঠাকুর প্রিয় ভক্তকে নিজ সকাশে টানিয়া লন।

শ্রীশ্রীমা গৃহী ভক্তদের মধ্যে বলরামবাবুকে সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তিনি ঠাকুরের কিরূপ পরমাত্মীয় ছিলেন তাহা মার নিম্নোক্ত কথা হইতে বুঝা যায়: রামের মার (বলরামবাবুর স্ত্রীর) অসুখ হয়েছিল। ঠাকুর আমাকে বল্লেন, যাও, দেখে এসগে। আমি বল্লুম, যাব কিসে? গাড়ী টাড়ী নাই। ঠাকুর বল্লেন, আমার বলরামের সংসার ভেংগে যাচ্চে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও! শেষে পালকি পাওয়া গেল, দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলুম। আর একবার রামের মার অসুখ হয়—তখন আমি শ্যামপুকুরে—রাত্রে হেঁটে দেখতে গেলুম। [গ]

পরবর্তী জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীমা ঘুসুড়ীর ভাড়াটে বাড়ীতে আসেন। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গান শুনাইয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য পরিব্রাজকবেশে বহির্গত হন। যাত্রাকালে স্বামিজীর সংগী গংগাধর মহারাজকে মা

---

[৪] ৺বৃন্দাবন হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বলরামবাবুকে লিখিয়াছেন: মাতাঠাকুরাণী ৺গয়াধামে সংগ্র যাইবেন লিখিয়াছেন এবং গয়াধাম হইতে আসিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। [ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ]

বলিয়াছিলেন : বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলুম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।[৫]

ঘুসুড়ীতে ভাদ্রমাস পর্যন্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীমা রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন ও চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের ভাড়াটে বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। এই বাড়ীতে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ পুত্রসংগে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করেন। আজন্ম মাতৃহীন, অশেষ যত্নে প্রতিপালিত দুই বছরের শিশুকে লইয়া গিরিশ যখন এই বাড়ীতে আসেন তখন ছেলেটি মাকে দর্শন করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে, উ-উ করিয়া উপরে যেখানে মা ছিলেন সেইদিকে অংগুলিনির্দেশ করিতে থাকে। উপরে লইয়া যাওয়া হইলে সে মার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করে ও নীচে আসিয়া পিতাকে উপরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে থাকে। ছেলে কোলে, চোখে জলের ধারা, কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া গিরিশ সাষ্টাংগ প্রণিপাত করিয়া বলেন, মা, এই ছেলে হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিতে শুনিয়াছি, কোন সময়ে বরাহনগর মাঠে তিনি একদিন মাকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন ; মা সেই রান্নার, যদিও ভাত-ডাল-চচ্চড়ি মাত্র, ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১২৯৭ সালে দুর্গাপূজার পরে দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা তথায় কিছু অধিককাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৬] ঠাকুরের পার্ষদভক্তগণের অনেকে এই সময়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী-দর্শনে আসিয়া মার অহেতুক স্নেহলাভে ধন্য হন।

বরাহনগরে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার কিছুকাল পরেই গিরিশবাবুর দেবপ্রতিম পুত্রটি দেহত্যাগ করে। পত্নীহারা পুত্রহারা গিরিশকে সঙ্গে করিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ জয়রামবাটীতে উপনীত হন। স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে মাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই গিরিশ মায়ের শ্রীমুখ দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের ছয়মাস পরে কলেরা হইয়া গিরিশের জীবনের আশা পরিত্যক্ত হয় ও সেই অবস্থায় দেখিতে পান, এক স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি অমৃতাস্বাদ বস্তুবিশেষ তাঁহার মুখে দিয়া বলিতেছেন, এই মহাপ্রসাদ খাও, তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর ভয় নাই। সেই মা-ই যে এই মা! তীক্ষ্ণবুদ্ধি গিরিশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, গুরুলাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ঠাকুরের পরমাশ্রয়প্রাপ্তি—সমস্তই এই মায়ের করুণা। এতকাল তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে গিরিশ বলিয়াছিলেন, ঠাকুর হয়েচেন ছবি, আর তুমি হয়েচ বৌমা, স্বেচ্ছায় না ধরা দিলে কার সাধ্য তোমাদের ধরে।

১২৯৮ সালের বৈশাখ হইতে প্রায় চারিমাস গিরিশবাবু জয়রামবাটীতে ও কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমার স্নেহচ্ছায়ায় পরমশান্তিতে বাস করেন। নিরঞ্জন মহারাজ মার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন, তাঁহার পরামর্শে পাচক ও ভৃত্য সঙ্গে আনা হইয়াছিল ; এবং স্বামী সুবোধানন্দ, হরিপদ ও কানাই (বোধানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ) তাঁহাদের সহগামী হইয়াছিলেন। গিরিশবাবু ও নিরঞ্জন মহারাজ ব্যতীত অপর সকলেই প্রায় দুই সপ্তাহ পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[৫] স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'।

[৬] ১২৯৭ সালের দুর্গাপূজা ৪ঠা কার্তিক তারিখে পড়িয়াছে।

কার্তিক মাসের শেষভাগে ৺জগদ্ধাত্রীপূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া শরৎ মহারাজ জয়রামবাটীতে আসেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সান্যাল মহাশয়, হরমোহন মিত্র, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও কালীকৃষ্ণ (বিরজানন্দ)। পূজা সুনিষ্পন্ন হইল, কিন্তু একে একে তাঁহারা সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী হইলেন। শ্রীশ্রীমার ভাবনার ও পরিশ্রমের অন্ত রহিল না। যাহা হউক, কয়েকদিনের মধ্যেই অন্নপথ্য করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া যান।

১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং আরও কয়েকজন কামারপুকুর দর্শন করিতে যান। [লী] কামারপুকুর হইতে তাঁহারা জয়রামবাটীতেও যে গিয়াছিলেন ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

১২৯৯ সালের কোনও সময়ে দেশ হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীমা কিছুকাল বেলুড়ে বাস করেন বলিয়া মনে হয়। ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরেই ৺কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে টাকার প্রাপ্তিসংবাদ ও উৎসবের বিবরণ দিয়া সারদানন্দ যে পত্র লিখেন তাহাতে কোন ঠিকানা দেওয়া ছিল না; বেলুড় ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া অনুমান হয়, পত্রলেখক এই সময়ে বেলুড়ে মায়ের কাছে ছিলেন। মায়ের খবর তখন বাহিরে কাহাকেও দেওয়া হইত না।

১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে বেলুড়ে আসিয়া শ্রীশ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে কয়েক মাস অবস্থান করেন। এই বাড়ীতে শ্রীদুর্গাচরণ নাগ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। ভাবের আবেগে নাগ মহাশয়ের সর্বশরীর কাঁপিতেছিল। তাঁহার আনীত সন্দেশ স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া মা তাঁহাকে স্বহস্তে প্রসাদ খাওয়াইয়া দেন; আর নাগ মহাশয় 'বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল' বলিতে বলিতে আনন্দে অধীর হন।[৭] মার দেওয়া একখানি কাপড় তিনি পরিধান না করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। পরবর্তী কালে শচীবালা সরকার মায়ের কলিকাতার বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, মা ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঝুলানো স্বামিজীর ছবি, গিরিশবাবুর ছবি ও নাগ-মহাশয়ের ছবি এক এক করিয়া ভিজা গামছায় মুছিলেন এবং প্রত্যেকটিতে চন্দনের ফোঁটা দিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। তাহার পরে নাগ-মহাশয়ের ছবিখানি হাতে নিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, কত ভক্তই আসচে, এমনটি আর দেখচি নি!

নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমার একটি অভিনব দর্শন উপস্থিত হয়। তিনি দেখিয়াছিলেন—ঠাকুর গঙ্গায় নামিলেন, নামিবামাত্র তাঁহার দেহ গঙ্গাজলে মিশিয়া গেল; স্বামিজী 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে সেই জল চারিদিকে দুই হাতে অগণিত লোকের মাথায় ছিটাইয়া দিতেছেন ও তাহারা সদ্যোমুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে! দৃশ্যটি মার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, ঠাকুরের দেহে পদস্পর্শ হওয়ার ভয়ে কয়েকদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতে পারেন নাই।

এই বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মার সঙ্গে ক্রমাগত পাঁচদিন পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। একতলার ছাদের উপর মাটি ফেলিয়া পঞ্চতপার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। [নি] মা বলিয়াছেন: ঠাকুরের দেহরক্ষার পর পাগলের মতন হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম, কিন্তু মনের শান্তি কোথাও পেলুম না। আমার এই অবস্থা দেখে যোগেন

৭ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত 'সাধু নাগ-মহাশয়'।

(যোগীন-মা) বল্লে, মা, চল আমরা পঞ্চতপা করি, তবেই মনের আগুন নিভবে। পঞ্চতপার যোগাড় করা হল। চারদিকে পাঁচহাত অন্তর অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড, তাতে ঘুটের আগুন, আর উপরে সূর্যের তেজ। বুঝতেই তো পার, ব্যাপার কী! সকালে স্নান করে এসে দেখি, আগুন খুব জ্বলচে। প্রাণে বড় ভয় হল—কী করে এর ভিতর যাব আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকব! যোগেন বল্লে, কোন ভয় নাই মা, এস। তখন মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে দেখি আগুনের কোন তাপ নাই! কিন্তু পাঁচ-পাঁচদিন এই রকমে কাজ করায় শরীর যেন পোড়া কাঠ হয়েছিল। [উ]

পঞ্চতপা করিবার পূর্বে দেশে থাকিতে শ্রীশ্রীমা কিছুদিন যাবৎ কিশোরবয়স্কা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মাথায় রুক্ষ চুল ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পঞ্চতপা করিবার পর এই সন্ন্যাসিনী তাঁহার দেহে মিলাইয়া যান। বিশ্বেশ্বরানন্দকে মা বলিয়াছিলেন: আমি দেখতুম, দশ-বার বছরের একটি মেয়ে, গেরুয়া পরা, সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে আর আমাকে যেন কিছু কত্তে বলচে। তখন আমার ভিতর থেকে উঠল, 'পঞ্চতপা'। পঞ্চতপা কী, জানতুম না। যোগেনকে বল্লুম, পঞ্চতপা কী?[৮]

'পঞ্চতপা টপা এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া?' অরূপানন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: পার্বতীও শিবের জন্যে করেছিলেন। এসব করা লোকের জন্যে। না হলে লোকে বলবে, কই, সাধারণের মতন খায় দায়, আছে! আর পঞ্চতপা টপা মেয়েলি—যেমন ব্রত সব করে না?

---

[৮] পঞ্চতপার যাবতীয় ব্যাপার ৫ সংখ্যার সঙ্গে জড়িত, ৫টি তাপের মধ্যে বসিয়া ৫ দিন তপস্যা করাই বিধি। শ্রীশ্রীমাও যে ৫ দিনেই ব্রত সাঙ্গ করিয়াছিলেন একথা অনেকের নিকট শুনিয়াছি। উমেশ দত্ত ৫ দিনের স্থলে ৭ দিনের কথা এবং সন্ন্যাসিনীর স্থলে দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর কথা লিখিয়াছেন (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৫নং স্মৃতিকথা)। দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, মার পক্ষে সন্ন্যাসিনী দেখাই স্বাভাবিক, যেহেতু ঐ মূর্তি তাঁহার নিজের প্রতিরূপ। এক পত্রে উমেশবাবু ঐ দুইটি বিষয়ে নিজের স্মৃতির ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বজনবিয়োগ

১৩০০ সালের পৌষ মাসে বলরাম বসুর কন্যা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। কন্যার শোকে ও রোগে ভুগিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে; কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার কথা হইলে তিনি শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতে চাহেন। মাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয় এবং মা, কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁহার গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা, স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, ত্রিগুণাতীত, যোগীন মহারাজের পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কৈলোয়ার নামক স্থানে গমন করেন। কৈলোয়ারে তাঁহারা দুইমাস ছিলেন। মা তথাকার বন্যহরিণসমূহের দল বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও পক্ষিবৎ দ্রুতগতি দেখিয়া বালিকার মত আনন্দিত হন।[১]

কৈলোয়ার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা দেশে যান, পুনরায় দেশ হইতে আসিয়া এক মাস বেলুড়ে বাস করেন। [নি] বাবুরাম-জননী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী সেইবারে নূতন করিয়া স্বগৃহে জগদম্বার পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন. তাঁহার আমন্ত্রণে যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও গুপ্ত মহারাজকে সঙ্গে করিয়া মা আঁটপুরে যান ও পূজার কয়েকদিন তথায় থাকিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

১৩০১ সালের শেষভাগে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা পুনরায় ৺কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে মানস করেন এবং তীর্থ করাইবার অভিলাষে স্বীয় গর্ভধারিণীকে ও সহোদরগণকে দেশ হইতে আনাইয়া লন। স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ফাল্গুন হইতে বৈশাখের কিছুদিন পর্যন্ত অন্যূন দুই মাস তাঁহার বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করেন।[৩] কলিকাতায় ফিরিয়া মা তাঁহার

---

১ শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: ওদেশে লোকের কত দুঃখ জান? ওদেশে ছোট ছোট খেজুরগাছ, তাতে রস হয়। শিয়ালে এসে রস খেয়ে যেলে; তাই লোকেরা মাটিতে গর্ত করে সারারাত্রি তাতে দাঁড়িয়ে থাকে। গর্তের মুখে, তাদের মাথার উপরে মাটির খোলা দিয়ে রাখে; মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে আর 'দূর দূর' করে শিয়াল তাড়ায়। [বি]

২ আঁটপুরে ছয়সাত বছরের মেয়ে চণ্ডী ও দুর্গা খিড়কীর পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়াছে দুপুরবেলা। শ্রীশ্রীমা দোতলা হইতে দেখিতে পাইয়াই নাবিয়া গেলেন, পাছে মেয়ে দুইটি ডুবিয়া যায় এই ভয়ে; আর বলিলেন, তোরা বাড়ী যা, আমি কেচে নিয়ে যাচ্ছি। কাপড় কাচিয়া মা যখন শুকাইতে দিতেছেন শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ও আবাগী মেয়েরা, মাকে দিয়ে কাপড় কাচিয়েচিস? মা কহিলেন, তা কেন, আমিই ওদের কাপড় রেখে যেতে বলেচি। [নরেশ ঘোষ-কথিত]

৩ শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনবাসের সময় এইরূপে নিরূপিত হয়: শান্তিরাম ঘোষ সস্ত্রীক হরিবল্লভ বসুকে সঙ্গে নিয়া ১৩০১ সালের দোলপূর্ণিমার (২৮শে ফাল্গুনে) দুই এক দিন পূর্বে বৃন্দাবনে পৌঁছেন। মা তাহার পূর্ব হইতেই বৃন্দাবনে ছিলেন। প্রায় দেড়মাস পরে তাঁহারা যখন বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন, মা তখনও বৃন্দাবনে থাকেন। কালাবাবুর কুঞ্জের বাহিরের গেটে, ভিতরে ঢুকিতে বামদিকের ঘরখানিতে মা থাকিতেন।

জননী ও সহোদরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং মাষ্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাসায় সপ্তাহ দুই থাকিয়া বৈশাখের শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমা একটি ছোট বালগোপাল-মূর্তি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মূর্তিটিকে পূজা করা হইত না। একদিন মা দেখিতে পান, গোপাল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে এনে ফেলে রেখেচ—তুমি আমাকে খেতে দাও নি, পূজো কর নি, তুমি পূজো না কল্লে আমাকে কেউ পূজো করবে না। পরদিনই মা মূর্তিটি বাহির করিয়া উহার মুখচুম্বন করেন এবং পূজা করিয়া তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের পার্শ্বে রাখিয়া দেন। [ম]

১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা সরকারবাড়ী লেনের গুদামওয়ালা বাড়ীতে পাঁচছয় মাস বাস করেন। গোপালের মা, গোলাপ মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তগণকে লইয়া মা ঐ বাড়ীর তেতলায় থাকিতেন; স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ ও অপর দুই একজন সাধু দোতলায় থাকিয়া তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। বৈশাখের শেষের দিকে বলরামবাবুর পুত্রের বিবাহোপলক্ষে মাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বসু-ভবনের সন্নিকটে ৫৯-২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ শরৎ সরকারের বাড়ীতে রাখা হয়; বসু-ভবন তখন কলি-ফেরানো হইতেছিল। শরৎবাবু স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য ও ভক্তিমান লোক ছিলেন, একমাস মা তাঁহার বাড়ীতে বাস করেন।

শরৎবাবুর মাসতুত ভাই নরেন ঘোষ (গৌরবাবু) এই সময়কার একটি ঘটনার নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন: সরকার-বাড়ীতে গৌর প্রভৃতি আটদশ বছরের ছেলেরা রোজ দুপুরে বুড়ী-বুড়ী খেলা করিত। ছেলেদের মধ্যে সেদিন কেহ বুড়ী হইতে চাহিল না, মাকে বলিল, তুমি আমাদের বুড়ী হবে? মা ধীরে ধীরে যাইয়া বুড়ীর আসন ইটের উপর বসিলেন। মহা আনন্দে ছেলেরা মায়ের মাথায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে ও একজন তাহাদিগকে তাড়া দিতেছে। এমন সময় গোলমাল শুনিয়া গৌরের মা আসিলেন ও ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, বুড়ী করবার আর লোক পাও নি? মাকে তিনি প্রণাম করিয়া ঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। মা কহিলেন, ওদের তো একজন বুড়ী চাই; কেউ হতে চাচ্ছিল না, তাই আমিই বুড়ী হলুম!

১৩০৪ সালের শেষভাগে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা বোসপাড়া লেনের ১০-২ নম্বর বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তাঁহার জীবনে কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা পরপর আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৩০৫ সালের মহাষ্টমীর দিন (৬ই কার্তিক) সন্ধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসেন এবং ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া বলিতে থাকেন, —মা, এই তো ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে সেই ফকিরটা শাপ দিলে, হেগে হেগে তিনদিনের ভেতর এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাই কিনা আমার হল! সামান্য একটা ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না? মা বলিলেন, —বাবা, শঙ্করাচার্য'ও তো শুনতে পাই এমনি করে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর ত'ার নিজের শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙ্গতে আসেন নি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো

মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনে গেছেন! স্বামিজী বলিলেন, তুমি যাই বল না কেন, আমি মানি না। মা উত্তর দিলেন, না মেনে থাকবার কি যো আছে? তোমার টিকি যে বাঁধা! স্বামিজী সজলনয়নে দুইহাতে মার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। [আ]

উত্তর ভারত পরিভ্রমণান্তে আসিয়া সিস্টার নিবেদিতা কার্তিকের মধ্যভাগ হইতে আটদশ দিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বাস করেন। আমেরিকাবাসিনী মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যাকলীয়ড এই সময়ে ভারতে অবস্থান করিতেছিলেন; দ্বিধাহীনচিত্তে মা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা এই সকল বিদেশিনী ভক্তমহিলাদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিয়াছেন। মিসেস্ বুলের একান্ত আগ্রহে এই সময়ে এই প্রথম মায়ের দুইখানি ফটো তোলা হইয়াছিল।[৪]

৺কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নবনির্মিত মঠে আসেন ও স্বহস্তে পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের পূজাকার্য সম্পন্ন করেন। সিস্টার নিবেদিতা ঐদিন অপরাহ্ণে মঠে আসিয়া মা, স্বামিজী, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও শরৎ মহারাজকে সঙ্গে নিয়া বাগবাজারে প্রত্যাবর্তন করেন; তাঁহাদের উপস্থিতিতে বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ীতে নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫ই চৈত্র শ্রীশ্রীমার জীবনে একটি গভীর বেদনাদায়ক দিন। স্বামী যোগানন্দ যিনি দ্বাদশ বৎসর তাঁহার সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, দীর্ঘ চারিমাস রক্তামাশয় ও জ্বরে ভুগিয়া অকালে দেহরক্ষা করেন। ৺কাশীক্ষেত্রে অতি কঠোর তপশ্চর্যার ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই অসুখের সময় ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও বুড়োবাবা (দীনু মহারাজ) তাঁহার খুব সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব হইতেই তাঁহার সহকারী-রূপে ফাইফরমাস খাটিতেন; বুড়োবাবা সম্ভবতঃ তাঁহার মন্ত্রশিষ্যও ছিলেন।

যোগীন শ্রীশ্রীমার 'অন্তরের বস্তু' ছিলেন। তাঁহার অসুখ বাড়িতেছে দেখিলে মা কাঁদিতেন, তিনি একটু ভাল আছেন দেখিলে নিজেও ভাল আছেন বোধ করিতেন। তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মার শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর যাইতে বলিয়াছিলেন, বাড়ীর একখানা ইট খসল, এবার সব যাবে।

যোগানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন: যোগীনের মতন আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত; বলত, মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন। সর্বক্ষণ আমার কাছে বসে থাকত। আমাকে বলত, মা, তুমি আমাকে যোগাযোগা বলে ডাকবে। [গ]

যোগীন দু আনা, চার আনা, আট আনা করে ছশ' টাকা আমার জন্যে জমিয়েছিল! [বি]

---

৪ ফটোগ্রাফার 'হ্যারিংটন'। ফটো তুলিবার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণপদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস্ বুল অনুভব করেন, দেশে গিয়া পূজা করিবেন বলিয়া। মাকে সেইকথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তোলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ-মার মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন, তিনি মার সঙ্গে ছিলেন।

যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্বাণ চাইলে। গিরিশবাবু বল্লেন, দেখ্ যোগীন, নির্বাণ নিস নি ; ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, চন্দ্রসূর্য তাঁর চক্ষু—অত বড় ভাবিস নি ; যেমন ঠাকুরটি ছিলেন তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চলে যা।

যোগীন যখন দেহ রাখলে, সে বল্লে, মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর। [গ]

যোগীন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একখানা লেপ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। মা উহার তুলাটা পিঁজাইয়া লইয়া, একটা নূতন খোল দিয়া লেপখানার সংস্কার করিবার জন্য বিভূতিবাবুকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যোগীনের দেওয়া জিনিস আর তেমনটি থাকিবে না, ইহা ভাবিতেই মার প্রাণে যেন একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি উহার সংস্কার-বাসনা ত্যাগ করিলেন, পুনরায় বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন, না বিভূতি, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নাই ; এই লেপ যোগীন দিয়েছিল, দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে ![৫]

৺দুর্গাপূজো উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা মঠে আসিয়াছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখের দেয়ালে যোগীন মহারাজের একখানি তৈলচিত্র লম্বিত ছিল, মা নিকটে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই চিত্রখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি ঠাকুরঘরেও গেলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই চলিয়া আসিলেন। কোন্ বেদনা সেদিন জননীর প্রাণে বাজিয়াছিল, কে বলিবে।

যোগানন্দ ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ। শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলিয়াছেন তিনি জন্মান্তরে অর্জুন ছিলেন—কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী, ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে শ্রীভগবানের নরলীলার সাথী। তাঁহার দেহরক্ষার কিয়ৎকাল পর হইতে স্বামী সারদানন্দ মার সেবাধিকার লাভ করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রায় একুশ বৎসর সগৌরবে উহা সুনিষ্পন্ন করেন। মা বলিতেন, শরৎ আর যোগীন—এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।

---

[৫] হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা মিশ্রিত করিয়া কেহ কোন জিনিস দান করিলে শ্রীশ্রীমা সাধ্যমত তাহা রক্ষা ও আজীবন ব্যবহার করিয়া ভক্তবৎসলা নামের পরিচয় দিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ফণিভূষণ (ভবেশানন্দ) মাকে দিবার জন্য একটি তুর্কী মোহর কোন ভক্তের হাতে দেন। মা মোহরটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, মোহরের আর কী দাম, স্মৃতিরই দাম ; সে যে এই মনে করে মোহরটি এনেছিল। মার অপ্রকট হওয়ার পর দেখা গেল, মোহরটি কাগজমোড়া অবস্থায় তাঁহার বাক্সে পড়িয়া আছে।

সিস্টার নিবেদিতা মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দান করেন। সেইটিতে মা ঠাকুরের কেশ রক্ষা করিয়াছিলেন. বলিতেন ঃ যখন পূজো করি, কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা বলেছিল, মা, আমরা আর জন্মে হিঁদু ছিলুম, ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই আমরা ওদেশে জন্মেচি।

একবার মা কলিকাতা হইতে দেশে গেলে তাঁহার একখানা ভাল বালাপোষ দেখিতে পাওয়া গেল না। রাখিবার দোষে হারাইয়াছে মনে করিয়া, যিনি জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাঁহার মন খারাপ হইয়া যায়, মার মনেও দুঃখ হয়। কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে পরে যখন উহা অন্য জিনিসের সঙ্গে পাওয়া গেল তখন মা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বালাপোষের জন্যে কি, বাবুরামের মা এই বালাপোষটি দিয়েছিল সেইজন্যে। [বি]

যোগানন্দ যে সময়ে দেহত্যাগ করেন, সারদানন্দ তখন প্রচারকার্যে গুজরাটে। সেইজন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং তাঁহার সহকারীরূপে কৃষ্ণলাল মহারাজ ও বুড়োবাবা শ্রীশ্রীমার দেশে গমন পর্যন্ত কয়েক মাস তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ধমানের পথে মাকে দেশে লইয়া যাওয়া, কিংবা দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসার কঠিন কাজটি ত্রিগুণাতীত মহারাজই অধিকাংশ সময়ে করিতেন এবং মার এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত থাকিতেন। একবার যখন মাকে বর্ধমান হইতে গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, দূর হইতে পথিমধ্যে একটি গভীর গর্ত দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া উহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়েন। উদ্দেশ্য তাঁহার দৃঢ় সবল দেহের উপর দিয়া গাড়ী অনায়াসে চলিয়া যাইবে এবং উহার চাকা গর্তে পড়িয়া মার শরীরে আঘাত লাগিবে না। তখন শেষরাত্রি। মা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলেন, তখনই গাড়ী থামাইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন। তারপরে ঐরূপ করিবার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, পায়ে হাঁটিয়া সেই গর্ত পার হইয়া আসিলেন। [আ][৬]

১৩০৬ সালের ১৮ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ কলেরারোগে আক্রান্ত হইয়া অ-ভয় লোকে প্রয়াণ করেন। [দি] প্রসন্নকুমার একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেন, দিদি, একপেটে জন্মেচি, আমাদের কী হবে? তাহাতে মা উত্তর দেন, তা তো বটেই, তোদের ভয় কী? অভয়ের মৃত্যুকালে মা যখন পালকি করিয়া চোরবাগান সরকার লেনে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন ও শিয়রে বসিয়া আদরে পালিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করেন তখন অভয় দিদির চক্ষুতে চক্ষু রক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এরা সব রইল, এদের তুমি দেখো। [বি] এই অসুখের সময়ে শরৎ মহারাজ ও সুশীল মহারাজ (প্রকাশানন্দ) অভয়ের খুব সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই মা দেশে চলিয়া যান।

অভয় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পরীক্ষা দিয়া অল্পদিন পূর্বে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মা তাঁহার ছোট ছোট ভাইপোদের সম্বন্ধে বলিতেন, ওরা সব মুখ্যু সুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক্। এইকথায় আপত্তি করিয়া যদি কোন ভ্রাতৃজায়া বলিতেন, ঐ রকমই আশীর্বাদ করে নাকি? তাহাতে মা উত্তর দিতেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোরা কী জানিস? আমি অভয়কে মানুষ কল্লুম, অভয় চলে গেল! [ই]

অভয় যখন দেহরক্ষা করেন তাঁহার পত্নী সুরবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পিত্রালয়ে। শৈশবে মাতৃহারা সুরবালা তাঁহার দিদিমা ও মাসীমার কোলে মানুষ হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দিদিমা লোকান্তরিত হন, মাসীমাও রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন। ভাইয়ের অন্তিমকথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা তখন

[৬] স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৩১৬ সালের ২৮শে শ্রাবণ সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে শ্রীশ্রীমাকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ: মা, আপনার কৃপা অসীম। আমি এতদিন বিদেশে রয়েচি, তথাচ মা, আপনি আমাকে ফেলিয়া দেন নাই। প্রায়ই মা আপনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দেন। আপনার কৃপায় আজও আপনার সেবা করিতে স্বপ্নেও ভুলি নাই। আবার যে কবে মা, আপনার সেবা পাইয়া চরিতার্থ হইব তাহা কিছুই বলিতে পারি না। সবই মা, আপনার ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপার উপরেই নির্ভর করে।

সুরবালাকে পিত্রালয় হইতে জয়রামবাটীতে আনিয়া রাখেন। কিছুদিন পরেই মাসীমারও মৃত্যু-সংবাদ আসে এবং উপর উপর তিনটি গভীর শোক পাইয়া সুরবালার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। মাঘ মাসে তিনি এক সুকুমারী প্রসব করেন, কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে সন্তান-প্রতিপালন অসম্ভব বুঝিয়া মা চিন্তান্বিত হন। এই সময়ে ৺কাশী হইতে কুসুমকুমারী দেবী নামে জনৈক স্ত্রীভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে মা তাঁহার হস্তে কন্যাটির প্রতিপালনভার অর্পণ করেন। কুসুমকুমারী ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চারিমাস জয়রামবাটীতে ছিলেন।

১৩০৭ সালের কার্তিক মাসে, সুরবালা, নীলমাধব ও ভানুপিসীকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন এবং বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ীতে কয়েক মাস বাস করেন। নিবেদিতা বিদ্যালয় তখন ১৭ নম্বর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৬ নম্বর বাড়ীর পাশে একটি সরু গলির মত স্থান ছিল; একদিন সেই গলি দিয়া আসিয়া রান্নাঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাতে চোর প্রবেশ করে। শেষরাত্রে প্রদীপহস্তে বাহিরে আসিয়াই সুরবালা রান্নাঘরে লোক দেখিয়া আতংকে চীৎকার করিয়া উঠেন ও পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহারা হন। ইহার ফলে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি বাড়িয়া যাওয়ায় মা তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিবার সংকল্প করেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি কুসুমকুমারীর হস্তে কন্যার ভার দিয়াছিলেন, যোগীন-মা প্রভৃতি অনেকে বলিলেন,—জয়রামবাটীতে এইরূপ একটি স্ত্রীলোক রাখিয়া দিলেই চলিবে, তাঁহারা একটি স্ত্রীলোক রাখার ব্যবস্থাও করিবেন, সুতরাং পাগলীকে কন্যা সহ জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হউক আর মা কলিকাতায় থাকুন। সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়া মানসচক্ষে মা দেখিলেন, জয়রামবাটীতে মেয়েটি অযত্নে কষ্ট পাইতেছে, তাহার গর্ভধারিণী বিকৃতবুদ্ধির খেয়ালে এমন যথেচ্ছভাবে পরিচর্যা করিতেছে যে, যে কোন মুহূর্তেই তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা রহিয়াছে; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যোগীন-মাকে ডাকিয়া বলিলেন, ও যোগেন, আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবে নি, পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারব নি—আমি এরকম দেখলুম।

শ্রীশ্রীমা সুরবালাকে লইয়া জয়রামবাটীতে চলিয়া গেলেন। নীলমাধবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন। ভানুপিসী আরও কিছুদিন গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় রহিলেন।

শুনা যায়, সুরবালার গর্ভাবস্থাতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখাইয়াছিলেন, ঐ গর্ভস্থ কন্যাটিই ইহলোকে তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ হইবে। ঠাকুরের তিরোভাবের পর ত্রয়োদশ বৎসর কোনরূপে অতিবাহিত হইলেও দীর্ঘকাল নিম্নভূমিতে মন রাখিবার জন্য একটি মায়িক বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হইল।

জন্মকাল হইতেই এই কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী বা রাধুকে ও তাহার গর্ভধারিণী সুরবালা বা ভক্তদের পাগলী মামীকে সর্বদাই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মার অসংসারী মন একদিকে যেমন সংসারে বিধৃত হইয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের সংস্পর্শে থাকাতেই অগ্নিস্পর্শে কাঞ্চনের মত তাঁহার দেবচরিত্রের বিশেষত্বগুলিও সমধিক উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঠাকুরের গলরোগ

যেমন বিষয়ী লোকের মনে নানা সংশয় জাগাইয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিল, রাধুর সহিত মার আসক্তিসূচক ব্যবহারও সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন মাকে বলেন, আপনি এত রাধু রাধু করেন কেন। রাধুর উপর আপনার ভারী আসক্তি! এভাবের কথা তিনি পূর্বেও দুই এক বার বলিয়াছিলেন, তাহাতে মা বলিতেন, কী করব বাবা, আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের এরকমই। কিন্তু এবার আর সেই উত্তর না দিয়া একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেনঃ তুমি এসব কী বুঝবে? যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন শার্সিতে চমকায়, কিন্তু খড়খড়িতে কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বরচিন্তা করে মন শুদ্ধ হয়ে যায় তারা যখন যে জিনিসটি ধরে তাতেই ষোলআনা মন দেয়। তুমি আমার মতন একটি খুঁজে বার কর দেখি?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাধুকে সর্বদা আদরযত্ন করিতে দেখিয়া একশ্রেণীর লোক যখন তাঁহার মধ্যে মায়িক আসক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ঐ আদরযত্নের অন্তরালে মার সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্ততা অনুভব করিয়া আর এক শ্রেণীর ভক্তেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন!

১৩০৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ৺দুর্গাপূজা করেন এবং নীলাম্বর মুখুজ্যের উদ্যানবাটী ভাড়া করিয়া পূজার কয়েকদিন শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীভক্তগণকে তথায় আনিয়া রাখেন। মার নামে পূজার সংকল্প করা হয়; স্বামিজী তাঁহার হাত দিয়া পূজার তন্ত্রধারক, শশী মহারাজের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়াইয়াছিলেন।

১৩০৮ সালের ভাদ্রমাসে (২৯শে আগস্ট) লিখিত স্বামিজীর পত্র হইতে জানা যায়, মাতাঠাকুরাণী তখন দেশে ছিলেন। সুতরাং পূজার পূর্বে তিনি দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ পূজার পরেও কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন।

১৩০৯ সালের ২০শে আষাঢ় স্বামিজী বেলুড় মঠে মহাসমাধিমগ্ন হন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। সংবাদ শ্রবণে তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই জানা যায় না। ভক্তদের কাছে তিনি স্বামিজীর গুণগ্রাম ও গৌরবময় জীবনের ঘটনাবলী মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিতেন।

১৩১০ সালের পৌষ মাসে শরৎ মহারাজ বাগবাজার ষ্ট্রীটের ২-১ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন; মাঘ মাসে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা এই বাড়ীতে বৎসরাধিক বাস করেন। বিরজানন্দ, গণেন্দ্রনাথ ও যোগীন-মার সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাইয়া শরৎ মহারাজ বর্ধমানের পথে মাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন; আর ভানুপিসী, নীলমাধব প্রভৃতি অনেকে মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

বাগবাজার ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতে থাকিয়া শরৎ মহারাজ স্বয়ং শ্রীশ্রীমার সেবা পরিচালনা করিতেন। এই সময় হইতে মিসেস্ ওলি বুল, মায়ের সেবায় নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।[৭] এখান হইতে ভক্তদের আমন্ত্রণে মা রথযাত্রার দিন ইঁটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে এবং ৺জন্মাষ্টমীর মহোৎসবে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গমন

---

৭ মিসেস্ বুল মাসে ৬০৲ করিয়া দিতেন। [নি] ১৩১৭ সালের ৪ঠা মাঘ তিনি দেহত্যাগ করেন। [দি]

করেন। যোগোদ্যানে অতিরিক্ত গরম ও ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে প্রায় সমস্ত দিন একভাবে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল ও দলে দলে অসংখ্য লোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল।

১৩১১ সালে অগ্রহায়ণের মধ্যভাগে স্বামী প্রেমানন্দ, নীলমাধব, লক্ষ্মীদেবী, গোলাপ-মা, নিকুঞ্জদেবী, চুনীলাল বসুর স্ত্রী প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীমা পুরী যান, এবং স্বীয় গর্ভধারিণী ও ভ্রাতৃজায়াদিগকে দেশ হইতে আনিবার জন্য আশুতোষকে প্রেরণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কালীকুমার এবং আরও তিনচারি জন সেই সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে তাঁহার অন্য ভ্রাতা বরদাপ্রসাদও পুরী গিয়াছিলেন। সুরবালা বরাবরই মার সঙ্গে ছিলেন, শ্যামাসুন্দরী ও তাঁহার অপর তিন পুত্রবধূকে পুরীধামে হঠাৎ সমাগত দেখিয়া মার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে থাকেন,—কমলানেবুর প্রাণ, তোমার ভিতরে এত রস কে জানে সন্ধান, তোমার ভাল ভাজ,[৮] মা, সকলকে, নিয়ে এসেচ! মা বলিলেন, তা আনব নি? আমার বুড়ো মা—তোকে এনেচি, আর তাঁকে আনব নি? [ই]

এই সময়ে পায়ে একটি ফোড়া হইয়া শ্রীশ্রীমা ভীষণ কষ্ট পাইতে থাকেন; ফোড়াটি পাকিয়া গেলেও কাহাকেও উহা স্পর্শ করিতে দিতেন না। একদিন মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছেন, অতিরিক্ত ভিড় দেখিয়া পায়ে চোট লাগার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন আশুতোষ তাঁহাকে দুইহাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া কোনরূপে বাহির করিয়া আনিলেন। এইরূপ অবস্থায় বাবুরাম মহারাজের পরামর্শে এক নূতন ডাক্তার মাকে প্রণাম করিতে আসেন ও প্রণাম করিয়াই সঙ্গে আনীত ছুরি দিয়া ফোড়ার মুখটি চিরিয়া দেন। কোন ভদ্রলোক আসিয়াছেন শুনিয়া মা ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আর আশুতোষ দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে হঠাৎ এইরূপ করিতে দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া ওঠেন ও আশুতোষকে তিরস্কার করিতে থাকেন। বাবুরাম মহারাজ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, ভয়ে ভিতরে আসেন নাই। ডাক্তারও 'মা, আমার অপরাধ নেবেন না'—এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়েন।

পুরীর মন্দিরে একদিন সকালবেলা ৺জগন্নাথের বাল্যভোগ 'করমা বাইয়ের খিচুড়ি সকলে শ্রীশ্রীমার মুখে, এবং মাও সকলের মুখে দিয়াছিলেন। মা নিজেই বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার মুখে প্রসাদ দাও। [নি] 'ক্ষেত্রবাসী' বাড়ীতে, যেখানে তাঁহারা থাকিতেন, সকলের সংগে বসিয়া মা পুরুষোত্তমখণ্ড শ্রবণ করেন ও শ্রবণান্তে পাণ্ডা-ভোজন করান।

কিছুদিন পুরীবাস করিয়া শ্রীশ্রীমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল। দুইদিন তিনি সমুদ্রস্নান করিয়াছেন, গুণ্ডিচাবাড়ী-নরেন্দ্রসরোবরাদি স্থানসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, জগন্নাথের বৃহৎ রন্ধনশালাটিও পরিদর্শন করিয়াছেন; লক্ষ্মীদেবী একবার মার সঙ্গে ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খুব সম্ভবতঃ এইবারেই মা ভুবনেশ্বর-গমন ও ৺লিঙ্গরাজ-দর্শনাদি করিয়াছিলেন।

---

৮ বরদাপ্রসাদের স্ত্রী ইন্দুমতী সুরবালা হইতে বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন। নিতান্ত বালিকা বলিয়া মা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুরবালা তাহাতে ঈর্ষান্বিতা হইয়া 'ভাল ভাজ' বলিয়া শ্লেষ করিতেন।

পুরী হইতে কালীকুমার ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি কয়েকজন পৌষ মাসের মধ্যে জয়রামবাটীতে ফিরিয়া যান, অন্যান্য সকলে মাঘ মাসের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিবার দুইমাস পরে নীলমাধব হাঁপানি রোগে দেহত্যাগ করেন। মার অনুরোধে গণেন্দ্রনাথ নীলমাধবের ও শ্যামাসুন্দরীর ফটো তুলিয়া দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ খুল্লতাতকে নিজের কাছে রাখিয়া শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। সেই সময়ে আম, ম্যাঙ্গোষ্টিন ইত্যাদি ফল অসময়ে অধিক মূল্য দিয়া আনা হইত, আর তিনি ইহার অত্যল্প অংশ মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া বাকি সমস্তই খুড়াকে খাইতে দিতেন। কেহ ইহাতে আপত্তি জানাইলে মা বলিয়াছেন: আমরা এখনো অনেক দিন পৃথিবীতে থাকব, অনেক খাবার সময় হবে। কিন্তু খুড়ো আর কদিন? ওর তো হয়ে এসেচে, ওর বাসনা শেষ করিয়ে দেওয়াই ভাল। [আ]

কলিকাতায় অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা একদিন অন্তর গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। পায়ের বাত ও ম্যালেরিয়ার জন্য তিনি বরাবরই একদিন অন্তর স্নান করিতেন। বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকা কালে তিনি প্রথম প্রথম পালকিতে করিয়া গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেন; পরে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের গাড়ী হইলে সেই গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। মাঝে মাঝে ঐ গাড়ীতে কিংবা ললিত চাটুজ্যের গাড়ীতে তাঁহাকে আলিপুর, মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। পরে তিনি যখন বাগবাজারে তাঁহার নিজবাটীতে বাস করিতেন যখন গোলাপ-মার সঙ্গে হাঁটিয়া গঙ্গায় যাইতেন।

১৩১২ সালে সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীমা এই প্রথম বিষ্ণুপুরের পথে দেশে যান। বিষ্ণুপুর হইয়া তখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খুলিয়া গিয়াছে। ঐ বৎসর মাঘের প্রথম সপ্তাহে[১] তাঁহার রত্নগর্ভা জননী শ্যামাসুন্দরী নরদেহ ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করেন। এইদিন সকালবেলা শিরোমণিপুর হইতে একটি স্ত্রীলোক তরকারি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। শ্যামাসুন্দরী তাহার নিকট হইতে কিছু তরকারি ক্রয় করেন এবং জ্ঞাতিসম্পর্কে নাতি কতিপয় বালকের সঙ্গে হাস্যপরিহাস নৃত্যগীত করিয়া স্বগৃহে আসিতে থাকেন। বালকেরা পশ্চাৎ হইতে 'ঠাকুমা, ঠাকুমা' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে তিনি মুখ ফিরাইয়া 'কী বলবি বল না হে, আর আমার দাঁড়াবার সময় নাই; পোড়ারমুখোরা আমার বেহারা হবি'—এই কথা বলিয়াই চলিয়া আসেন। [ই] বাড়ীতে আসিয়া দেখেন ঢেঁকিতে ধান ভানা হইতেছে। তিনি ধান ভানার কাজে সাহায্য করিতে থাকেন, কাজ শেষ হইলে শৌচে যান। তারপরে শরীরে অস্বস্তি বোধ করিতে থাকায় ঘরের দাওয়ায় শুইয়া পড়েন এবং সজ্ঞানে কথাবার্তা কহিয়া বেলা দশটার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। শেষ সময়ে ভক্ত-নাতি আশুতোষ ও কন্যা সারুর হাতের গঙ্গাজল চাহিয়া খাইয়া শ্যামাসুন্দরী বলিয়াছিলেন, কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে ইচ্ছে

---

[১] স্বামী সারদানন্দের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, ১৩১২ সালের ১২ই মাঘের দিনলিপি: **Asu went to Jairambati this morning with purchases for Didima's Sraddha.**

হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধে প্রচুর পরিমাণে কুমড়ার ঘ্যাঁট করা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের জন্য আশুতোষ কলিকাতা হইতে তিনখানা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া বহু জিনিসপত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

অন্তরঙ্গ-সেবক যোগানন্দ, কনিষ্ঠভ্রাতা অভয়, খুল্লতাত নীলমাধব এবং জননী শ্যামাসুন্দরী—এই চারিজনের দেহত্যাগে শ্রীশ্রীমা ডাক ছাড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

বাৎসল্যরসময়ী শ্যামাসুন্দরী জগদম্বিকাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া কেবল ভক্তদিগকেই নহে, সকল দেবদেবীকেও ঘরের লোক জ্ঞান করিতেন এবং আজীবন ভক্ত-ভগবানের সংসার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: আহা, আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী। সমস্ত বছর সব জিনিসটি পত্রটি গুছিয়ে টুছিয়ে রাখতেন; বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার। আমার সারদা (ত্রিগুণাতীত) হয়তো কখন আসবে, যোগীন আসবে এসব দরকার।' ভাল চালটাল যা পেতেন সব ঠিকঠাক করে রাখতেন; বলতেন, 'আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন—সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন কত্তে পারবি ? আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার!' [ধ] গিরিজানন্দকে মা বলিয়াছিলেন: আমার মা শরৎকে খুব ভালবাসতেন। শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমতি নিতে এসেচে। আমি তাকে আশীর্বাদ করে বল্লুম, কোন ভয় নাই, ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা কচ্চেন। শরৎ চলে গেলে মা আমাকে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ মা সারু, তুই মা হয়ে কোন্ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাঠালি ? তোর প্রাণ কী কঠিন!

সম্ভবতঃ ১৩১২ সালের শেষভাগে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের পূর্বোক্ত ২/১ নম্বর বাড়ীতে কয়েক মাস ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে, ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় ঠাকুরে বাৎসল্যরতিসম্পন্না গোপালের মা গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। মা তাঁহাকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতেন। একবার মেয়েদিগকে সঙ্গে নিয়া দেখিতে গেলে 'কিগো বৌমা, এলি মা—এলি মা!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালের মা বলিয়াছিলেন, মা, তোমাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছিল। [ই] গঙ্গাতীরে গোপালের মার অন্তিম শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বৌমা তাঁহাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করেন এবং কিছু মিষ্টি ও জল স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন। [আ]

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিজবাটীতে শুভাগমন

১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁহার আমন্ত্রণে ও বন্দোবস্তে শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় তখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইতেছিল, রাত্রে শহর নিষ্প্রদীপ থাকিত। মাকে নিরাপদে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে মাষ্টার মহাশয় ও ললিত চাটুজ্যে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত আগাইয়া গিয়াছিলেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া মার শরীর অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও জ্বর হইতেছিল। শুনা যায়, গিরিশবাবুর পূজা করিবার ইচ্ছা ছিল না, মা-দুর্গা স্বপ্নে দেখা দিয়া পূজা করিতে বলেন এবং তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া বসেন। কাজেই গিরিশবাবু পূজা না করিয়া পারেন নাই।

সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিয়াছেন: সপ্তমীর দিন বেলা প্রায় এগারটার সময় গিরিশ-বাবুর বাড়ীতে আমি এই প্রথম শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ করি। সেই সময়ে তাঁহার জ্বর ছিল। মহাষ্টমীর দিন জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া রাত্রে সন্ধিপূজার সময়ে মা আর আসিবেন না স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পূজার অব্যবহিত পূর্বে নিজেই আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং গভীররাত্রে অন্যান্য স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে বসু-ভবন হইতে হাঁটিয়া আসিয়া খিড়কীর দরজায় আঘাত করিয়া বলিলেন, 'আমি এসেচি!' গিরিশবাবু উপরে বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন; মা আসিলেন না এই অভিমানে সন্ধি-পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে যান নাই। এমন সময় সাড়া পড়িয়া গেল, মা আসিয়াছেন! সকলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে ছুটিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া দেখি দেবীমূর্তির সম্মুখে উত্তরপশ্চিমের কোণটিতে বা প্রতিমার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মানা—সমাধিস্থা; ভক্তগণ রাশিকৃত ফুল ও বেলপাতা লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেছেন। আমিও অঞ্জলি দিলাম এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। গিরিশবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া উল্লাসপূর্ণ গদ্‌গদস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন: আমি তো ভেবেছিলুম আমার পূজোই হল না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে ডাকচেন, 'আমি এসেচি!'

পত্রে লিখিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজ: প্রায় রাত্তির ২।। টার সময় পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাকে বলরামবাবুর বাটী হইতে সন্ধিপূজায় আনিবার জন্য পাল্‌কি ফিরিয়া আসিল। তার ৫ মিনিট পরে ঠিক সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আসিয়া হাজির। আমরা অবাক! গিরিশবাবু আনন্দে অধীর। আবার অন্যদিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি ঘৃণ্য আর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী একসঙ্গে! এও এক অভিনব দৃশ্য।

শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন: গিরিশবাবুর বাড়ীতে দুর্গাপূজা। মা অষ্টমীপূজার দিন ভাবাবেশে মিষ্টান্নাদি খেলেন। পরদিন অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে কিছুই

খাওয়ানো গেল না। আগের দিন খেয়েছেন, আজ কেন খাবেন না – জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন,—সেদিন আমি 'আমি' ছিলুম না, আজ বেশ্যার ছোঁয়া অন্ন কী করে খাই?

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিনই পূজার সময়ে শ্রীশ্রীমা গিরিশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাসাধিক কলিকাতায় থাকিয়া ৺কালীপূজার পরে, ২৪শে কার্তিক তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। [দি]

ঠাকুরের জন্মমহোৎসব তাঁহারই জন্মস্থানে করিবার অভিপ্রায়ে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের স্বামী যোগবিনোদ কলিকাতা হইতে বহু ভক্তকে সঙ্গে নিয়া ১৩১৫ সালে ফাল্গুনের শেষভাগে কামারপুকুরে আসেন। শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে আনয়ন করা হয়, তাঁহার উপস্থিতিতে উৎসবটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরীর দেহরক্ষার পর হইতে শ্রীশ্রীমাই প্রকৃতপক্ষে সহোদরগণের সংসারে অভিভাবিকা হন। ভাইদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে বিষয়বিভাগ করিয়া দিবার জন্য তিনি শরৎ মহারাজকে আহ্বান করেন। মার পত্র পাইয়াই শরৎ মহারাজ যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও ভূমানন্দকে সঙ্গে নিয়া জয়রামবাটী যান ও প্রায় দুইমাস সেখানে অবস্থান করেন। গৃহাদি বণ্টন করিবার সময় যখন মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি কোন্ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন, মা বলিয়া পাঠাইলেন,—ঠাকুর বলিতেন, ইঁদুর গর্ত করে, সাপ সেই গর্তে থাকে। ...দুদিন প্রসন্নর ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।[১] বিভাগকর্তারা আর কথা না কহিয়া মা যে ঘরখানিতে থাকিতেন তাহা প্রসন্নকুমারের ভাগে ফেলিয়া দিলেন। বিষয়বিভাগ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দুই সহচরী-সেবিকা এবং দুই ভাইঝি রাধু ও মাকুকে সঙ্গে করিয়া মা কলিকাতায় আসিলেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর আজ ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমাকেও বহুবার কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াটে বাড়ীতে কিংবা গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছে। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকা বহুব্যয়সাধ্য, অথচ গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানে ইচ্ছানুরূপ বাড়ী সকল সময়ে পাওয়া যাইত না।

নানা কারণে গৃহস্থবাড়ীতে অধিকদিন থাকা মা পছন্দ করিতেন না। ইদানীং তাঁহার সঙ্গে দুইচারি জন আত্মীয় সর্বদাই থাকিতেন, নানা স্থান হইতে ভক্তেরাও নিত্যই তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিতেন। মার কলিকাতা-বাসের সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য শরৎ মহারাজ নিজের দায়িত্বে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কেদারদাস-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে এতদিনে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন।[২] এখানে উদ্বোধন

[১] ভূমানন্দ-প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ'।

[২] বেলুড়ে রামলোচন সান্নার ঘাটের নিকটে, বলার মার শ্মশানের সম্মুখে শ্রীশ্রীমার বাড়ী করিবার জন্য খানিকটা জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে সেই সময় মাকে ঐ জমি দেখানো হয়; শ্মশানের গন্ধ আসে বলিয়া তিনি উহা অপছন্দ করেন। [গ]

কেদারদাস-প্রদত্ত জমির পরিমাণ ছিল তিন কাঠা চারি ছটাক। ঐ জমির সহিত সংলগ্ন এক কাঠা চারি ছটাক জমি পরে ক্রয় করা হয়। শরৎ মহারাজের উক্তি হইতে জানা যায়, বাড়ী করিতে তাঁহাকে এগার হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছিল।

আপিসের কার্য পরিচালিত হইলেও ইহা মায়ের জন্য নির্মিত মায়েরই বাড়ী। ১৩১৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ মা এই নবনির্মিত গৃহে পদার্পণ করিলেন। [দি] বাড়ি হইতে গঙ্গা নিকটে, ছাদে উঠিলেই গঙ্গাদর্শন হয়; উত্তরদিকে দূরে দৃষ্টিপাত করিলে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ঝাউগাছগুলির সমুন্নত শির দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিয়া মা আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্রীসারদামাতার উদ্দেশ্যে রচিত ভবনে তাঁহাকে আবাহন ও আনয়ন করিয়া সারদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি নিজেকে মার বাড়ীর দারোয়ান মাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য সকল কাজ পূর্বে যেমন করিতেছিলেন তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন; কেবল তাঁহার কর্মশক্তি যেন অদম্য উৎসাহে বহুগুণ বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে সর্বত্র জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যারতির পর জপাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে বলিতেন, শরৎকে বল দুটো গান গাইতে। বৈঠকে একটি তানপুরো ও একজোড়া বাঁয়াতবলা ছিল, তানপুরাটি বাঁধিয়া শরৎ মহারাজ অপরের হাতে দিতেন ও বাঁয়া হাতে গান ধরিতেন: 'এস মা, এস মা' 'শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে' 'দনুজদলনী নিজজনপ্রতিপালিনী' ইত্যাদি। তন্ময় হইয়া তিনি একটার পর একটা গাহিয়া যাইতেন, উপরে মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া মাতাঠাকুরাণীও একমনে শুনিতেন। ছোট বাড়ীখানি সুরতরঙ্গে ভরিয়া উঠিত, দিব্যভাবের আবেশে জমজম করিত।

বহু স্বজন ও ভক্তগোষ্ঠী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীমার সেবাকার্য শরৎ মহারাজ কিরূপ যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন সেই সম্বন্ধে অনেক কথা তদীয় জীবন-গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অরূপানন্দের সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাবার্তায় মা স্বয়ং তাঁহার এই বিশেষ সেবাধিকার এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন: 'শরৎ যে কদিন আছে, আমার এখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে, দেখি না। যোগীন ছিল; কেষ্টলালও আছে[৩]—ধীর স্থির, যোগীনের চেলা। গণেনও খানিকটা পারে। শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্চে আমার ভারী। রাখাল শরৎ টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েচে।' 'মহারাজ পারেন না?' 'না, রাখালের সে ভাব নয়—ঝঞ্চাট বইতে পারে না! মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে—রাখালের ভাবই আলাদা।' 'বাবুরাম মহারাজ?' 'না, সেও পারে না।' 'মঠ চালাচ্চেন যে?' 'তা হোক; মেয়েমানুষের ঝঞ্চাট! দূর থেকে খবর নিতে পারে, কেমন আছেন? কি কখন হয়তো মনে পড়ল, মা কেমন আছেন? এই রাধুর বিয়ের কথা—এটি আমার বোঝা। অনেক ভক্ত সাহায্য কর্ত্তে পারে, দশ হাজার টাকাও দিতে পারে, আপন মায়ের বোঝা কে মনে কচ্চে? আপনার জন কটি আর?—দুচারটি। ঠাকুর বলেছিলেন, কটিই বা অন্তরঙ্গ!'

---

[৩] স্বামী ধীরানন্দ। স্বামী যোগানন্দ যে কালে শ্রীশ্রীমার তত্ত্বাবধান করিতেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার সহকারী ছিলেন। শুদ্ধাভক্তির সাধক, হৃদয়বান এই সন্ন্যাসীর উচ্চ আধার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, মহারাজ—সকলেই কিছু-না-কিছু বলিয়াছেন। মঠে সমাগত ভক্তগণের মঙ্গলসাধনে তিনি স্বামী প্রেমানন্দের অনুগামী ছিলেন।

সুরেন্দ্র মজুমদার বলেন : আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীন্দ্রকে দীক্ষা দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীশ্রীমা কিছুদিন পরে আসিতে বলেন, তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। আমরা সেইদিন দীক্ষা দিবার জন্য ধরিয়া বসিলে বলিলেন, আচ্ছা, শরতের কাছে যাও, সে যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে। আমরা বলিলাম, আমরা আর কাকেও জানি না, এক আপনাকেই জানি। মা বলিলেন, বল কী? শরৎ আমার মাথার মণি! সে যা করবে তাই হবে।

শ্রীশ্রীমা এত করিয়া মান দিলেও অন্তরে অমানী থাকিয়া জগন্মাতার এই অন্তরঙ্গ সেবক তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতেন। সুরেনবাবু বলেন : একদিন উদ্বোধন কার্যালয়ের ছোট ঘরটিতে বসিয়া শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় আমি ঘরে ঢুকিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমাকে যে এত বড় প্রণামটা করচ এর মানে কী? আমি বলিলাম, সে কী মহারাজ. আপনাকে করব না তো কাকে করব? তিনি বলিলেন, তুমি যাঁর কাছে যাও, যাঁর কৃপা পেয়েচ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিযে দিতে পারেন।

বর্তমান উদ্বোধন লেনের ১ নম্বর বাটীতে নিজগৃহে শ্রীশ্রীমা প্রায় ছয়মাস বাস করেন। এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার পানিবসন্ত হইয়াছিল, সারিয়া যাইবার পর গাড়ীতে করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। একদিন তিনি রামরাজাতলায় গিয়া ঠাকুর দর্শন করেন ও ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ী হইয়া আসেন। সেবকের অভিলাষ পূর্ণ করিবা ৩০শে কার্তিক তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। [দি]

ঊনবিংশ অধ্যায়

মা

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

জগৎকারণকে 'মা' বলিয়া ডাকা এবং সকলের ভিতর সেই মাতৃরূপিণীকে দেখা এই যুগের বিশিষ্ট আদর্শ যাহা ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে মাতৃভাবের বিস্তার করিতে হইলে এমন একটি মাতৃমূর্তির প্রয়োজন যাঁহাকে সকল মানুষ নিঃসঙ্কোচে মা-নামে সম্বোধন করিতে পারে--যাঁহার অভয় কোলে আশ্রয় লইয়া পাপ-তাপপূর্ণ সংসারের সকল জ্বালা নিঃশেষে ভুলিতে পারে।

উমেশবাবু শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: ঠাকুর অপ্রকট হওয়ার পর আপনি সংসারে থেকে লোককে শিক্ষাদীক্ষা দিচ্ছেন। আর আর অবতারে শক্তিরা এরূপ কাজ করেছেন বলে শোনা যায় না, পার্ষদ ভক্তেরাই লোকশিক্ষা দিয়েছেন। এই নূতনত্বের কারণ কী? মা উত্তর দেন: বাবা, জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন; সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।

যৌবনে পতির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমা একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়স্থিত মাতৃভাব উন্মেষিত হইতেছিল, বলা যায়। ঠাকুরের ভক্ত-সন্তানগণের সেবার মধ্য দিয়া উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার তিরোভাবের পর উত্তরোত্তর বর্ধিত হইলেও উহার পূর্ণ পরিণতি সংশয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তেমন কোন মায়িক অবলম্বন না থাকায় মা চেষ্টা করিয়াও দেহের উপর মন সুস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। দৈবনির্দেশে রাধারাণীর প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিবার পর যখন সেই অভাব দূরীভূত হইল তখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এক অশ্রুতপূর্ব অ-মায়িক মাতৃত্বের কিরণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র পুত্রকন্যা সেই অপার্থিব স্নেহরসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে, পরেও হইতে থাকিবে।

অহোরাত্র সন্তানগণের ঐহিকপারত্রিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা; দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর শরীরের অত্যাবশ্যক বিশ্রামটুকুর বিনিময়ে সময়ে-অসময়ে দূর-দূরান্তর হইতে আগত সন্তানদিগকে রন্ধনাদি করিয়া খাওয়ানো; তাহাদের আব্দার-সকল, অনেক সময়েই অবিবেচনাপ্রসূত হইলেও, বিনা প্রতিবাদে পূর্ণ করা; কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে দেখিলে অলক্ষিতে নিজ দেহে তাহার পাপতাপ আকর্ষণ ও উহার অনিবার্য ফলস্বরূপ রোগযন্ত্রণা ভোগ; এইরূপে সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া নিজের ত্যাগময় সহনশীলতাময় জীবনাদর্শে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা, শুধু তাহাই নহে, যাহাতে তাহারা সকল দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা ও তন্নিবন্ধন জন্মমৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে তজ্জন্য তাহাদিগকে মায়াপারের একক নাবিকা গুরুশক্তির আশ্রয় দান—সংক্ষেপে ইহাই জগতে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মাতৃভাবের বিকাশ।

উপরিধৃত বর্ণনার মধ্যে যে অনুমাত্র অত্যুক্তি নাই তাহা শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা ও সমীপাগত সন্তানগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। ইহার ফলে যদি সেই মানবীরূপা দেবীর চরিত্র কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, যদি সেই মাতৃমূর্তি বিকৃত অথবা পক্ষপাত-দোষযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মাতৃভক্ত উদার পাঠক! তাহা হইলে ইহা আমাদের অহমিকা-প্রসূত বুদ্ধির দোষে, বুঝিবার ত্রুটিতে এবং এবম্বিধ সহস্র অপূর্ণতার জন্যই হইয়াছে জানিয়ো। আর যদি তাহা না হয়, তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না,– কেন তাঁহার ভক্ত সন্তানগণের অনেকেই তাঁহাকে পাইয়া নিজ নিজ পার্থিব জননীর অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সকল জননীর সমষ্টিরূপা জগজ্জননী জ্ঞানে তৎপদে হৃদয়ের ভক্তিপ্রীতি ঢালিয়া দিয়াছিল; কেনই বা অপরে পার্থিব জননীর মধ্যে তাঁহারই আংশিক প্রকাশ বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ গর্ভধারিণীর সেবায় অধিকতর অবহিত হইয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তি নিরুপমা— কলির প্রভাববশে মাতৃভক্তিহীন পাপ-মলিন সংসারে সন্তপ্ত সন্তানগণকে অভয়কোলে আশ্রয় দিবার জন্য মাতৃভক্তির প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানগঠিতা মানসী প্রতিমা।

৺বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে বাস করিতেন তখন সন্তানের অভাবজনিত চিন্তায় এক এক সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি ভাবচ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্চ, আমি তোমাকে এইসব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা মা বলে ডাকবে। [গ] ঐ সময়ে একাকী থাকার ফলে, মা-ডাক শুনিতে না পাইয়াই যে তিনি প্রাণে বিষম অভাব অনুভব করিতেছিলেন তাহা ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। তাঁহার এই মাতৃত্বের কামনা—এই মা-ডাক শুনিবার বাসনা কত গভীর অথচ সীমাহীন ছিল সেই সম্বন্ধে এই একটিমাত্র ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একবার শিলং হইতে কতিপয় ভক্ত সন্তান[১] জয়রামবাটীতে আসিলে মা ভানুপিসীকে বলিয়াছিলেন, ওদের মতন যেন জন্মে জন্মে আমার ছেলে হয়!

সমীপাগত সন্তানেরা শ্রীশ্রীমার বিশিষ্ট স্নেহের ভাগী হইলেও তাঁহার মাতৃভাব-রূপ স্ব-ভাব সংকীর্ণ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, কেহই এই মাতৃহৃদয়ের শুভকামনা হইতে বঞ্চিত হইত না। তারকেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন: কোনও কারণে জনৈক স্বদেশসেবককে মা বলিয়াছিলেন, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যে যা ইচ্ছে কর, কিন্তু তারাও (বিলাতের লোকেরা) তো আমার ছেলে বটে। একবার ৺জন্মাষ্টমীমহোৎসবে কাঁকুড়গাছিতে যাইবার জন্য তথাকার ভক্তেরা মাকে প্রার্থনা জানায়, মাও যাইতে সম্মত হন। কেহ কেহ তাঁহার যাওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে মা বলিয়াছিলেন, তোমাদের ঝগড়া বাপু, আমি কি ওদের মা নই? সেদিন তিনি কাঁকুড়গাছি গিয়াছিলেন। [আ] শ্রীশ ঘটক যখন মহাযুদ্ধ-বিরতির সংবাদ মাকে জানাইলেন, মা পতিপুত্রহীনাদের দুঃখ যেন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন এমনি সমবেদনা ও করুণা তাঁহার মুখের ভাবে ও কথায় ব্যক্ত হইল। শশিভূষণ ঘোষ বলেন: আমার একটু অভিমান হইয়াছিল যে, মা আমার সঙ্গে গল্প করেন না। তখনই তিনি ডাকিয়া আদর করিয়া আমাকে

[১] স্বামী জগদানন্দ, শ্রীশ ঘটক প্রভৃতি।

কাছে বসাইলেন এবং দেশের কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। তাঁহার কাছে প্রত্যেক জনহিতকর কাজই ঠাকুরের কাজ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছি। যোগেশ ঘোষ লিখিয়াছেন: মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগো, তোমার বাড়ী কোথায়? আমি বলিলাম, পূর্ববঙ্গে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের দেশে ধান কেমন হয়েচে? আমি বলিলাম, ভাল ধান হয় নাই। তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, শুনলুম পাঞ্জাবে নাকি ফসল হয় নি, আর জায়গায়ও হয় নি, হায় ঠাকুর, লোকের দশা কী হবে! ডাক্তার কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয়। মা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, বৌমা, এমন আশীর্বাদ করব আমি—সকলের অসুখ হোক, কষ্ট পাক্? আমি তো তা করব না মা; সকলে ভাল থাক্, জগতের মঙ্গল হোক মা! [ই] পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া উঠিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া মা বলিতেন, মা জগদম্বে, জগতের কল্যাণ কর।

১২৯৩ সালের এক শুভদিনে শ্রীশ্রীমা যোগীন মহারাজকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। জগতের সমক্ষে ইহা তাঁহার গুরুভাবের প্রথম প্রকাশ বলা যাইতে পারে। এই প্রকাশ অতি ধীরে বর্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দীক্ষার্থী ভক্তগণের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে।[২] শেষের প্রায় দশ বৎসর তাহাদের ভিড় এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাঁহার আহার-নিদ্রার অতিমাত্রায় ব্যাঘাত হইতে থাকে ও শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাহারা উহা হইতে উদ্ধারের পথ পাইবার আশায় তাঁহার পাদমূলে ছুটিয়া আসিত তাহারা দেখিত,—স্নেহ-প্রেম-করুণায় গঠিতা এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি তাহারা আসিবে বলিয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন; গ্রীষ্মতপ্ত হইয়া ঘর্মাক্ত-কলেবরে পৌঁছিবামাত্র হয়তো পাখা আনিয়া স্বহস্তে বীজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; রাস্তায় আসিতে কষ্ট হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিয়া কত কথা কহিতেছেন; তারপরে জলখাবার খাইতে দিয়া তাহাদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করিতে ত্বরান্বিতা

[২] যোগীন মহারাজ ব্যতীত, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মধ্যে আরও অন্ততঃ তিনজন শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজের দীক্ষার পরেই মার কাছে উপস্থিত হইয়া শ্রীকালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) মন্ত্রপ্রার্থী হন, আর 'ঠাকুর তোমাকে কিছু দিয়ে যান নি?' মার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: ঠাকুর আমার জিভে কিছু লিখে দিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন, কিছু কী লিখেছিলেন জানি না; আমার যা কিছু অনুভূতি হয়েচে সবই ধ্যান করে হয়েচে। মা তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র দান করেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেই শ্রীসারদাপ্রসন্নকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র লইতে বলিয়াছিলেন। সারদাপ্রসন্ন (ত্রিগুণাতীত) পরবর্তী কোনও সময়ে মার কাছে মন্ত্রদীক্ষিত হন।

জয়রামবাটিতে রাত্রিকালীন আহারের পর শ্রীশ্রীমা যখন শয়ন করিতে যাইবেন এমন সময়ে তাঁহার একটি দর্শন হয়। মা দেখেন, কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ন্যাংটো বালকমূর্তিতে জয়রামবাটীর অলিগলি দিয়া ছুটিতেছেন আর ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া বলিতেছেন, 'দাও, দাও—একে দিয়ে দাও!' শ্রীম তখন সস্ত্রীক জয়রামবাটীতে। 'ঠাকুর কি ছেলেকে কিছু দিয়ে যান নি?' এই কথা বলিয়াই ছেলেকে মা নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠান ও মেয়েদিগকে ঘর হইতে সরিয়া যাইতে বলেন।

হইতেছেন; মন্ত্রদীক্ষা ও উপদেশাদি দানের কার্যও পরে যথাকালে অনুষ্ঠিত হইত। সমীপাগত সন্তান বিস্মিত হইয়া দেখিত ও মর্মে মর্মে অনুভব করিত, ইনি কেবল ঈশ্বরের পথনির্দেশকারিণী গতিমুক্তিবিধায়িনী গুরু নহেন, পরন্তু এক অপূর্ব স্নেহ-শীলা জননী! শ্রীশ্রীমার গুরুভাবটিকে সেইজন্যই তাঁহার মাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, তাঁহার গুরুভাবে শিক্ষাদীক্ষা দানের কথা যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। এখানে তাঁহার অতুলনীয় মাতৃস্নেহ বাহিরে যেভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে কতিপয় ঘটনার সাহায্যে তাহারই একটি অসম্পূর্ণ চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি! অগণিত পুত্রকন্যা যাঁহার স্নেহসুধা-পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে তাঁহার স্নেহাভিব্যক্তির সম্পূর্ণ চিত্র কে অংকন করিতে পারে?

জয়রামবাটীতে ভক্তচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কিরকম মা? মা উত্তর দেন: আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী মা নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি জননী।[৩] গিরিশবাবু তাঁহার স্নেহের পরিচয় জীবনে নানাভাবে পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তাঁহার জীবনীগ্রন্থ[৪] হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন: একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর লইয়া নিকটবর্তী পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি আমার বিছানা সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে। একার্য মায়েরই বুঝিয়া কষ্টও হইল, আবার মার অপার স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

রথযাত্রার সময় ইঁটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের ভক্তেরা যখন শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন স্বরচিত একটি সঙ্গীত[৫] ছোট ছেলেদের দ্বারা গান করাইয়া মাকে শুনাইয়াছিলেন। মা অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বালকগণকে কোলে টানিয়া নিয়া আশীর্বাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য দুইটি টাকা দেবেনবাবুর হাতে দেন। সেদিন তিনি ওখানকার ভক্তগণকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।[৬]

সুরেন্দ্র রায় বলেন: শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় পিসা মহাশয় আমাকে প্রতিপালন করেন। ভক্তসঙ্গ, কথামৃত-পাঠ ইত্যাদির ফলে ঠাকুরের কথা জানিতে পারি। দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া ডাক্তারি পড়িতে যখন কলিকাতায় আসি তখন বিশ-একুশ বৎসর বয়স। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আছেন জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই; তদবধি চারিবৎসর কাল, মা কলিকাতায় থাকিলে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার হ্যারিসন রোড হইতে হাঁটিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে কখন কখন সামান্য কথাবার্তাও হইত। একদিন ক্লান্ত হইয়া ঘামিয়া উপরে গিয়াছি, মা তাড়াতাড়ি একখানি পাখা হাতে নিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি নিষেধ

৩ ব্রহ্মচারী প্রকাশ সংকলিত 'স্বামী সারদানন্দ'।

৪ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র'।

৫ 'এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুল্‌ষ্টু করে নে মা কোলে।'

৬ ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ'।

করিলেও শুনিলেন না, আমাকেও হাওয়া করিতে দিলেন না ; বলিলেন, না বাবা, তুমি বস, আমি হাওয়া করি। আর একদিন বিকালে প্রায় চারিটার সময় গিয়াছি, মা প্রসাদী দুধভাত রাখিয়াছিলেন, খাইতে দিলেন। জীবনে মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাই নাই, হঠাৎ কেমন ভাবান্তর হইল ও বলিয়া ফেলিলাম, না, খাব না—খাইয়ে না দিলে খাব না। মা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া খাওয়াইতে বসিলেন। তখনও বলিলাম, না, খাব না, মুখে ঘোমটা দিয়ে খাওয়ালে খাব না। মা তখন ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং খাওয়াইতে খাওয়াইতে, কোথায় আমার বাড়ী, এখানে কী করি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বিশ্বেশ্বরানন্দ বলেন : জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র গ্রহণের পরে ঘরের ভিতর খাইতে বসিয়াছি ; আমাকে খাইতে দিয়া মাও খাইতে বসিয়াছেন। কথাবার্তা চলিতেছে আর মাঝে মাঝে নিজের পাত হইতে প্রসাদ লইয়া মা আমার পাতে দিতেছেন। খাওয়া শেষ হইলে যখন আমি উচ্ছিষ্ট পাথর, বাটি ইত্যাদি তুলিয়া লওয়ার উপক্রম করিতেছি, মা আমাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন। আমি নিবৃত্ত না হওয়ায় তাঁহার বাঁ হাত দিয়া আমার ডান হাত ধরিয়া বলিলেন, ও কী কচ্চ? আমি বলিলাম, আমার এঁটো বাসন ধুয়ে নিয়ে আসি। মা বলিলেন, না, আমিই নেব। আমি বলিলাম, তা কি হয়? আপনি নিলে আমার অকল্যাণ হবে। তখন মা বলিলেন, দেখ, মার কোলে ছেলে কত হাগে মোতে, আমি তোমার কী কত্তে পেরেচি বাছা?

জয়রামবাটীতে খাওয়ার পব ভক্তেরা শালপাতা উঠাইয়া স্থান পরিষ্কার করিতে গেলে শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, থাক, লোক আছে। তারপর ঐকাজটি তিনি নিজেই করিতেন। মার আত্মীয়ারা সকল বর্ণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে চাহিতেন না, অনুযোগ করিয়া বলিতেন, তুমি বামুনের মেয়ে—গুরু, ওরা তোমার শিষ্য ; তুমি ওদের এঁটো নাও কেন? মা উত্তর দিতেন, আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?

কৈবল্যানন্দ বলেন : একবার মঠে ঠাকুরের সাধারণ উৎসবে আমি ও রাজেন দত্ত ভাণ্ডারী। অশোক মহারাজ [জাতিতে কায়স্থ] নিত্যকার ভাঁড়ারে কাজ করিতেন, তিনিও সেইদিন আমাদের সহকারী। শ্রীশ্রীমা কলিকাতা হইতে আসিয়া উপরের যে ঘরটিতে মহারাজ থাকিতেন সেই ঘরে আছেন। কাজের ভিড়ে আমাদের এইটুকুও সময় নাই যে একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি। অশোক কিন্তু 'ভাই, আমি একটু আসি'—এই বলিয়া একেবারে মার কাছে চলিয়া গেলেন! মা তখন প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, অশোক, তুমি কিছু খেয়েচ? তিনি বলিলেন, না মা, কিছু খাই নি। মা বলিলেন, তবে এস, এই বাটিটা-সুদ্ধ তুলে নিয়ে যাও। বাটি মার থালার সংলগ্ন দেখিয়া অশোক বলিলেন, আপনি বাটি থেকে হাতে করে তুলে দিন। মা বলিলেন, তুমিই নাও না। অশোক বাটি ধরিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল মহারাজ আপত্তি করিলেন। মা বলিলেন, ও যে ছেলে, নেবে বইকি ; নাও অশোক নাও। অশোক বাটিসুদ্ধ প্রসাদ লইয়া চলিয়া আসিলেন, তিনজনে আনন্দে ভাগ করিয়া খাইলাম।

আশুতোষ মিত্র বলেন : শ্রীশ্রীমার পানিবসন্ত হইয়াছিল ; প্রায় সারিয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও অন্নপথ্য দেওয়া হয় নাই, এমন অবস্থায় তাঁহার ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়ার

ইচ্ছা হয়। আমি বলিলাম, গোপীনাথের (পাচক) কাছ থেকে এনে দিচ্ছি। মা বলিলেন, কেউ টের পাবে না তো? শালপাতায় করিয়া চচ্চড়ি আনিয়া দিয়াছি; মা কয়েকটি ডাঁটা চিবাইয়া ছিবড়াগুলি পাতার উপরেই রাখিয়াছেন এবং অবশিষ্ট দুই একটি ডাঁটা মুখে দিয়াছেন এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়া পড়িলেন। আমার পিছন দিক হইতে যেমন তিনি ঘরে ঢুকিতে যাইবেন, তাড়াতাড়ি এক হাতে ছিবড়াগুলি মুখে পুরিয়াই গিলিয়া ফেলিয়াছি, অন্য হাতে পাতাখানি লুকাইয়াছি। মাকে মুখ নাড়িতে দেখিয়া গোলাপ-মার সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কী খাচ্চ? মা বলিয়া ফেলিলেন, দুটো ডাঁটা চিবচ্চি। 'ডাঁটা কে এনে দিলে?—আশু? এ তো ভাতে ছোঁয়া জিনিস, (চীৎকার করিয়া) শূদ্রের হাতে খাচ্চ?' 'ভক্ত ছেলে, তাতে দোষ কী?' 'ছিবড়েগুলো গেল কোথায়? আশু খেয়ে ফেলেচে বুঝি? নরেনকে ঠাকুরের রক্তমিশানো গয়ার খেতে দেখে সকলেই খেয়েছিল।[৭] আমিও ছিবড়ি খাব।' মা হাসিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণীও অবশিষ্ট ছিবড়াটুকু খাইয়া সরিয়া পড়িলেন!

সুশীলা দত্ত [জাতিতে বারুজীবী] বলেন: এক রাত্রে জগদম্বা-আশ্রমে রাঁধুনী ছিল না। রুটি আমরাই করিলাম, কিন্তু তরকারী কে রাঁধিবে, সমস্যা দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীমা তখন রাধুর কাছে ভিন্ন বাড়ীতে। সেখানে গিয়া আমি রাঁধিব কিনা জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিলেন, বেশ তো, রান্না কর না, তোমরা আমার মেয়ে। আনন্দিত হইয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় কেদারের মা কহিলেন, তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের রান্না কেন খাবে? ঠাকুর না হয় সন্ন্যাসী ছিলেন, তুমি তো সন্ন্যাসী হও নাই? মা আমাকে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, এদের জ্বালায় কিছু হবে না; এরা বারণ করে, এই সব কথা বলে; তুমি মনে কিছু কষ্ট কোরো নি, ঠাকুর যদি কখনো সুযোগ দেন তো হবে।

পীতাম্বর নাথ জয়রামবাটীতে সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইতে ইতস্ততঃ করেন শুনিয়া গৌরী-মা বলিয়াছিলেন, গুরুগৃহে সকলেই এক। ইহার পরদিন সকালে মা বলিলেন পীতাম্বরবাবুকে: তুমি কি যুগী বলে সঙ্কোচ বোধ কর? তাতে কী বাছা, তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেচ। তোমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই মন্ত্র দিয়েচি, তাতে কি বুঝতে পার না যে তুমি আমাদের ঘরের ছেলে? পাড়াগাঁয়ে সামাজিক বাধা আছে বলে তুমি শঙ্কা কোরো নি, এখানে কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। গায়ে পড়ে পরিচয় দেবার দরকার কী?

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীশ্রীমা তাঁহার ভক্তসন্তানমাত্রকেই ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার দিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল দে-প্রমুখ অনেকেই তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সম্মতিসূচক উত্তর লাভ করেন। সুরমা রায়কে মা লিখিয়াছিলেন: ভক্ত তাহার ঠাকুরকে ভালবাসিয়া যেভাবে ইচ্ছা খাওয়াইতে পারে। ঠাকুর ভক্তের হাতে খাইবেন না তো কাহার হাতে খাইবেন?

কী সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনেই যে শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহা বলিয়া বুঝানো দুষ্কর। নিয়তির কুটিল বিধানে মার কোন সন্তান মঠ হইতে চলিয়া

---

৭ স্বামিজীকে প্রশ্ন করিয়া আশুতোষ জানিতে পারেন, নিরঞ্জন মহারাজ, শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ নির্বিকারচিত্তে ঠাকুরের রক্তমিশ্রিত গয়ার খাইয়াছিলেন।

যাইবেন, মা বলিলেন, ভয় কী বাবা, আমি আছি। পরদিন যখন সন্তানটি বিদায় লইবেন, মা সাশ্রুনয়নে কহিলেন, আমায় ভুলো না—ভুলবে না তা জানি, তবুও বলচি। কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তান জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আপনি? মা বলিলেন, মা কি কখনো ভুলতে পারে ছেলেকে? আঁচলে নিজের চক্ষু মুছিয়া মা পুনরায় কহিলেন, কলঘরে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এস, কেউ না টের পায়! [আ]

সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিয়াছেন: ৺বিজয়া দশমীর দিন বিকালে জয়রামবাটী হইতে কেদারের মার সঙ্গে কোয়ালপাড়া চলিয়া আসিব স্থির করিলাম। আমি রাস্তা জানি না, যদি কেদারের মা সেদিন জয়রামবাটীতে থাকেন তবে আমার থাকা হয়। কেদারের মাকে অনুনয় করিয়া মা তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি কিছুতেই থাকিবেন না মাও ছাড়িবেন না। বহু সাধাসাধির পর তিনি সেই রাত্রির মত থাকিয়া গেলেন। পরদিন সকালে প্রণাম করিয়া একটি টাকা দিতে যাইতেই মা বলিলেন, টাকা দিতে হবে না, তুমি টাকা দিতে কোথা পাবে? আমি তোমার মেয়ের জন্যে দিলুম, তুমি নিয়ে যাও। বিদায়কালে মা সেরখানেক সন্দেশ সঙ্গে দিলেন। যাইতে যাইতে প্রবলবেগে কান্না আসিল ও কাঁদিতে লাগিলাম; সন্দেশও কিছু কিছু খাইয়া চলিলাম। মা দিয়াছেন, খাইব না তো সেগুলির কী হইবে? কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু কাঙ্গালালকে অবশিষ্ট প্রসাদ দান করিলাম।

আশুতোষ মিত্র বলেন: গিরিশবাবুর বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে আসিয়া শ্রীশ্রীমা যখন বসু-ভবনে ছিলেন সেই সময়ে আমার জ্বর হয়। ডাক্তার বিপিনবাবু সাগু-পথ্যের বিধান দেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারি বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পক্ষপাতী, কিন্তু সাগু আমি খাইতেই পারি না। প্রবল ক্ষুধা লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। শরৎ মহারাজ যখন খাইতে গেলেন, মা রাধুর হাতে কিছু ফলমিষ্টি পাঠাইলেন; আহারের পর শরৎ মহারাজ যখন ঘুমাইয়া পড়িলেন তখন একখানি রুটি, কিছু তরকারি ও মিষ্টি পাঠাইলেন; বিকালবেলা চুপিচুপি পাশের ঘরে ডাকাইয়া নিয়া প্রচুর ফল ও কিছু মিষ্টি খাওয়াইলেন; এবং রাত্রিকালে শরৎ মহারাজের অনুপস্থিতিতে, যথেষ্ট পরিমাণে রুটি ও তরকারি পাঠাইয়া দিলেন। আমি যে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি, সাগু খাইতে পারি না, রুটিই আমার প্রিয় খাদ্য—এই সমস্ত মা কী করিয়া জানিলেন বলিতে পারি না, পরের বাড়ীতে কিছুই জানাইবার সুযোগ পাই নাই।

কালীপদ রায় কামারপুকুর হইয়া কোয়ালপাড়া যাইবার জন্য রওনা হইতেছেন এমন সময় কয়েকটি ভক্ত কাঁঠাল লইয়া উপস্থিত। মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, এখন চলে যাচ্চে, এর কাঁঠাল খাওয়া হল না। কালীপদবাবু সন্ধ্যার সময় কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া দেখেন, কেদারের মার হাতে জয়রামবাটী হইতে মা কাঁঠাল পাঠাইয়া দিয়াছেন!

অক্ষয়কুমার সেন ময়নাপুর হইতে এক হাঁড়ি চিড়া পাঠাইয়া দেন, শ্রীশ্রীমা তখন কোয়ালপাড়ায়। দুইএক দিন পরেই মা জয়রামবাটীতে চলিয়া যান ও জনৈক সেবক মাথায় করিয়া হাঁড়িটি সেখানে রাখিয়া আসেন। সপ্তাহকাল পরে সেবকটি আবার জয়রামবাটীতে যাইতেই মা বলিলেন: তুমি চিড়ে বয়ে আনলে, সেদিন তোমাকে

তাড়াতাড়িতে খেতে দিতে পাল্লুম নি, আমার মনে বড় কষ্ট হয়েচে। বাবা, তোমার জন্যে চিড়ে তুলে রেখেচি, তুমি খাও। [ম]

স্বরূপানন্দ বলেন: জয়রামবাটীতে গিয়া আমার জ্বর হয়। মা ভাবিত হইয়া বলিলেন, তাইতো গো, ছেলেটির জ্বর হয়ে গেল! মেজমামার বৈঠকখানায় শুইয়াছিলাম, সকালে উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া বসিয়াছি; আমাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? আমি বলিলাম, মা, ভাল আছি। মা বলিলেন, রাত্রে আমারও জ্বর হয়েচে বাবা। ঐদিন রাত্রে আমার আহারের জন্য রুটির ব্যবস্থা করিয়া মা প্রবল জ্বরে শয্যাশায়িনী হইলেন। খাইতে বসিয়া শুনিতে পাইলাম খবর নিতেছেন,—আশু কী খেলে?

শৌরেন্দ্র মজুমদার আবাল্য চা-পানে এমনই অভ্যস্ত ছিলেন যে, সকালে চা না খাইয়া কোন কাজ করিতে পারিতেন না। দীক্ষাগ্রহণের পর নিজের অসহায় অবস্থা চিন্তা করিয়া বলিলেন, মা, আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়া অভ্যাস, কী হবে? শ্রীশ্রীমা স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, বাবা, মা কি কখনো সৎমা হয়? তোমার যেমন খুশি আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপধ্যান করবে।

কোয়ালপাড়া মঠের সাধুরা সকালে কিছু না খাইয়া প্রায় দশটার সময় ঠাকুরপূজা করিতেন। একদিন বিদ্যানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিলেন: তোমরা না খেয়ে পুজো কর, তাতে মন চঞ্চল হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকলে মনটি ঠাণ্ডা থাকবে। তোমরা সকালে কিছু খেয়ে পুজো করবে। [ম]

আহার সম্বন্ধে অব্যয়ানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, তোমরা নিরামিষ খাবে কেন? তোমরা মায়ের ছেলে, মাছে দুধে খাবে, ওতে তোমাদের দোষ নাই। নিরামিষ আহার করিতেন এমন কোন সন্তানকে মা মাছ পরিবেশণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন ও বলিয়াছেন, ঠাকুর শেষ পর্যন্ত মাছের ঝোল খেয়েচেন, ওতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহারও নিষ্ঠাভঙ্গ করিতেন না। জয়রামবাটীতে কৈবল্যানন্দকে মা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি মাছ খাও? তিনি বলিলেন, না মা। মা বলিলেন, এ গ্রামদেশ, এখানে তো মাছ ছাড়া ভাল কিছু পাওয়া যায় না। কৈবল্যানন্দ বলিলেন, মা, আমি খেতে পারি না। মা তাঁহাকে মাছ খাইতে বলেন নাই।

কোয়ালপাড়া মঠে প্রথম প্রথম ঠাকুরকে নিরামিষ অন্নপান্ন ভোগ দেওয়া হইত। কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, মণি-অর্ডারে কিছু টাকা পাঠাইয়া শ্রীশ্রীমা কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 'এই টাকা দিয়া ঠাকুরকে দই-মাছ ভোগ দিয়া তোমরা প্রসাদ পাইবে।' [ম]

অব্যয়ানন্দ শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি মঠের সাধুদের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন? মা উত্তর দেন, আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে। বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রশ্ন করেন, আপনি আমাদের কিভাবে দেখেন? মা উত্তর দেন, নারায়ণভাবে দেখি। বিশ্বেশ্বরানন্দ বলিলেন, আমরা আপনার সন্তান, নারায়ণভাবে দেখলে তো সন্তানভাবে দেখা হয় না। মা বলিলেন, নারায়ণভাবেও দেখি, সন্তানভাবেও দেখি।

প্রবোধবাব, বলেন : পূর্ববঙ্গের জনৈক ভক্ত (দ্বারকানাথ মজুমদার) জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিয়া কোয়ালপাড়ায় গিয়া কঠিন রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। অন্তিম সময়ে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলে তিনি জোড়হাতে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীমার কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করিতেই তিনি অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, আমার সোনার চাঁদ একটি ছেলে চলে গেল! আহাহা, বাছার আমার শেষ জন্ম। জীবনে আমি অনেক পুত্রশোকাতুরার কান্না দেখিয়াছি, কিন্তু মার এই গণ্ডপ্লাবী অশ্রুধারা যেন একটু স্বতন্ত্র রকমের—ইহাতে অশ্রু আছে বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলাম মায়িক আসক্তির নামগন্ধও নাই।

পাগলী-মামী প্রায় সমস্ত দিনই মাকে গালাগালি করিতেন, মা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু একদিন 'সর্বনাশী' বলিয়া গাল দিতেই অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন : আমাকে আর যা বল, সর্বনাশী বোলো নি ; আমার জগৎ জুড়ে ছেলেরা রয়েচে, তাদের অকল্যাণ হবে। [ত]

শ্যামানন্দ বেলুড় মঠ হইতে বড়বাজার অঞ্চলে বাজার করিতে আসিতেন। বাজার করিবার পর অনুকূল জোয়ারে নৌকার সুবিধা হইলে তখনই মঠে ফিরিতেন ; নতুবা শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া লইতেন। একদিন তিনি যখন মার বাড়ীতে আসিয়া পেঁাছিলেন তখন বেলা প্রায় দুইটা। তাঁহার স্নান হইয়া গিয়াছে এমন সময় গোলাপ-মা একটু বিরক্তির সহিত 'এরা কোন খবর দিয়ে যায় না ; সকালবেলা খবর দিয়ে গেলেই তো হয়। তা নইলে আমাদেরও অসুবিধে, আর এদেরও খাবার কষ্ট।—এইরূপ বলিতে বলিতে তেতলা হইতে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত আসিলেন। মা শুনিতে পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, এখন তোমাদের দিন দিন সংসার বাড়চে, এরকম দুএক জন তো আসবেই, তার কী করবে ? গোলাপ-মা কহিলেন, খুদু তো হামেশাই আসচে, একদিনও তো বলে যায় না ! 'তা হোক, তুমি এখন ওকে শীঘ্র খেতে দাও—অনেক বেলা হয়েচে, বাছা আমার ঘুরে ঘুরে আসচে !' 'ওর ওপর তোমার এত দরদ কেন, তোমার শ্বশুর নাকি ?[৮] 'হ্যাঁ, তাই তো ?—ওরা আমার শ্বশুর, আমার সব।'

শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা লইয়া কোন ছেলে হয়তো বাড়ী রওনা হইয়াছে, আর খানিক পরেই জলঝড় আরম্ভ হইল। মা মহাভাবিত হইয়া বলিতেছেন, তাইতো, ছেলেটি আমার যাচ্চে গো, এতক্ষণে বোধ হয় অমুক জায়গায় গেছে ; সেখানে নিশ্চয়ই কোন আশ্রয় আছে। দেখিতে দেখিতে জলঝড় হয়তো থামিয়াই গেল। বিভূতিবাবু জয়রামবাটী হইতে কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতেছেন, রাস্তায় জলকাদা ; তাহার উপর দ্বারকেশ্বর নদও আছে। পরের রবিবার যখন তিনি আবার আসিয়াছেন, মা বলিলেন, বিভূতি, তুমি তো চলে গেলে ; জল হচ্ছিল, আমি ভাবছিলুম, বিভূতি আমার—এত — ক্ষণ বড় নদী—পেরুল !

সুরমা রায় বলেন : আমরা কামারপুকুর হইতে হাঁটিয়া জয়রামবাটী ফিরিতেছিলাম, রাস্তায় জলঝড় আরম্ভ হইল ও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মা নিজের ঘরের বারান্দায়

---

৮ শ্রীশ্রী মার শ্বশুরের নাম খুদিরাম ; শ্যামানন্দেরও ডাক নাম খুদিরাম।

কেবল এদিক ওদিক করিতেছেন আর বলিতেছেন, ছোট বৌ (শিবরামের স্ত্রী) পাগলী, কি জানি এদের খাওয়া হল কিনা, এখনো কেন ফিরচে না? আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই মা ব্যস্ত হইয়া, 'এস মা. এস মা' বলিয়া হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

আমার শ্বশুরবাড়ীতে ব্যবহার ভাল ছিল না। মা সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার—কে কেমন লোক, কে কিরূপ ভালবাসে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সকল কথাই বলিলাম। যেদিন চলিয়া আসিব, নিজের অসুস্থ শরীর নিয়া মা সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৌমাকে তোমার কাছে রাখবে। তিনি বলিলেন, কী করে রাখব মা, আমার যে অল্প আয়, বাসা করে থাকলে বাপ-মাকে কিছু দেওয়া হয় না। মা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, তা হোক, তাদের আরো তো ছেলে আছে, এতে যে পাপ হবে সে পাপ আমি নিলুম।

ধীরেন্দ্র ভৌমিক পাবনা হইতে জয়রামবাটীতে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র মা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, -কখন রওনা হয়েচ? রাস্তায় কোথায় খেয়েচ? কী খেয়েচ? রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই তো? আর উত্তর শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন, এখানে আসতে বড় কষ্ট, তবুও তুমি ছেলেমানুষ একা এতদূর এসেচ!

পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক লিখিয়াছেন: ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহের সুদূর পল্লী হইতে জয়রামবাটী যাত্রা করি। তিন দিনের রাস্তা, কিন্তু একের পর অন্য আমার সঙ্গী জুটিতে লাগিল, তাহারাই রান্না করিয়া খাওয়াইল। জয়রামবাটীতে যখন পৌঁছিলাম, শ্রীশ্রীমা দুঃখ করিয়া বলিলেন, এই কাঠফাটা রোদে অত পথ এলে অসুখ হতে পারে।

কামারপুকুর হইয়া দেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম; কিন্তু আরামবাগ ছাড়াইয়া যাওয়ার পর কোন কারণবশতঃ মার কাছে ফিরিয়া যাইতে মন ব্যাকুল হইল ও পরদিন আবার জয়রামবাটী অভিমুখে চলিলাম। প্রায় একটার সময় জয়রামবাটীতে পৌঁছিবামাত্র উপস্থিত ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, তুমি মাকে বড়ই কষ্ট দিয়েচ, তুমি রোদে রোদে আসচ বলে মা আগে থেকেই বলচেন তাঁর শরীর রোদের তাপে জ্বলে যাচ্চে। কেহ কেহ আমাকে বাতাস করিতে ও খাইতে বসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা শিরোধার্য করিয়া বসিবামাত্র পতিতপাবনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভয় কী, তোমার চিন্তা নাই, খাও—তুমি শান্তি পাবে। আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। বিকালে মা ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন; হৃদয় শান্ত হইয়া মনে অপার আনন্দ আসিল। শেষ রাত্রে উঠিয়া যাত্রা করিব শুনিয়া বলিলেন, যাওয়ার সময় দেখা কোরো। আমি রাত্রি তিনটায় উঠিয়া মনে করিলাম মাকে আর কষ্ট দিব না, কিন্তু দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখি, মা আমাকে চরণধূলি দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন!

একবার কোয়ালপাড়ায় মাকে দর্শন করিতে যাই! বিদায়ের কালে জগদম্বা-আশ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইব এমন সময় চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া গেল।

মা তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরিয়া, ঠাকুরের সম্মুখে আনিয়া বসাইলেন এবং নির্মাল্যপুষ্প লইয়া মাথায় বুলাইয়া দিলেন।

একবার আমার কাজের ভুল হওয়ায় চাকুরি নিয়া গোলযোগ হয় ও জেল হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায়। আমি কাতর হইয়া মাকে সকল কথা নিবেদন করিলাম। মা বলিলেন, ভয় নাই, কোন চিন্তা কোরো না। হৃদয়ে বল আসিল, সমস্ত বিপদ অচিন্তনীয়রূপে কাটিয়া গেল।

ব্রজেশ্বরানন্দ বলেন : খুব কাজকর্ম করিতাম বলিয়া ঠাকুরের সন্তান স্বামিজীরা আমাকে খুব ভালবাসিতেন ; তাহাতে আমার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। মঠের বাহিরে কিছুদিন তপস্যায় কাটাইব স্থির করিলাম, কিন্তু স্বামিজীরা যাইতে দিবেন না। শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিলে তাঁহারা আর অমত করিবেন না মনে করিয়া কলিকাতায় তাঁহার কাছে গেলাম ও প্রণাম করিয়া বলিলাম, মা, আমার একটি কথা আছে। স্নেহমাখা কণ্ঠে মা কহিলেন, কী? বল বাবা। 'মা, আমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি—আবার আসব। মঠে থেকে আমার মন বিগড়ে যাচ্চে ; মহারাজদের ভালবাসা পেয়ে আমি আর সাধুদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, এক এক সময়ে তাঁদের যা তা বলে ফেলি।' 'কোথায় যাবে বাবা? সঙ্গে টাকাপয়সা আছে?' 'না ; গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাশীর দিকে চলে যাব।' 'কার্তিক মাস—যমের চারদোর খোলা, লোকে বলে। আমি তো মা, আমি কী করে বলি বাবা, তুমি যাও? আবার শুনচি তোমার হাতে পয়সা নাই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?' আমার আর যাওয়া হইল না।

মহাদেবানন্দ বলেন : শ্রাবণ মাসে, অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। কিছু তরিতরকারী নিয়া কোয়ালপাড়া মঠ[৯] হইতে জয়রামবাটী যাইবামাত্র শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, এসেচ? বেশ হয়েচে। অনেকদিন থেকে কেউ আসে নাই, বাজার-টাজার হয় নাই, আজ থেকে বাজার করে দিয়ে যেয়ো! বিকালে হলদিপুকুরে কেরোসিন আটা চিনি

---

[৯] কোয়ালপাড়া মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : কোয়ালপাড়া জয়রামবাটী হইতে দুইক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ১৩১৩ সালের বর্ষারম্ভে স্বামী নির্মলানন্দ যখন ধীরানন্দকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যান, রাস্তায় কোয়ালপাড়ার কেদারনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা হয়। কেদার তখন কোয়ালপাড়া ও কোতুলপুর এই দুইটি গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। সন্ন্যাসীদ্বয়ের সৌম্যমূর্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে, তাঁহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। তাঁহাদের উপদেশে কেদার মাকে দর্শন করিতে গেলে মা তাঁহাকে ঠাকুরের ও স্বামিজীর দুইখানি ফটো দান করেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে স্বদেশী ভাবের প্রেরণায় তিনি কোয়ালপাড়ায় তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন ; তাঁহার ছাত্র কতিপয় বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবক তাঁহার সহযোগী হন। ইঁহারা অনেকেই পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া তাঁহার নিত্যপূজো আরম্ভ হইলে মঠের সূত্রপাত হয়। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিবার পথে মা, তথায় স্বহস্তে ঠাকুরের ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে গৌরী-মা লক্ষ্মীদেবী ও ব্রহ্মচারী প্রকাশ মার সঙ্গে ছিলেন। মা প্রথমতঃ লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিতে বলিলে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া আপত্তি করেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, তুমি গুরুকন্যা, তুমি পুজো করবে না কেন?

ঘি ময়দা মিছরি ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস কিনিয়া আনিতে গেলাম। সমস্ত মিলিয়া প্রায় একমণ হইবে। দোকানদার কহিল, আপনি পারবেন না, লোক ডেকে দি। মা কুলি নিতে বলেন নাই, কুলি নেওয়া সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বলিলাম, কুলির দরকার হবে না, আমিই পারব, আপনি ঝুড়িটা আমার মাথায় তুলে দিন। ঝুড়ি মাথায় নিয়া খানিক রাস্তা যাইতে না যাইতে ভীষণ ভারী বোধ হইতে লাগিল ও মাথা জ্বালা করিতে লাগিল। উপরে বৃষ্টি—একহাতে ঝুড়ির উপর ছাতা ধরিয়া রাখিয়াছি; পথ পিচ্ছল—সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। মনে মনে নিজেই নিজেকে বলিতেছি, পা পিছলাইলে চলিবে না, এ তোমাকে লইয়া যাইতেই হইবে। পথিমধ্যে গরুর গাড়ী চলিবার একটু নীচু রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। কোনরূপে সেই রাস্তাটির ওপারে গিয়াছি আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইল বোঝা একেবারে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। কী হইল বুঝিতে না পারিয়া মিনিটখানেক সেখানে দাঁড়াইলাম ও অক্লেশে মার বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই দেখি, মা নিজের ঘরের বারান্দায় একবার পশ্চিম হইতে পূর্বে, আবার পূর্ব হইতে পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতেছেন। সমস্ত মুখখানা লাল, চক্ষু দুইটি যেন কপালে উঠিয়াছে, আর আপন মনে বলিতেছেন, আমি কেন একটা কুলি নিতে বললুম না? বোঝা নামানো হইলে মা বলিলেন, একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলি নাই, তাতে কী হয়েচে? এমন করে কি আসতে হয়?

শ্রীশ্রীমাকে ভক্ত-সন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক রকম আব্দার সহ্য করিতে হইত। দূরাগত ভক্ত জেদ ধরিয়াছেন, ধূলা-পায়ে মার পদপূজা না করিয়া জলগ্রহণই করিবেন না। পিঁড়ির উপর কাষ্ঠবিগ্রহের ন্যায় দাঁড়াইয়া ও পূজা লইয়া মা সেই ভক্তেরই আহারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিলেন।

উমেশবাবু লিখিয়াছেন: জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, তিনচার দিন পরে দেশে যাব, আমার ইচ্ছা আপনার অন্নপ্রসাদ শুকিয়ে নিয়ে যাই। খাওয়ার পর মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঐ গো—তোমার সেই জিনিস। মা একখানা রেকাবিতে অন্নপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ঘরের সম্মুখে একখানা টিন ঝুলানো ছিল, আমি রেকাবিখানা উহার উপরে রাখিতেই বলিলেন, দেখো যেন কাকে মুখ না দেয়। আমি বলিলাম, এখুনই ফিরে এসে এখানে বসব। কিন্তু বাহিরের ঘরে গিয়া তামাক খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় তিনটার সময় ভিতরে গিয়া দেখি মা একই ভাবে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, আজ আপনি বিশ্রাম করেন নাই? মা বলিলেন, না বাবা, তোমার ওটিকে পাছে কাকে মুখ দেয় সেইজন্যে বসে আছি।

তন্ময়ানন্দ লিখিয়াছেন: শ্রীশ্রীমার একটু সেবা করিতে পাইলে জীবন ধন্য জ্ঞান করি—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং মুখে 'জয় মা, জয় মা' বলিতে বলিতে আমি

কেদারের পৈতৃক ভিটায় যে ঘর ছিল উহা তিনচারি বৎসর পরে জগদম্বা-আশ্রমে পরিণত হয়। তাঁতশালার আয় হইতে কোয়ালপাড়া মঠের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহিত হইত এবং সপ্তাহে দুইদিন তরিতরকারী কিনিয়া জয়রামবাটীতে মার সেবার জন্য পাঠানো হইত। সেবকেরাই মাথায় করিয়া দিয়া আসিতেন। মার কাছে যাতায়াতের পথে ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে বিশ্রাম করিতেন। কেহ কেহ কিছু অধিকদিন থাকিয়া প্রত্যহ বা একদিন অন্তর মাকে দর্শন করিতে যাইতেন।

ও পতিতপাবন মণ্ডল একবার জয়রামবাটী যাই। বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখি মা একটি বাটিতে তেল লইয়া পা দুইখানি মেলিয়া বসিয়া আছেন, মনে হইল আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলাম, তিনি কুশল-প্রশ্ন করিলে উত্তর দিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ঐ বাটির তেল লইয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে মাখাইতে লাগিলাম; মা বলিলেন, এই পায়ে একটু জোরে জোরে মাখাও তো, এটাতে বাত। প্রায় আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে মা বলিলেন, বেলা হয়েচে, ঠাকুরপুজো কত্তে হবে, (আমার মুখের দিকে চাহিয়া) এবার হয়েচে তো?

হরিবল্লভ ঘোষ বলেন: "দোলপূর্ণিমার দিন সকালে চারিজনকে (ভাইপো নিরঞ্জন, দুইটি ছাত্র উপেন্দ্র নন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন, যোগেন্দ্র আচার্য) সঙ্গে নিয়া কোয়ালপাড়া পৌঁছি। শ্রীশ্রীমা তখন জগদম্বা-আশ্রমে ছিলেন। গরুর গাড়ী হইতে নামিতেই জনৈক ব্রহ্মচারী আমাদের চারিজনকে মাকে প্রণাম করিবার জন্য লইয়া গেলেন, যোগেন্দ্র গাড়ীতে রহিল। বিকালবেলা ঐ ব্রহ্মচারী আসিয়া কহিলেন, আপনাদের ভিতর যিনি সকালে মাকে প্রণাম করেন নাই কেবল তিনি আসুন। যোগেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে চলিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার তো সকালে হয়ে গেছে, আর আসবেন না। অনেকদিন পূর্ব হইতে দোলপূর্ণিমায় মার পাদপদ্মে আবীর দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কটক হইতে যাত্রা করিবার সময় আবীর সংগে লইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া যায়। পুনরায় বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া উহা কিনিয়া লইব স্থির করি, সেখানেও ভুল হয়। এখন আবীর তো সঙ্গে নাইই, অধিকন্তু সেবকটি মার কাছে যাইতেও দিতেছেন না। নিষেধ সত্ত্বেও মনের আকুলতায় আমি যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বারণ করিলেন। মনের দুঃখে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্মুখে বোড়জঙ্গল ব্যতীত কোন পথ দেখিতে পাইলাম না। স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি আর ফিরিয়া ফিরিয়া আশ্রমের দরজার দিকে তাকাইতেছি এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া বলিল, হরিকাকা, শীগ্‌গির আসুন, মা ডাকচেন। ভিতরে যাইয়া দেখি উঠানে একটি টুলের উপর মা বসিয়া আছেন, তাঁহার কোলে ফাগের থালা! প্রণাম করিতেই বলিলেন, ওরে, আজ যে দোলপূর্ণিমা, ফাগ দিতে হয়। আমি পরিপূর্ণ প্রাণে পাদপদ্মে আবীর দিয়া পুনরায় প্রণাম করিলাম।

গৌরীকান্ত বিশ্বাস লিখিয়াছেন: জয়রামবাটীতে দুপুরবেলা খাইতে বসিয়াছি, সঙ্গে যতীনদাদা ও প্রসন্নমামা বসিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীমা নিজে পরিবেষণ করিতেছেন। আমি মনে মনে মাকে অন্ন নিবেদন করিতেছি এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, এ তো প্রসাদ; এই দেখ, আমি নিজেও প্রসাদ করে দিচ্চি। এই বলিয়া মা আমার থালা হইতে দুটি অন্ন লইয়া মুখে দিয়া আবার আমার পাতে দিলেন। বিদায়ের পূর্বে মার স্বহস্তে দেওয়া প্রসাদ খাওয়ার অভিপ্রায়ে জল চাহিলাম। মা কলসী হইতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এমন জল কখনও খাই নাই, মনে হইল যেন সুধা। আমি, যতীনদাদা ও চারুদাদা তিনজনেই ইহা অনুভব করিলাম এবং বার বার চাহিয়া পান করিতে লাগিলাম। মাও বারবার দিতে লাগিলেন ও মৃদুমৃদু হাসিতে

লাগিলেন। যতীনদাদা বলিয়াই ফেলিলেন, মা, এ তো জল নয়—সুধা ; তাই বারবার খেতে ইচ্ছে হচ্চে ! মা বলিলেন, তা হবে।

প্রশান্তানন্দ বলেন : আমার মাতৃবিয়োগের পর শ্রীশ্রীমার ছবি দর্শন করি এবং তাঁহাকেই আমার মা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। ইহার পরে যখনই মার কাছে গিয়াছি, পেটের ছেলের মত ব্যবহার করিয়াছি ও পাইয়াছি ; কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে আমার খুব ঘোড়ায় চড়ার সখ ছিল। জিবট্যা হইতে ডাক্তার রোজ ঘোড়ায় চড়িয়া জয়রামবাটী আসিতেন। মাকে বলিলাম, তুমি ডাক্তারকে বলে দাও আমি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াব। ঘোড়াটা যে দুর্দান্ত ছিল তাহা মা জানিতেন ও নানাকথা বলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, তুমি বাপের জম্মে ঘোড়ায় চড়া দেখ নি বলে ভয় করচ, আমি ঢের ঘোড়ায় চড়েচি ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ডাক্তারকে বলিলেন, ছেলে ঘোড়ায় চড়তে চায়, তোমার ঘোড়াটা একবার দিয়ো তো বাপু ! ডাক্তার সানন্দে সম্মত হইলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবামাত্র সে একেবারে জিবট্যার দিকে ছুটিল, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিলাম না ! অনেকদূর যাওয়ার পর বহুকষ্টে তাহাকে ফিরাইলাম বটে, কিন্তু সে ঝোড়জঙ্গল বাঁশবনের ভিতর দিয়া চলিল। গা হাত ছড়িয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। মা একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া ততক্ষণ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন আর বলিতেছিলেন, কী হবে গো, ঘোড়াটা যে একেবারে বেসামাল হয়ে চলে গেল ! আমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন এবং গা হাত কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া নিষেধ না শুনার জন্য বকিতে লাগিলেন। পরিধানের কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তখনই একখানা নূতন কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন।

বিংশ অধ্যায়

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীমা তাঁহার সকল সন্তানের উপর কিভাবে লক্ষ্য রাখিতেন তাহা ছোটখাট ঘটনায় নিত্য পরিস্ফুট হইত। দুর্গাদেবী বলেন: মার অসুখের পর একবার জয়রামবাটী যাই। সরলাদিদি তাঁহার সেবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনিই সমস্ত কাজকর্ম করিতেছেন। আমি কোন কাজ করিতে না পাইয়া দুঃখিতমনে বসিয়া আছি, আমার মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, মুখটি কেন ভার করে বসে আছ মা? এস আমার পা টিপবে, পাকা চুল তুলবে।

প্রফুল্লমুখী বসু লিখিয়াছেন: একদিন বিকালে নবাসনের বৌ[1] শ্রীশ্রীমার লেপ, তোষক ইত্যাদি ছাদ হইতে আনিয়া ওয়াড় পরাইয়া বিছানা করিতে লাগিলেন। আমি সেইদিকে তাকাইয়া আছি, যদি ঐ কাজটি করিতে পাই। বৌ চলিয়া যাইতে মা ঘরে আসিলেন এবং বিছানায় দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন, দেখচ মা সব ভুল করে রেখেচে—ওয়াড়গুলো ওলট পালট করে পরিয়েচে! তুমি ওগুলো খুলে, লেপের আর তোষকের ওয়াড় বদলে পরিয়ে ঠিক করে বিছানাটা করে দাও তো।

দীনদুঃখী সন্তানের উপর শ্রীশ্রীমার করুণা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। শ্রীশ ঘটক বলেন: আমার বাবার মাতুল এক বৃদ্ধ কলিকাতায় থাকিতেন; তাঁহার অবস্থা কপর্দকহীন বলিলেও হয়! তিনি ছেলেবেলা হইতে আমাকে ভালবাসিতেন। আমার ইচ্ছা হইল তাঁহাকে একবার মাতৃদর্শন করাইয়া আনি। তাঁহার মত লোকের ভাগ্যে মাতৃ দর্শনের সম্ভাবনা আছে জানিয়া বৃদ্ধ আনন্দিত হইলেন, এবং আমার পরামর্শে এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া সঙ্গে নিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া সংকোচের সহিত সেই বাতাসা বাহির করিবামাত্র মা একখানা বাতাসা হাতে নিয়া তখনই মুখে দিলেন।

একবার দুইজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক—পরণে ময়লা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া জামা—মার কাছে আসেন। মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া স্নান করিয়া আসিতে বলেন। স্নানান্তে ভিজা কাপড় পরিয়া আসিলে মা সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, হা কী কষ্ট, হা কী কষ্ট, এত কষ্ট করে তোমরা এলে গো! (সুশীলা দত্ত-প্রমুখ ভক্তদের প্রতি) ভক্তির টানে এখানে এসেচে।

লক্ষ্মণ চট্টোপাধ্যায় বলেন: মহাষ্টমীর দিন আমরা অনেকগুলি ভক্ত শ্রীশ্রীমার পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তাঁহার শরীর তেমন সুস্থ ছিল না। একটি লোক উঠানে দাঁড়াইয়াছিল, মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ী কোথা বাবা? সে বলিল, তাজপুরে। মা বলিলেন, তুমি দাঁড়িয়ে কেন বাবা, তুমিও পায়ে ফুল দিয়ে যাও। লোকটি নিঃসংকোচে ঘরে ঢুকিয়া পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিল। সে জাতিতে বাগদি।[2]

---

[1] শ্রীশ্রীমার অন্যতমা সেবিকা মন্দাকিনী রায়।

[2] কোয়ালপাড়া মঠে গৌরী-মা এক বাগদি ছেলেকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, মা, এই ছেলেটি বেশ। মা প্রসন্নদৃষ্টিতে ছেলেটিকে দর্শন দিলেন—সে কী হাসিমুখ! কাশীতে দুর্গাবাড়ী যাওয়ার সময় 'খ্যাঁদা গুণ্ডা' হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতেই মা সস্নেহদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। [বি]

জয়রামবাটীতে ভক্তসেবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় জানিয়া যদুনাথ মজুমদার স্থির করিলেন তিনি সেখানে গিয়া ইষ্টদেবী দর্শন করিবেন, কিন্তু ভাত খাইবেন না। বেলুড় মঠে তাঁহার গুরু স্বামী শিবানন্দ তাঁহার সংকল্প শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়া তিনি ও তাঁহার সহযাত্রী এক বন্ধু মাকে প্রণাম করিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা থেকে আসচ? তাঁহারা বলিলেন, বহুদূরদেশ থেকে মা। 'বিষ্টুপুর?' 'না মা, আরো দূর।' 'কলিকাতা?' 'আরো অনেকদূর—পূর্ববঙ্গ নোয়াখালী জেলা, সমুদ্রের কিনার।' 'বাবা, অতদূর থেকে এসেচ। আজ বিশ্রাম কর, কাল সকালে যাবে।' তাঁহারা থাকিতে চাহিলেন না, পুনঃপুনঃ বলা সত্ত্বেও থাকিতে সম্মত হইলেন না। মা জলখাবার খাইতে দিলেন ও কতকগুলি তিলের নাড়ু আনিয়া প্রসাদ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। যখন তাঁহারা বিদায় লইবেন মা তখন পা মেলিয়া ময়দা মাখিতে বসিয়াছেন; যদুবাবু প্রণাম করিলে ময়দামাখা হাত তাঁহার মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'ভক্তিলাভ হবে।'

শ্রীশ্রীমার দৈনন্দিন অতি সাধারণ ব্যবহারও মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল থাকিত। রাধুর এক খুড়াশ্বশুরকে মা নিমন্ত্রণপত্র লিখাইতেছেন: বলিলেন, 'লেখ—বাবাজীবন।' রাধুর মা শুনিয়া বলিলেন, সে কী গো, সে যে তোমার বেয়াই। মা উত্তর দিলেন, তা হোক, সে আমাকে মা বলে আনন্দ পায়, আমি তার কাছে তাই। [স]

মানিকতলা বোমার মামলার আসামী খুলনার বিজয়কুমার নাগ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসেন রামচন্দ্র মজুমদারের সংগে। মা ঘোমটা দিয়ে আছেন দেখিয়াই বিজয় বলিয়া উঠিলেন, আমি তোমাকে দেখতে এলুম, তুমি যে মুখ ঢাকা দিয়ে রইলে! মা মুখের কাপড় সরাইয়া দিলেন ও দুই হাতে বিজয়ের চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। বিজয়ের বয়স তখন যোল সতর বছর।

তন্ময়ানন্দ একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, মা, আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, কখন আপনাকে আপনি বলি, কখন বা তুমি বলে ফেলি—আমাদের তুমি বলা অভ্যাস। আপনার কাছে কত যে অপরাধী হই তার কী হবে? মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তাতে অপরাধ কী? মার সঙ্গে ছেলে কি অত হিসেব কিতেব করে কথা কইবে?

প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের পথ চলিতে চলিতে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল, পান না খাইয়া চলিতেই পারিতেন না। দাঁতের অসুখ থাকায় খড়িকাও ব্যবহার করিতে হইত। জয়রামবাটী হইতে আরামবাগ যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে পাতার ঠোঙায় কতকগুলি পান দিয়া বলিলেন, এইগুলি পথে খাবে। ঠোঙাটি খুলিয়া দেখা গেল উহার মধ্যে একটি খড়িকাও সযত্নে রক্ষিত আছে।

নলিনবাবু শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, মা পুলিপিঠা করিয়াছিলেন, খাইতে দিলেন। নলিনবাবু বলিলেন, আমার গর্ভধারিণী দেহ রেখেচেন, এখন অশৌচ—এ অবস্থায় আমি খাব? মা কহিলেন, তাতে দোষ কী বাবা, আমিও তো মা; আমি দিচ্চি, এখানে দোষ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ রায় বলেন: বালিগঞ্জ হইতে আমরা চারিজন দীক্ষা নিতে জয়রামবাটী যাই। বিষ্ণুপুরে শিবুবাবু নামে আর একজন আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে চা-পানের সময় শিববাবু ডিম খাইতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা খাইতে দিলাম না।

জয়রামবাটী পেঁৗছিবার দুইদিন পরে দুপুরে খাওয়ার সময় মা নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন ছেলেদের জন্যে যে ডিম রান্না হয়েচে, দিয়ে যা। (শিবুবাবুকে দেখাইয়া) এই ছেলেটির পাতে দুটো দে, আর সকলকে এক একটা দে। ও খেতে চেয়েছিল, ছেলেরা খেতে দেয় নি। বাসনা অপূর্ণ রাখতে নাই, খেতে খেতেই ছেড়ে যাবে। শিবুবাবু কাঁদিয়া আকুল।

কমলা ঘোষ বলেন: জগদম্বা-আশ্রমে শ্রীশ্রীমা একঝুড়ি আম কিনিয়া ঢেঁকিশালে আমাকে ও ভূদেবের স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দুজনে এখানে বসে আমগুলি খাও। সেদিন বিকালে আবার কতকগুলি কাঁচ তাল আনাইলেন: ভূদেব কাটিয়া দিতে লাগিল আর আমরা খাইতে লাগিলাম। সেইদিন হইতে তালশাঁস আর আমি মুখে করি না, আর খাওয়ারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।

শ্রীশ্রীমার জন্য দানারগুঁড়ি চাউল, ফুলকপি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়া বরদানন্দ, দ্বিজেন্দ্র, অম্বর্দ্ধ প্রভৃতি বাঁকুড়া হইতে জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। সেইদিন রাত্রে এবং পরদিন দুপুরবেলা আহারের সময় দেখা গেল মা ঠিক সেই জিনিসগুলিই তাঁহাদের জন্য রান্না করিয়াছেন। তাঁহারা অনুযোগ করিলে কহিলেন, বাবা, তোমরা না খেলে কি আমি খেতে পারি?

তপানন্দ বলেন: কলিকাতা হইয়া জয়রামবাটী যাইতেছি, শরৎ মহারাজ দুই ঝুড়ি আম ও কিছু সন্দেশ সঙ্গে দিলেন। বিষ্ণুপুরে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া পরদিন দুপুরবেলা যখন জয়রামবাটীতে পেঁৗছিলাম, মা খাইতে বসিয়াছেন। আমার সাধ ছিল একদিন মার পাতে প্রসাদ পাইব। আহারান্তে মা আমাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন; শালপাতায় আহার করিয়াছিলেন, প্রসাদী জিনিস সমস্তই চারিধারে সজ্জিত ছিল, বলিলেন, বসে পড় বাবা, এ পাতে আমি খেয়েচি।

হরিপদ মাঝি বলেন: কোন ঘটনায় আমার কোয়ালপাড়া মঠে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। কলিকাতার পথে শ্রীশ্রীমা শরৎ মহারাজের সঙ্গে কোয়ালপাড়ায় আসিয়াছেন, লোকজনে মঠ ভর্তি। আমি মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি আর মনে মনে বলিতেছি, মা-তো জগজ্জননী, আমার অন্তরের ব্যথা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছেন। ক্ষেতে কাজ করিতে গেলাম, কিন্তু কাজে মন বসিল না। এমন সময় বিদ্যানন্দ আসিয়া বলিলেন, পদ, মঠে আয়। মঠে যাইতেই কেশবানন্দ বলিলেন, মা তোকে ডাকচেন, যা। ঠাকুরঘরের পাশের ঘরটিতে মা খাটের উপর বসিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিতেই আমার হাতে একখানি প্রসাদী লুচি দিয়া বলিলেন, যা বাবা, এবার অনেক লোক; বাসনা পূর্ণ হয়েচে তো?

শরৎ মহারাজ জ্বরে শয্যাগত। মহেশ্বরানন্দের হাতে একটি টাকা দিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, এটি বাবুরামের হাতে দিয়ো; ঠাকুরের পুজো দেবে আর শরতের নামে তুলসী দেবে।

প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আরামবাগ হইতে জয়রামবাটীতে আসিবার সময় নিজের ছেলেটির হাম হইয়াছে দেখিয়াছিলেন। যখন তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন শ্রীশ্রীমা তাঁহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, কামারপুকুরে শীতলার পুজো দিয়ে যাবে।

ছেলেদের জন্য শ্রীশ্রীমার ভাবনার অন্ত ছিল না। পাছে তাহারা ঘটনাচক্রে বিরূপ অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পায় তজ্জন্য সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। বিভূতিবাবু বলেন: তখন স্বদেশের কাজে লিপ্ত যুবকদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিল। মার কাছে যেসব ভক্ত আসিতেন, পুলিশের লোক আসিয়া নিত্য তাহাদের সন্ধান লইত। জেলার পুলিশের বড়কর্তা ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে দর্শন করিতে চাহিলে আমি তাঁহাকে শিরোমণিপুর হইতে জয়রামবাটীতে নিয়া যাই। তাঁহার আসার কথা শুনিয়া মা ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, ওকে ডেকে নিয়ে এস। ভোলানাথবাবুর পায়ে বুট পরা ছিল; বেলা অধিক নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন, ভিতরে যেতে হলে আমাকে বুট খুলতে হবে। মা সেইকথা শুনিয়া বলিলেন, আমি যাচ্ছি। মা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভোলানাথবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলে আশীর্বাদ করিলেন,—তোমার ভক্তি হোক। তারপরে মা এক বাটি জিলাপী আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি অল্প একটু মুখে করিয়া বলিলেন, মা, আপনার কি ভয় হয়—এখানে যেসব লোক আসে তাদের নাম লেখা হয় বলে? আমি বলিলাম, ভয় কেন হবে? মা কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে আস্তে আস্তে কহিলেন, না বাবু, আমার ভয় হয়। ভোলানাথবাবু কহিলেন, ভয় কিসের মা, আপনি কি বলতে পারেন কোন ভক্ত লোককে কষ্ট দেওয়া হয়েচে? যারা দুষ্ট লোক তাদেরই ভয়ের কথা! আমি যতদিন আছি ততদিন ভয়ের কোন কারণ নাই। মা তাঁহাকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন—তুমি দীর্ঘজীবী হও। পাল্কিতে চাপিয়া যাইতে যাইতে ভোলানাথবাবু বলিলেন, আমার দেহ সম্বন্ধে মাকে কিছু বল্লে না? আমি বলিলাম, আমি ওসব পারব না। তিনি চলিয়া গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কী বলেছিল? আমি বলিলাম, ওর শরীরের কথা আপনাকে বলতে বলেছিল, আমি বল্লুম, পারব না। মা বলিলেন, পারবে না কেন? ওসব লোক বেঁচে থাকলে অনেকের উপকার হয়।[৩]

ডাক্তার কাঞ্জিলাল অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নৌকাযোগে সপরিবার বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে খুব জলঝড় হয়, তাঁহারা কোনরূপে কূলে অবতরণ করিবামাত্র নৌকাখানি ঝড়ের বেগে ছিটকাইয়া দূরজলে চলিয়া যায়। অনেকরাত্রে তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেকথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা ডাক্তারকে কহিলেন, তুমি আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নৌকো করে মঠে বা দক্ষিণেশ্বরে যাবে না।

অহেতুক করুণার বশে শ্রীশ্রীমা বহু সন্তানের দুরারোগ্য ব্যাধির ভোগ নিজের দেহে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরী দেবী বলেন: আমার হাতে একগাছি রূপার তাগা ছিল হিষ্টিরিয়া রোগের প্রতিকারের জন্য। উহাতে যে বিশেষ কিছু উপকার হইত এমন নহে। রোগের কথা কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে সেইদিন অনিবার্য-রূপে উহা ঘটিত এবং ক্রমাগত পাঁচ-সাত দিন নিত্য সন্ধ্যার সময়ে সুরু হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী হইত। আমার হাতে তাগা দেখিয়া পাগলী-মামী উহা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন সব কথা লোককে

---

৩ গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে ভোলানাথবাবু হাওড়ার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বর্ণনাটি যথাযথ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য তাঁহার কাছে যাই; তিনি পড়িয়াই বলেন, ঠিক হয়েচে।

জিজ্ঞাসা কর? কোন অসুখের জন্যে পরে থাকবে আর কি। তারপর আমাকে কহিলেন, তোমার আর এ তাগা পরবার দরকার নাই মা, এ রোগ তোমার অমনিই সেরে যাবে। তদবধি সেই রোগ আমার আর কখনও হয় নাই।

সুরেন্দ্র রায় বলেন: কয়েকটি যক্ষ্মারোগীকে দেখিবার ফলে আমার দেহে রোগ সঞ্চারিত হয়, সর্দিকাশি হইয়া ও রক্ত বমন করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি। শ্রীশ্রীমাকে তখন এই মর্মে একখানা পত্র লিখি: মা আমার এই রকম অসুখ—বাঁচিব না। সাধ, মৃত্যুর পূর্বে একবার তোমাকে দেখি। আমি এখন নিঃস্ব রুগ্ন, সাধ্য নাই তোমার কাছে যাই; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে বরিশালে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে পার। মা, একবার আমাকে দেখিয়া যাও।' মা আমাকে নিজের একখানি ফটো ও এক বৎসরের বাঁধানো উদ্বোধন (১৩১৯-২০) পাঠাইয়া উত্তরে লিখিলেন, 'বাবাজীবন,··· ভয় নাই, অসুখ তোমার সারিয়া যাইবে। অতদূর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যে ফটো পাঠাইলাম উহাই দেখিয়ো এবং উদ্বোধনখানা পড়িয়ো।'[৪] ফটো পাইয়া আমি সাক্ষাৎ মাকেই পাইলাম মনে হইল। ফটোখানি শিয়রে রাখিয়া দিলাম, ক্রমে রোগ সারিয়া গেল।

অঘোরনাথ ঘোষ খেয়াল-বশে প্রাণায়ামাদি করিয়া দারুণ কফ-রোগে আক্রান্ত হন, দীর্ঘকালের নানাপ্রকার চিকিৎসায়ও কোন ফল হয় নাই। তাঁহার কাশিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া মা কেবল বলিয়াছিলেন, বাছার আমার বড় কষ্ট! অল্পদিনের মধ্যেই সেই রোগ একেবারে সারিয়া যায়।

ইঁদুর-দংশনের ফলে আঙুলহাড়া হইয়া শ্যামানন্দ বেলুড় মঠ হইতে মায়ের বাড়ীতে আসেন। অসহ্য যন্ত্রণায় যখনই তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন, কিংবা আহা উহুঁ শব্দ করিতেন, তখনই শুনিতে পাইতেন দোতালায় থাকিয়া মা বলিতেছেন, 'আহা, বাছা আমার সারা হল!' কিংবা 'বাছার আমার কী কষ্টই হচ্চে!' মাতাপুত্রে যন্ত্রণা ভাগাভাগি করিয়া এইরূপে এক দুঃসহ নিশার অবসান হইল।

বিভূতিবাবু বলেন: ব—প্রভৃতি রিলিফ-কার্য করিয়া জয়রামবাটী আসিয়াছে। মা এক টাকার গরম জিলাপী আনাইলেন এবং ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সেই জিলাপী ও মুড়ি সকলকে খাইতে দিলেন। আমরা বৈঠকখানায় বসিয়া যেই খাইতে যাইব, মা কহিলেন, কপাটটা দিয়ে দিয়ো, লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। পরে মা ব—কে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন: ছেলেটি কে? ওঃ! মনে পড়েচে। কাশীতে যখন এল মাথায় তখন চুল বেশী নাই, উস্কখুস্ক চেহারা। আর এখন দেখ কেমন হয়েচে! এই জন্যেই (নিজের পা দেখাইয়া) এই সব।

শ্রীশ্রীমাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া কোন সেবক বলিয়াছিল, মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্চেন, কষ্টটা আমায় দিন না? মা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন: বল কী? ছেলে! মা কখনো ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মার আরো বেশী কষ্ট হয়ে থাকে। (শান্ত হইয়া) আমি সেরে যাব, ভয় নাই! [আ]

---

৪ উদ্বোধনে এই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ প্রকাশিত হইতেছিল।

বাহির হইতে দেখিতে গেলে শ্রীশ্রীমার ভক্তসেবা এক বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু তাঁহার কাছে উহা অতি স্বাভাবিক নিত্যকার ঘটনা। সময়ে অসময়ে নিত্য নূতন লোক আসিতেছে, তাহাদের জাতিবর্ণ, নামধাম কোন কিছুই বিশেষ করিয়া জানা নাই ; গ্রামের লোক অবাক বিস্ময়ে, কখনও বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে—তাহাদের প্রায় সকলেই যে ভদ্রঘরের সন্তান এবং অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ তাহা তাহাদের চালচলন দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া অনুমান করিয়া লইতেছে ; কিন্তু যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল ভক্তের গমনাগমন ও স্থিতি তাঁহার মনে কোনরূপ বিস্ময় বা কৌতূহল তো নাইই, কী করিয়া তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবেন তজ্জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট নহেন ; নিঃসঙ্কোচে নিরুদ্বেগে তাহাদের অভ্যাস ও রুচির অনুকূল দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার কর্মেরও বিরাম নাই।

আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো বিদেশে চাকুরি করেন এবং ঘুম হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চা-পানটি অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন ; শ্রীশ্রীমা পাত্রহস্তে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কাহার ঘরে গাই দোহা হইয়াছে—একটু দুধের প্রয়োজন, ছেলেরা চা খাইবে।

জয়রামবাটীর মত ক্ষুদ্র গ্রাম—তরিতরকারী বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না ; দূরবর্তী হাট হইতে মধ্যে মধ্যে তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্য আনীত হইলেও তাহাতে সকল সময়ে কুলায় না। লোকজন খাওয়াইবার মত ঘরে তেমন কিছু নাই, এমন সময় হয়তো কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে জলখাবার খাইতে দিয়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া কিছু তরকারি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। এদিকে পা খোঁড়াইয়া চলিতে হইতেছে, পায়ে বাত।

পল্লীগ্রামে সহজলভ্য মুড়িগুড় সকলের মনঃপূত হইত না, সকলে খাইতেও পারিতেন না। শ্রীশ্রীমা তাঁহাদিগকে ফলমিষ্টিহালুয়াদি প্রসাদ ঠাকুরের পূজান্তে খাইতে দিয়া, আঁচলে কিছু মুড়ি ও কাঁচা লঙ্কা লইয়া বারান্দায় পা মেলিয়া জলযোগ করিতে বসিতেন। ডালর মধ্যে, শরীরের অনুরোধে কেবল মিছরির সরবৎটুকু গ্রহণ করিতেন। যেদিন ঘরে মুড়িগুড় ব্যতীত অন্য কিছু থাকিত না, সেদিন তাঁহাকে কখন কখন অসুবিধায়ও পড়িতে হইত। শৌর্যেন্দ্র মজুমদারকে মুড়ি, ফুটি আর গুড় খাইতে দিলে তিনি দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, এ কী খেতে দিয়েচ ? এগুলো আমি খাই না। তখন মাকে বুঝাইয়া বলিতে হয় : বাবা, এখানে এই পাওয়া যায়, আর কিছু পাওয়া যায় না। এ খেলে অপকার হবে না, খাও বাবা। যখন কলকাতা যাব তখন তোমাকে ভাল করে খাওয়াব।

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে মাছ অধিক পাওয়া যায় এবং পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকই দুইবেলা মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইতে অভ্যস্ত। তাহারা জয়রামবাটীতে গেলে শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে মাছ খাওয়াইতে চাহিতেন, কিন্তু ইচ্ছামাত্র ভাল মাছ সংগ্রহ করা সকল সময়ে সম্ভব হইত না।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার ভক্ত-সন্তানগণকে খাওয়ানো অতি সহজ জ্ঞান করিতেন। গৃহাগত আত্মীয়কুটুম্বের মনস্তুষ্টিবিধানে বিব্রত হইয়া মা তাঁহার ভ্রাতৃজায়াদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, ওগো, আমার ছেলেপুলের কিছু জ্বালা নাই; আমার একশ' ছেলে যদি আসে, আমি সকলকেই আঁটাতে পারি। [ই]

শ্রীশ্রীমা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকেই যেন উত্তম বস্তুটি খাওয়াইতে চাহিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ভক্তেরা এক এক করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছে আর মা প্রত্যেককেই প্রসাদী দ্রব্যের মধ্যে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট সেইটি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেছেন। প্রথমাগত ব্যক্তি উত্তম বস্তুটি পাইয়া সরিয়া পড়িল; দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশিষ্ট প্রসাদের মধ্যে যেটি উত্তম বলিয়া বোধ হইল সেইটি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে প্রত্যেকেই মনের মত বস্তুটি পাইয়া ভাবিতে লাগিল, মা তাহাকেই বিশেষ স্নেহ করেন!

শ্রীশ্রীমার সকল সন্তানেরই উপর সমান টান ও সীমাহীন স্নেহ ভক্তদের মনে এক এক সময়ে অপূর্ব অনুভূতি জাগাইত। নলিনবাবু বলেন: বেলডিহার শ্যামদাস গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়া একদিন মাকে দর্শন করিতে যাই। দেখা হইবামাত্র মা বলিলেন, আহা, তোমরা কত রাস্তা ঘুরে বাছা, কত কষ্ট হয়েচে। আগে জল খাও। মা আমাদের দুইজনকেই কাছে বসাইয়া মুড়ি-সন্দেশ খাওয়াইলেন। দুপুরবেলা প্রায় পনরজন একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলাম। মা নিজে পরিবেষণ করিতেছিলেন আর আমার মনে হইতেছিল মা আমাকেই বিশেষভাবে খাওয়াইতেছেন। তাঁহার এই পক্ষপাতিতায় আনন্দিত হইলেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। আহারান্তে সেই কথা অন্য সকলের কাছে প্রকাশ করিতে যাইয়া দেখি, সকলের অনুভূতি একই প্রকারের হইয়াছে - প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছে মা তাহাকেই বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমার স্বতঃস্ফূর্ত এই স্নেহধারা জয়রামবাটীর ও অন্যান্য স্থানের অতি সাধারণ লোকেরাও সময়ে সময়ে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত, কিন্তু কী যে দুর্লভ বস্তু তাহারা বহুভাগ্যে ভোগ করিতে পাইয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে নিত্য দর্শনদান করিয়াও অবগুণ্ঠনময়ী মা তাহাদের প্রায় সকলেরই কাছে তৎকালের জন্য নিজেকে আচ্ছাদিত রাখিয়াছিলেন। উদ্বোধন আপিসের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত তাঁহাকে বলেন, আপনাকে কত দূরদেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে; আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, সুপারি কাটেন, ঘর ঝাঁট দেন৫ —আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। মা উত্তর দেন, চন্দ্র তুমি বেশ আছ; আমাকে তোমার বুঝবার দরকার নাই।

উপযুক্ত লোক পাইলে শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীমাকে ফলমিষ্টি পাঠাইতেন। কখন কখন সম্পন্ন গৃহস্থভক্তেরাও মাতৃদর্শনে আসিবার সময় ফল মিষ্টি সঙ্গে নিয়া আসিতেন। ঐসকল দ্রব্যের কিয়দংশ মা কামারপুকুরে ৺রঘুবীরের ভোগের জন্য পাঠাইতেন; কিয়দংশ গ্রামস্থ ৺সিংহবাহিনী ও অন্যান্য দেবতাকে দিতেন এবং পরিমাণে অধিক হইলে গ্রামবাসীদের মধ্যেও বণ্টন করিতেন। উমেশবাবু লিখিয়াছেন: একবার জয়রামবাটীতে মার জ্বর হয়। তাঁহার অসুখ শীঘ্র সারিয়া গেলে সিংহবাহিনীর

৫ শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'ছাই-চাপা বেরাল'।

পূজা দিব মানত করিয়াছিলাম। অনেকের ইচ্ছা দেবীকে একটি পাঁঠা দিয়া পূজা দেওয়া হয়। মাকে সেই কথা জানাইলে মা পাঁঠার পরিবর্তে কিছু মিষ্টি আনাইতে বলিলেন।[৬] কয়েক টাকার রসগোল্লা আনাইয়া সিংহবাহিনীকে পূজা দেওয়া হইল। স্থির হইল বিকালবেলা সেই প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হইবে। প্রায় চারিটার সময় ঘণ্টাধ্বনি করা হইল; অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র দলে দলে আবালবৃদ্ধ সকলে কেহ বাটি কেহ বা ডালা হাতে করিয়া আসিতে লাগিল এবং মার বাড়ীর পশ্চিমদিকের রাস্তায় দুইসারি হইয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল। মা দরজায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সাধুরা পরিবেষণ করিতেছেন আর সকলে জয়ধ্বনি দিয়া আনন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। মার অধরে মৃদুমন্দ হাসি, মুখমণ্ডল স্বর্গীয় স্নেহে উদ্ভাসিত।

রাখাল নাগ বলিয়াছেন: শ্রীশ্রীমার কাছে আমি ধর্মলাভের জন্য যাই নাই, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি যে কোন্ গুণে বড় তাহাও জানিতাম না। শ্বশুরঘরে যাতায়াতের পথে জয়রামবাটীতে মায়ের দরজায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতাম, তিনি আমাকে মুড়ি, গুড় ও জল খাইতে দিতেন। যাতায়াতের পথে তাঁহার হাতে মুড়িগুড় খাওয়া আমার যেন একটা নিয়ম হইয়া গিয়াছিল; উহা না হইলে আর তৃপ্তি হইত না!

মাতৃহৃদয়ের দুর্বার আকর্ষণ এমন বহুলোকই উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ কাছে না থাকিলে শ্রীশ্রীমা বৎস-হারা গাভীর মতই অভাব অনুভব

---

[৬] শ্রীশ্রীমা নিজে পশুবলি দেখিতে পারিতেন না। জয়রামবাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজায় প্রথম প্রথম বলি হইত: এক বৎসর মা উহা বন্ধ করিয়া মিষ্টভোগ দেন, তদবধি আর বলি হয় না। মঠে যেবার প্রথম দুর্গোৎসব হয়, স্বামিজী বলি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মার আদেশে বলি রহিত হয়। জয়রামবাটীর এবং মঠের পূজা দিতে যজমানরূপে মার নামে সংকল্প হইয়া থাকে। তিনি কেবলমাত্র নিজের কৃত পূজায়ই বলি বন্ধ করিয়াছেন দেখা যায়। একবার মা তাঁহার পালিতা কন্যা রাধুর জন্য ৺সিংহবাহিনীকে দুইটি পাঁঠা মানত করিয়া বলি দেওয়াইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার অভিমত জানিতে চাহিলে মা তাঁহাদের বাড়ীতে বলি হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলি হয় শুনিয়া বলিলেন, বাড়ীতে যে নিয়মে পূজা বলি হয় সেই নিয়মেই চলবে, তুমি নিজের হাতে বলি দিয়ো না।

শ্রীশ্রীমা প্রসাদী মাংস স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। বিভূতিবাবু বলেন: আমি একদিন ৺সিংহবাহিনীর পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিন অনেক পাঁঠা বলি হইয়াছিল, আমাকে পাঁঠার একখানা পা পাঠাইয়া দেয়। তাহা দেখিয়া নলিনী 'ছিছি মাগো—মাংস গো—এসব করবে কে?' ইত্যাদি কথা বলিতে থাকে। শুনিয়া মা বলিলেন, এরকম কত্তে নাই, সাক্ষাৎ মহামায়া খেয়েচেন—মহাপ্রসাদ; তোরা না পারিস আমি রাঁধব। খাওয়ার পর মা বিশ্রাম না করিয়া সেই মাংস রান্না করিলেন। বিকালে আমাকে একবাটি মাংস ধরিয়া দিয়া বলিলেন, খাও বিভূতি, মার প্রসাদ—খেলে শক্তি হবে। উপেন্দ্র রায় বলেন: নবমীর দিন পূজা করিয়া প্রসন্নমামা একটি পাঁঠার মুড়া লইয়া আসিয়াছেন। মা স্বহস্তে রান্না করিলেন এবং খাইবার লোক অনেক থাকায় তাহাতে প্রচুর আলু ও জল দিলেন। কিন্তু সে মাংসের যে কী অপূর্ব স্বাদ হইয়াছিল, জীবনে এমনটি আর খাই নাই।

'রাধুর বর মাংস খেতে চায়, তুমি মাংস এনে দিতে পার?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বাজারের মাংস আনিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, ও তো বৃথা মাংস, কালীঘাটের প্রসাদী মাংস আনবে।

করিতেন। তবে ভাব চাপিবার অসীম ক্ষমতাবলে সহজে তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দিতেন না। কদাচিৎ অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে, 'ছেলেরা তোরা আয়!' একবার বিশ্বেশ্বরানন্দ জয়রামবাটীতে গেলে মা বলিয়াছিলেন, এসেচ বেশ করেচ; আমি তোমাকে কদিন ধরে ডাকচি—রাজেনকে ডাকতে গিয়ে তোমার নাম ধরেই ডাকচি!

এই সীমাহীন স্নেহের কাছে আপন গর্ভধারিণীর স্নেহও যে তুচ্ছ হইয়া যাইবে ইহা বিচিত্র নহে। কোন কোন জননীও ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ছেলেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিতে দেখিয়া রোহিণী ঘোষ বলিয়াছিলেন, বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়! অমনি মা বলিলেন, আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।

স্নেহ-বিতরণে শ্রীশ্রীমা সুপুত্র-কুপুত্রের মধ্যে তারতম্য করিতেন না, গুণী-দোষী বিচার করিতেন না। বরং যাহাকে অন্য সকলে অবজ্ঞা উপেক্ষা করে, মা যেন তাহারই পক্ষে থাকিতেন বলিয়া বোধ হইত। অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি লোকের সমস্ত দোষ-দুর্বলতা জানিয়াও শোকে বিপদে সহানুভূতি করিতে, ঔষধপথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে মা বিরত হইতেন না। ইহার ফলে বহু দুশ্চরিত্র লোকের স্বভাব পরিবর্তিত হইয়াছে।

আমজাদের বাড়ী শিরোমণিপুর একজন ডাকাত। তাহার জেল হইয়াছিল। একদিন দেখা গেল তাহার স্ত্রী আর মা খুব কাতরভাবে মার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। মা তাহাদিগকে একটি টাকা দিলেন। আমজাদ যখন মার বাড়ীতে কাজ করিত, মা নলিনীর ঘরের বারান্দায় তাহাকে ভাত খাইতে দিতেন, মুসলমান বলিয়া দ্বিধাবোধ করিতেন না। পূর্বে শিরোমণিপুরের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ডাকাতি করিত বলিয়া জয়রামবাটীর লোক তাহাদিগকে মজুর খাটাইত না। মার বাড়ীতেই তাহারা প্রথম কাজ পায়, আর মার কৃপাতেই তাহাদের অনেকের মতিগতি পরিবর্তিত হয়। [বি]

শ্রীশ্রীমা যখন ১০-২ নম্বর বোসপাড়া লেনে বাস করিতেছিলেন, মঠের একটি উড়িয়া চাকরকে চুরি করার অপরাধে স্বামিজী তাড়াইয়া দেন। সে মার কাছে উপস্থিত হইয়া, 'মা, আমি গরীব লোক, যা মাইনে পাই তাতে আমার কুলায় না। বাড়ীতে সংসার আছে, তাই আমার স্বভাব এরকম—' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। মা তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইলেন। বিকালবেলা স্বামী প্রেমানন্দ প্রণাম করিতে আসিলে মা বলিতে লাগিলেন,—দেখ বাবুরাম, এই লোকটি বড় গরীব; অভাবের জন্যে সংসারের তাড়নায় ওরকম করেচে; তাই বলে কি নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে? তোমরা সন্ন্যাসী—সংসারের যে বড় জ্বালা, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। উহাকে মঠে লইয়া গেলে স্বামিজী বিরক্ত হইবেন, বাবুরাম মহারাজ একথা বলিবামাত্র উত্তেজিত হইয়া মা কহিলেন, আমি বলচি, নিয়ে যাও। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লোকটিকে সঙ্গে নিয়া বাবুরাম মহারাজ মঠে প্রবেশ করিলেন। স্বামিজী বারান্দায় বসিয়াছিলেন, দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

ওটাকে আবার নিয়ে এসেচে—বাবুরামের কাণ্ড দেখেচ? বাবুরাম মহারাজ মার আদেশ জানাইলে স্বামিজী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লোকটিকে মঠে স্থান দিলেন।

শম্ভুচরণ মণ্ডল বাড়ীতে বিবাদ করিয়া প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে বাহির হইয়া যান ও জয়রামবাটীতে আসিয়া মুনিষ নিযুক্ত হন। রৌদ্রে খাটিয়া ঘর্মাক্ত ও পিপাসার্ত হইয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিতেন ও 'মা, জল দাও' বলিয়া ডাকিতেন, শ্রীশ্রীমা তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য জল ও গুড় লইয়া আসিয়া বলিতেন, লও বাবা, বড় কষ্ট হয়েচে, আহা! আর স্বহস্তে পাখার বাতাস দিয়া তাহার দেহনিঃসৃত ঘর্মবিন্দু নিঃশেষে মুছিয়া দিতেন। কোন দিন শম্ভু বাহিরে আড্ডা দিয়া অধিক রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে আসিলে মা হাসিমুখে বলিতেন, শম্ভু এসেচ বাপ? এস ভয় নাই, খাওয়াদাওয়া সেরে নাও।

এই সর্বমঙ্গলা মাতৃশক্তি দুর্নিবার বেগে লোকের মনের উপর কার্য করিত, অবনত মস্তকে উহার নির্দেশ পালন না করিয়া সে পারিত না। বিবাদ-বিসংবাদে দুর্বল ন্যায্যপক্ষ সেইজন্যই অনেক সময়ে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া বিচারপ্রার্থী হইত। অসিতানন্দ বলেন: একদিন মা জগদম্বা-আশ্রমে তেঁতুলতলায় খাটের উপর বসিয়া আছেন এমন সময় এক ডোমের মেয়ে আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তাহার উপপতি তাহাকে অসময়ে ত্যাগ করিয়াছে সে তাহার জন্য সর্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াছিল। তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া মা সেই লোকটিকে ডাকাইলেন ও স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ও তোমার জন্যে যথাসর্বস্ব ফেলে এসেচে; এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েচ; এখন যদি ওকে ত্যাগ কর, তোমার মহা অধর্ম হবে নরকেও স্থান হবে না। মার কথায় লোকটির চৈতন্য হইল ও স্ত্রীলোকটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

লোকের কল্যাণ-সাধনে অহেতুকী আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই শ্রীশ্রীমা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যখন যে প্রার্থনা করিতেন তাহা ব্যর্থ হইত না। ভক্তদের কাছে বলিয়াছিলেন: ঠাকুর চলে যাওয়ার পর যখন ছেলেরা সব ঘরবাড়ী ছেড়ে আসতে আরম্ভ কল্লে, তখন আমি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করেচি, ওদের যেন মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। তাই ঠাকুর এখন দিচ্চেন।

এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে জয়রামবাটী অঞ্চলের ক্ষেতের শস্য জ্বলিয়া যায়। চাষীরা মার কাছে যাইয়া বলে, এবার মা, আমাদের ছেলেপুলের বাঁচার আশা নাই, সকলকেই না খেয়ে মত্তে হবে। একথা শুনিয়া মা তাহাদের সঙ্গে ক্ষেত দেখিতে গেলেন ও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হায় ঠাকুর, এ কী কল্লে! শেষটায় কি এরা না খেয়ে মরবে? সেই রাত্রিতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইল। সেবার এত শস্য জন্মিয়াছিল যে, বহু বৎসরের মধ্যে এরূপ হইতে দেখা যায় নাই। [সু]

শ্রীশ্রীমার লোককল্যাণসাধনে একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে একের বাসনাপূর্তি অন্যের বা অনেকের অনিষ্ট করে, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার অর্থ তদীয় পরিবারের অনেককে নিরাশ্রয় করা, সেখানে মা ঐ ব্যক্তিবিশেষের মনস্কামনা সর্বাংশে পূর্ণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন এবং ব্যক্তির কল্যাণ ও সমষ্টির কল্যাণের অপূর্ব সমন্বয় করিয়া দিতেন।

হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: প্রথম বয়সে আমি কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীতে কাজ করতাম। বেতন কুড়িটাকা মাত্র, কিন্তু উপরি পাওনা যথেষ্ট। অসদুপায়ে উপার্জন করিতে হয় বলিয়া মনে ধিক্কার আসে, সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া এক ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে ঠিকাদারের কাজ স্বীকার করি। অল্পদিনেই যখন বুঝিলাম এই কাজটি ততোধিক—একেবারে পুকুরচুরি, তখন এই কাজও ছাড়িয়া দিয়া জয়রামবাটীতে চলিয়া গেলাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে ডাকাইয়া নিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীক্ষা দিলেন। তারপরে খাবারের থালাখানা ধরিয়া দিয়া পাখা-হাতে কাছে বসিয়া আমাকে খাইতে বলিলেন। আমি তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম মা, আমি তো তোর[৭] কাছে খাওয়ার জন্যে আসি নি; আমার মনে যে ব্যথা আছে, তার একটা প্রতিকার না করলে আমি খাব না। জাগতিক অভ্যুদয়ের ইচ্ছা আমার ছিল না, একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় ও সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাই এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই, তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। মা বলিলেন: দেখ্, কতকগুলি পোষ্যের ভার ভগবান তোর উপর দিয়েছেন: তুই সংসার ছেড়ে গেলে তাঁরা নিরাশ্রয় হবে, আর তাদের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে। একজনকে সংসার ছাড়তে নিষেধ করেছিলুম: সে কথা না শুনে জেদ করে ধরাতে সংসার ত্যাগ হয়ে গেল। তার ছেলেপুলেদের খুব কষ্ট, সেজন্যে আমাকেই বিব্রত হতে হয়। আমি তোকে বলচি তোর সংসার ছাড়বার দরকার নাই, আমার সংসার মনে করে তুই থাক্। তোর কোন ভয় নাই, তোর যা কিছু একদিনেই হয়ে যাবে। আর যা রোজগার করবি আমার জন্যেই কচ্চিস বলে মনে করবি। না হয় আমাকে কখনও কিছু দিবি। তুই তো আমার ছেলে, ছেলে হয়ে মায়ের জন্যে খাটবি না তো খাটবি কার জন্যে?

তপানন্দ বলেন: শ্রীশ্রীমার কাছে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে মন অন্তর্মুখী হইল। যখন তখন নাদশ্রবণ ও জ্যোতির্দর্শন হইতে লাগিল। ক্রমে আত্মীয়স্বজন সকলকেই ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন জ্ঞানে ভয় করিতে লাগিলাম। এক বৎসর যাইতে না যাইতে ঘরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সংকল্প করিলাম, মার অনুমতি লইয়া সংসার ত্যাগ করিব। অন্নপূর্ণার মা[৮] পূর্বেই স্ত্রীকে লইয়া মার কাছে গিয়াছে এবং যাহাতে মা অনুমতি না দেন তজ্জন্য উভয়ে কান্নাকাটি করিয়া আসিয়াছে। তাহারা জানে, মা অনুমতি দিবেন না। আমি যখন মার কাছে গেলাম সেই সময়ে গোলাপ-মা নিকটে ছিলেন। মার পায়ে মাথা রাখিয়া কেবল কাঁদিতেছি, অশ্রুতে তাঁহার পা ভিজিয়া গিয়াছে, বলিলেন, বাবা, গোলাপকে কি সরে যেতে বলব? আমাকে কি নির্জনে কিছু বলবে? আমি গোলাপ-মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, না; উনি থাকুন। তারপরে বলিলাম, মা, আমার ইহকালের পরকালের সব ভারই তো আপনি নিয়েচেন, এখন নির্জনে পবিত্রভাবে আপনাকে ও ঠাকুরকে চিন্তা করে জীবনের বাকি দিন কয়টি কাটাব—এই সাধ করে আপনার অনুমতি নিতে এসেচি। শুনিয়াই গোলাপ-মা

৭ শ্রীশ্রীমার প্রতি 'তোর' ইত্যাকার শব্দ-প্রয়োগ সরলবিশ্বাসী এই একটিমাত্র ভক্তই করিয়াছেন দেখা যায়। ক্বচিৎ কোন ভক্ত তাঁকে 'তুমি' এবং অপর সকলেই 'আপনি' বলিতেন।

৮ ঠাকুরের সময়কার ভক্ত, তখন মনোহরপুকুরে ইঁহাদের বাসার একাংশে থাকিতেন।

বলিলেন, ছেলেটির অনুরাগ হয়েচে, তুমি ওকে অনুমতি দাও—অনুমতি না হলে তো ও যেতে পারবে না - সংসারে থাকতে না পেরে যদি ও আত্মহত্যা করে, তুমি তার পাতকী হবে। মা বলিলেন, সে যে একেবারে কচি মেয়ে, কী করে দিন কাটাবে! অমনি গোলাপ-মা বলিলেন, মরুক গে ছুঁড়ী। মা বলিলেন, তবে বাংলা দেশ ছেড়ে যেয়ো না; মেয়ে যদি চিঠিপত্র লেখে তার উত্তর দিয়ো; যদি দেখবার জন্যে খুবই ব্যাকুল হয়, কাছে গিয়ে দেখা দিয়ো। ইহার পরে অন্নপূর্ণার মা পুনরায় স্ত্রীকে লইয়া মার কাছে উপস্থিত হইলে মা বলিয়াছিলেনঃ আমি কী করে নিষেধ করব মা, ওর ভগবানের জন্যে ঠিক ঠিক অনুরাগ হয়েচে। ও তো ঠিকই বলেচে, ইহকালের পরকালের ভার তো আমিই নিয়েচি। তুমি তো আমার কাছেই থাকতে পার—তা তোমার শ্বশুরবাড়ীর আর বাপের বাড়ীর ওরা রাখবে কি?

শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে আসিয়া যাঁহাদের স্বামী সংসারত্যাগী হইয়াছেন এমন কোন কোন স্ত্রীলোককে মা নিজের কাছেই স্থান দিয়া উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোন ত্যাগী সন্তানকে মা বলিয়াছিলেনঃ কদিন আগে তোমার পরিবার এখানে এসেছিল; তা তুমি কী করবে, তুমি তো ব্যবস্থা করে দিয়েচ। আমি এখানে থাকতে বল্লুম, তা শুনলে না: তার কপালে এখানে থাকা নাই; বলে, আমার অমুক আছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল।

নলিনীকান্ত বসু বলেনঃ শ্রীশ্রীমাকে কখন কখন সংসারের অশান্তির কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া গিয়াছি। দুইএক কথা বলিতে না বলিতেই তিনি বলিয়া উঠিতেন, ওসব জানি। আমার আর বলা হইত না। সংসারে অশান্তি, অথচ মঠে সাধুরা বেশ আছেন মনে হইত। সেকথা শুনিয়া মা কহিলেনঃ সাধু-জীবন ভয়ানক কঠিন, তোমাদের সহ্য হবে না। আহিরীটোলার ব্রহ্মচারী নন্দ মঠে যোগ দিয়েছিল, শরীর টিকল না বলে এখন বাড়ীতে আছে, তুমি মাঝে মাঝে গিয়ে তার সঙ্গ করবে। ভয় কী বাবা, আমরা তো আছি। এই বলিয়া মা আমার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন।

ব্যক্তিভেদে শ্রীশ্রীমার বিধান ব্যবস্থা ও ব্যবহারের বিভিন্নতা কাহারও কাহারও মনে বিভ্রমের সৃষ্টি করিত, মাকে তাঁহারা পক্ষপাতদোষে দোষী ভাবিয়া বসিতেন। ধ্রুবানন্দ বলেনঃ মামাদের জমিজমা ভাগ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা হইতে শরৎ মহারাজ ভূমানন্দকে সঙ্গে নিয়া আসেন। কেশবানন্দ এই সকল কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও কোয়ালপাড়া হইতে আনয়ন করা হয়। রাত্রে শরৎ মহারাজ প্রভৃতির জন্য লুচি হইত, কিন্তু কেশবানন্দকে মা গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে দুপুরবেলার জলে ভিজানো ভাত খাইতে দিতেন। দুইএক দিন এরূপ হওয়ার পর, মা কলিকাতার লোকদিগকে অধিক খাতিরযত্ন করিতেছেন মনে করিয়া কেশবানন্দের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করেন নাই। সেইরাত্রে খাওয়ার সময় দেখা গেল তাঁহার জন্যও লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইএক দিন লুচি খাইয়াই তিনি বুঝিলেন তাঁহার পেটে লুচি একেবারেই হজম হইতেছে না। অগত্যা মাকে বলিয়া পুনরায় ভিজা ভাতেরই ব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-লেখক পরমভক্ত অক্ষয়কুমার সেন এক সময়ে অনুরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তল্লিখিত এক পত্রের শ্রীশ্রীমা যে উত্তর দেন তাহা এইরূপ ঃ

শ্রীশ্রীকালী সহায়

চিরজীবেষু—

...তোমার পত্র একখানি পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। মাথার অসুখ আমার ভাল হইয়াছে, এখন কিছু যন্ত্রণা নাই। জয়রামবাটী আসিবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু এসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র জানি নাই। আমার দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবেক তাবৎকাল পর্যন্ত আসাযাওয়া করিবে। আমার আপনার পর কেহই নয়, সকলই সমান। কলিকাতার লোক কিসে আপনার হইল, আর তুমি বা কিসে পর হইলে? আমার তো মনের মধ্যে কিছুই দুই-দুই নাই। যখন ভগবানের শরণাগত হইয়াছ তখনই আপনার। তুমি মনে দুঃখ করিও না, যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই তুমি আসিবে। তোমার পত্র শুনিয়া আশ্চর্য [বোধ] হইল। তুমি মনের ভিতর কিছু ময়লা রাখিও না। ইতি—

পুনশ্চ—তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার ঠিকানা বেশ স্মরণ নাই। আমি শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের কৃপায় ভাল আছি। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিও। ইতি—তাং ২৮ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার [১৩০২]।

এই পত্রখানি লিখিবার প্রায় একবৎসর পূর্বে (১৩০১ সালের ১২ই আষাঢ়) অক্ষয়-বাবুকে শ্রীশ্রীমা লিখিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে মনের সহিত ভালবাসি'। অক্ষয়বাবু স্বভাবতঃ অভিমানী ছিলেন, ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অনেক সময়েই নিষ্কারণ অভিমান করিয়া বসিতেন। তাঁহার লিখিত মায়ের আশীর্বাদসিক্ত অমরগ্রন্থের এক স্থানে মাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ

দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান।
গৃহীরা কি বানে ভাসা পরের সন্তান?
তুমি ত করেছ গৃহী দিয়া মায়াঠুলি।
ঘুরাতেছ ঘানি-গাছে খাওয়ায়ে বিচালি॥
ছুটে ছুটে মরি খেটে, পেটে নাহি ভাত।
তাহার উপরে মা তোমার কশাঘাত॥
কী বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভুমে গড়াগড়ি॥
মায়ের নিকটে হেন শোভা নাহি পায়।
এরূপ কোথায় করে কোন্ দেশী মায়?
অ-মাতার ব্যবহার দেখে কত সই।
কবে দিনু গুখুজ্যের পাকাধানে মই?

সংসারত্যাগী অপেক্ষা সংসারী ভক্তদিগের প্রতি শ্রীশ্রীমার 'টান' কিছুমাত্র কম ছিল না। মার এক ত্যাগী সেবক বলিয়াছেন, অনেকসময়ে সাধুদের অপেক্ষা গৃহী ভক্ত-দিগকে মা অধিক ভালবাসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মনে ঈর্ষা জন্মিয়াছে। কলিকাতায় অথবা কোয়ালপাড়া মঠে সাধুদের সাক্ষাতে মার আদরযত্ন-লাভে গৃহী ভক্তেরা সঙ্কুচিত

হইতেন। জয়রামবাটীতে এক গৃহী ভক্তকে মা বলিয়াছিলেন, কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুবিধে আমার হয় না, তোমাদেরও হয় না; কোয়ালপাড়াতেও না। যখন ইচ্ছে এখানে আসবে। [উ]

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধুরা শ্রীশ্রীমাকে ৺বিজয়ার প্রণাম জানাইয়াছেন। একজন একতাড়া চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া প্রণাম করিতেছে আর বলিতেছে, মা, এই কাশীর সাধুদের প্রণাম নিন, এই মঠের সাধুদের প্রণাম নিন. এই মাদ্রাজ মঠের সাধুদের ··· । বিভূতিবাবু প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, যত বৌ ঝি ছেলেমেয়ে, যে যেখানে আছে, তোমার প্রণামের সঙ্গে তাদের সকলের প্রণাম হোক।

শ্রীশ্রীমা 'যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন' ব্যবস্থা কেবল মানুষের জন্যই নহে, পশু-পক্ষীদিগের জন্যও যথাসম্ভব করিতেন, তাহাদের প্রতিও তাঁহার ভালবাসার অভাব ছিল না। রাধু একটি বিড়াল পুষিয়াছিল, তাহার জন্য রোজ একপোয়া দুধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিড়ালটি মার পায়ের কাছে শুইয়া থাকিত। একদিন মা বলিলেন বেরালটাকে আমি লাঠি দিয়ে মারচি তবু ভয় কচ্চে না; প্রান বেরালটাকে জোরে আছাড় দিয়েছিল! বলিতে বলিতে তাঁহার মুখে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। [ব]

'বেরোল তো পরের ঘরে চুরি করেই খাবে?' একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন, চুরি করা তো ওদের ধর্মই বাবা, কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে? ওদের স্বভাবই হল তাই। [ন]

বিড়ালে বিড়ালে খেয়োখেয়ি করিয়া একটির পা ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, বেরালের পাটি ভেঙ্গে গেল গা, কী করে শিকার ধরে খাবে? নলিনকে ডাক তো। ডাক্তার নলিনবাবু আসিয়া এক টুকরা কাঠ ও নেকড়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। কয়েকদিনে বিড়ালের পা সারিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়ীতে গণেন্দ্রনাথের বিছানায় বিড়াল কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে। শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা দুইজনে মিলিয়া তাড়াতাড়ি সাবান দিয়া বিছানার চাদর ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া রাখেন এবং যাহাতে গণেন্দ্রনাথ কিছু বুঝিতে না পারেন সেইরূপ ব্যবস্থাও করেন। তথাপি যদি কোনরূপে বুঝিতে পারিয়া তিনি বিড়ালটিকে বিদায় করিয়া দেন সেই ভয়ে তাঁহাকে মা বলিয়াছিলেন, বেরালটি এখানেই থাকে, এখানেই খায়, প্রসব হতে যাবে কোথায়? ওকে আর কিছু বোলো না।

শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে একটি পোষা টিয়া-পাখী ছিল, মা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গঙ্গারাম'। নিত্য বহুকণ্ঠে মা-ডাক শুনিতে শুনিতে সে ঐ নাম শিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, 'মা -ওমা—' বলিয়া ডাকিত। পাখীর দীর্ঘ মা-বুলিটি মধুর শুনাইত। পূজা শেষ করিয়া মা জিজ্ঞাসা করিতেন, বাবা গঙ্গারাম, কী বলচ? তারপরে প্রসাদী ফলমিষ্টি ও মিছরির পানা আনিয়া সকলের আগে তাহাকে খাইতে দিতেন।[৯]

---

[৯] শ্রীশ্রীমার অপ্রকট হওয়ার দুইতিন বছর আগে গঙ্গারাম গরমের দিনে মারা যায়। মা তখন বলিয়াছিলেন, গোপাল আমার অনেক ভগবানের নাম শুনিয়েচে। গেরুয়া কাপড়ে মা তাহার শরীর ঢাকিয়া দেন এবং তাঁহার কথানুসারে সেজমামা বরদাপ্রসাদ ও অপর দুইতিন জন খোল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে নদীতীরে উহাকে মৃৎসমাহিত করেন। [ই]

একদিন বিকালে এক নাগা-সাধু হাতী চড়িয়া জয়রামবাটীতে আসিলেন। একটি ছোট হাতী, কেহ সাধুকে দিয়াছে। শ্রীশ্রীমা বাটিতে করিয়া কিছু চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন ও তাহার মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। [স]

অরূপানন্দের কাছে শুনিয়াছি, শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি সেই স্নেহরসাস্বাদে বঞ্চিত ছিলেন। যখন খেলাধুলার অন্তে গৃহে ফিরিয়া অন্যান্য ছেলেরা নিজ নিজ গর্ভধারিণীকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে থাকিত তখন তিনি নিজের জীবনে এক অপূরণীয় অভাব অনুভব করিতেন। তারপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া তাঁহার সেই অভাব দূর হইল। শুধু দূর হইল বলিলে ঠিক হয় না, তিনি নিজের হৃদয়পাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সকলেরই মা? মা বলিলেন, হ্যাঁ। 'এই সব ইতর জীবজন্তুরও?' হ্যাঁ, ওদেরও।'

সিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিয়াছেন: কলিকাতার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন; তাঁহার পাশে আমি ও আমার বন্ধু ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সম্মুখে দুইজন পাশ্চাত্য ভক্ত - একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক।[১০] আর গিরিশবাবু দরজার চৌকাঠের প্রায় উপরেই বসিয়াছেন, মার সম্মুখে বসেন নাই। পাশ্চাত্য ভক্ত দুইটি ইংরাজীতে কথা কহিতেছেন, গিরিশবাবু দোভাষীর কাজ করিতেছেন।[১১] স্ত্রীভক্তটি

---

১০ ডাঃ হ্যালক ও মিস্ গ্রে। উভয়েই শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য।

১১ অন্য ভাষাভাষীর কথা শ্রীশ্রীমাকে সকল সময়েই অনুবাদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইত না। তিনি অনায়াসে তাহারা কী বলিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে এবং নিজের বক্তব্য বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যেই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম ছিলেন। কোয়ালপাড়া মঠে নারায়ণ আয়েঙ্গার মার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতেন, মহেশ্বরানন্দ দোভাষীর কাজ করিতেন। কিন্তু এক এক সময়ে অনুবাদ শুনিবার পূর্বেই মা আয়েঙ্গারের কথার উত্তর দিয়া বসিতেন। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী ধ্যানানন্দের কাছে শুনিয়াছেন—মাদ্রাজে একটি স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিয়া মা তাহাকে সঙ্গে করিয়া খাইতে বসেন। স্ত্রীলোকটি তামিল ভাষায় প্রশ্ন করিতে এবং মা বাঙ্গলা ভাষায় উত্তর দিতে থাকেন। এইরূপে দুজনের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা আলাপ হয়, অথচ পরস্পরের কথা বুঝিতে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। ভিন্নভাষাভাষীদিগকে দীক্ষাদানের সময়ে মা বাঙ্গলাতেই কথা কহিতেন, তাহারাও তৎকালে তাঁহার বক্তব্য অনায়াসে বুঝিতে পারিত। আমেরিকান মহিলা সিস্টার দেবমাতা তাঁহার Days in Indian Monastery (ভারতীয় মঠে দিনগুলি) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: আমাদের দুইজনের ভাষা বিভিন্ন; কিন্তু তিনি (শ্রীশ্রীমা) অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে গভীর শব্দহীন ভাষা প্রকাশ করিতেন তাহাতেই আমরা পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিতাম।

বলিলেন, মা, আমি আপনার মেয়ে ? মা বলিলেন, 'হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে। পুরুষ-ভক্তটি বলিলেন, আপনি যে জগন্মাতা তা কী করে বুঝব ? মা উত্তর দিলেন, এখানে যখন এসেচ তখন বুঝতে পারবে। এইভাবে কথাবার্তা চলিয়াছে ; আমি বসিয়া বসিয়া মাকে দেখিতেছি, মার স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা শুনিতেছি, একটা পারিবারিক আবেষ্টনীতে সন্ধ্যার পর সকলে মার কাছে বসিয়া আছি।

মাতৃভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশে শ্রীশ্রীমার সমগ্র সত্তাটিই যখন তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠিত তখন জগতের নরনারীগণের তো কথাই নাই, স্বীয় পতিকেও উহা নিজের বিষয়ীভূত করিয়া ফেলিত। শান্তাদি ভাবচতুষ্টয় যে মধুরভাবের অন্তর্নিবিষ্ট, রসবেত্তা পণ্ডিতগণ একথা বলিয়া গিয়াছেন। মধুরভাবের অন্তর্নিহিত বাৎসল্যভাব তখন বিশেষরূপে বর্ধিত হইয়া ঠাকুরের সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবকে অনুরঞ্জিত করিয়া ফেলিত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 'মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখতেন ?'—কাহারও এই প্রশ্নের উত্তরে অতীত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'ছেলের মতন দেখি।' [ন]

একবিংশ অধ্যায়

গুরু

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমার গুরুভাবটিকে তাঁহার মাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারা যায় না। গর্ভধারিণী মার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ—মাকে গুরুত্বে বরণ অতি প্রশস্ত, তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন। মাতৃত্বের সর্বোচ্চ মহিমা লোকসমক্ষে বিশেষভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই কি সকল মায়ের সমষ্টিরূপা জগন্মাতার এই দক্ষিণা মূর্তিতে প্রকাশ ?

শ্রীশ্রীমার জ্ঞানদা গুরুমূর্তি সম্বন্ধে ঠাকুর গোলাপ-মাকে বলিয়াছিলেন, 'ও সারদা সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেচে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেচে।' মাকে অলংকার গড়াইয়া দিতে অভিলাষী হইয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা –ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।'

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; তবে স্বামিজীর উক্তিতে আর একটি বিশেষত্বও প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঘটনায় স্বামিজীর মুখ হইতে এইরূপ উক্তি নির্গত হয় তাহা প্রণিধানযোগ্য। সুরেন্দ্র সেন বলেন: আমার বাল্যকাল হইতে ধর্মের দিকে ঝোঁক। স্বামিজী যখন আমেরিকা হইতে দেশে আসিলেন, পড়াশুনা ছাড়িয়া তিন বৎসর তাঁহার পিছনে ঘুরিলাম এবং দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি যাহা কিছু ধর্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন, দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম! অবশেষে স্বামিজী সম্মত হইলেন, তিনচারি জনকে দীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মঠের ঠাকুরঘরে যাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। একে একে অন্য সকলের দীক্ষা হইয়া গেল; শেষে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, ঠাকুর বল্লেন, আমি তোর গুরু নই; ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়, তোর হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে। একথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম; ভাবিলাম, স্বামিজী হইতে আবার বড় কে? অনুপযুক্ত বলিয়া অনুগ্রহ না করিয়া ফাঁকি দিয়া বিদায় করিলেন!

ইহার কিছুকাল পরে রাত্রে স্বপ্ন দেখি,—আমি ঠাকুরের কোলে বসিয়া আছি; এক উজ্জ্বল দেবমূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, একটি মন্ত্র নাও। আমি বলিলাম, এখন ঠাকুরের কোলে বসে আছি, মন্ত্রতন্ত্রের কোনদিনই ধার ধারি না। তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে?—'আমি সরস্বতী' বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এতে কি হবে? উত্তর দিলেন, কবি হতে পারবি। কবির দলের উপর আমার কোনদিনই ভাল ধারণা ছিল না। সেই কবির দলের সর্দার হইতে হইবে মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলাম, আমি কবি হতে চাই না।

দেবীমূর্তি কহিলেন, কবি মানে জানিস? কবি মানে জ্ঞানী। এই কথা বলিয়া, জপ করিবার প্রণালী পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

অল্পদিন পরে মঠে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন,- ঠাকুর বলতেন, দেবস্বপ্ন সত্য। একে স্বপ্নসিদ্ধি বলে। এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। আমি বলিলাম, আমি স্বপ্ন কোনদিনই বিশ্বাস করি না, সে অমূলক চিন্তামাত্র। যদি কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি দিন। 'এসব বুঝি 'বোধোদয়' বইয়ে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' পড়ে তোর ধারণা হয়েচে? তা নয়। ধারণা করে রাখ্, বাস্তবিক এটি সত্য। ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখিতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।' 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারচি না।' 'সময়ে বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।' 'আমার এসকল বিশ্বাস হয় না।' 'বিশ্বাস করিস বা না করিস জপ করে যা, কল্যাণ হবে।' আমি একদিনও জপ করি নাই।

ইতোমধ্যে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী পাঠ এবং তাঁহাকে চিন্তা করিতাম। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে ঠাকুর ও স্বামিজীর দেখাও পাইতাম। এইরূপে প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১৩ সালে আমি ও ডাক্তার লালবিহারী সেন ৺পূজার সময়ে মঠে যাই। মঠ হইতে রওনা হইয়া, পথে কামারপুকুরে একদিন থাকিয়া শিবুদাদার সঙ্গে জয়রামবাটী পেঁছিলাম। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, বাবা, কী নেবে? আমি বলিলাম, তা তো বুঝতে পারি না। মা বলিলেন, যা চাবে তাই পাবে; শক্তি নেবে? আমি বলিলাম, শক্তি-টক্তি তো কিছু বুঝি না; আমার কী আবশ্যক তাও জানি না; যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হয় তোমার, যাতে আমার ভাল হয় তাই দাও। মা বলিলেন, আচ্ছা, কাল সকালে হবে; কিছু ফুল যোগাড় করে রাখবে। মার অনুমতি নিয়া আমি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি মন্ত্রপ্রার্থী হইলে মা বলিলেন, কাল ভাল দিন—লক্ষ্মীপূর্ণিমা; কাল হবে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, এদিনে দীক্ষা হলে কী হয়? মা বলিলেন, শীঘ্র সিদ্ধি হয়।

দীক্ষার সময় মা তাঁহার ডান হাত আমার মস্তকে এবং বাঁ হাত চিবুকে রাখিয়া মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা যুগপৎ মনে হইল ও মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণেকের জন্য যেন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম কিন্তু আনন্দানুভূতি লুপ্ত হইল না। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক। 'মা, আমি অনেকদিন আগে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই'—এইমাত্র বলিতেই মা উত্তর দিলেন,—কেন, মিলচে না? ঠিক মিলেচে তো? মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে পাও না?

স্বামিজী বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার উপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি। সংহারমূর্তির সূচক কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। প্রবোধবাবু বলেন: কামারপুকুরে শিবুদাদার অনুপস্থিতিতে ও রামলাল দাদার অমতে, শিবুদাদার স্ত্রী

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের যোগে নিজের কন্যা পাঁচীকে সেইদিন রাত্রেই নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহ দিতে উদ্যত হন এবং কন্যাকে অন্যত্র লুকাইয়া তালাবন্ধ করিয়া রাখেন। রামলালদাদার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া আমি ও জ্ঞানানন্দ কৌশলে মেয়েকে উদ্ধার করি এবং তাহাকে লইয়া সন্ধ্যার পূর্বে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হই। মাকে এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও আগে জানানো হয় নাই, সেইজন্য আমাদের কৃতকর্ম সঙ্গত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে একটা খট্‌কা ছিল। রামলালদাদার সম্মতিক্রমে মেয়েকে আনা হইয়াছে কিনা, মা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মত আছে জানিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন। এই ব্যাপারে লাহাবাবুরা অসন্তুষ্ট হইবেন, সুতরাং কামারপুকুরে জমি কেনার ও মন্দির-নির্মাণের কাজে সম্ভবতঃ বাধা পড়িবে, এই কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া ফেলি, তা ওখানে মন্দির নাই বা হল; ঠাকুর তো ওখানে মঠ-মন্দিরের জন্যে বসে নাই, কত জায়গায় কত মঠ-মন্দির হয়েচে। একথায় বিরক্ত হইয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে মা কহিলেন, ওকী কথা বল গো? ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান মহাপীঠস্থান তীর্থভূমি![1] ওকথা বলতে আছে? তারপরে আমি কথায় কথায় বলিলাম, ছোট বৌ ক্ষেপে গিয়ে ঘরে না আগুন ধরিয়ে দেয়। অমনি মা বলিলেন, তা হলে বে—শ হবে, তাহলে বে শ হবে, ঠাকুর যেমনটি ভালবাসেন তেমনটি হবেঃ তিনি শ্মশা-ন ভালবাসেন, সব শ্মশান—হয়ে যাবে বলিয়াই মা হাসিতে আরম্ভ করিলেন, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ '। সেই হাসিতে আমি ও জ্ঞানদাদা দুইতিন সেকেণ্ড যোগ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার স্বর তীব্রতর ও গম্ভীরতর হইয়া চকিতে ত্রাসের সঞ্চার করিল এবং ২০।২৫ সেকেণ্ড ব্যাপী ক্রমবর্ধমান ঐ অট্টহাস্যে সকলেই অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম! পরক্ষণেই মা আপনা হইতে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কোমল মাতৃকণ্ঠে অন্য কথা পাড়িয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া দিলেন।

মহাযুদ্ধের সময় জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একজনকে ডাকাইয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। মিনিট দশ পড়ার পর বহু লোকক্ষয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর হইল। প্রথমে মৃদু গলায় 'হোঃ-হোঃ' শব্দে আরম্ভ করিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-' অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই মিনিট ব্যাপী সেই বিকট অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়ীখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল। গোলাপ-মা কিংবা যোগীন-মা কাছে বসিয়া শুনিতেছিলেন, গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে 'সম্বর সম্বর' বলিয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। [ন]

সম্ভবতঃ ১২৯৫ সালের শেষাশেষি ঠাকুরের গৃহী ভক্ত হরীশ কামারপুকুরে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। জোর করিয়া ত্যাগের পথে থাকিবার চেষ্টা করায় পরিবার তাঁহাকে দৈবক্রিয়া-বলে পাগল করিয়া দিয়াছিল। হরীশের দুরবস্থায় দয়া-পরবশ হইয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন। পাগল বেয়াদবি করিয়া কখন কখন মাকে বলিত, 'তুমি আমার প্রকৃতি', খাওয়ার পর তাঁহার জন্য পাতে প্রসাদও রাখিয়া

---

[1] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: তোমরা কামারপুকুরে মন্দির করবে একচুড়ো—যেমন [জয়রামবাটীর] যাত্রাসিদ্ধির মন্দির। ঠাকুরের মন্দিরে রঘুবীরকে রেখো না, রঘুবীরের ঘরেই রঘুবীর থাকবেন। উনি (শ্বশুর মহাশয়) নিজের মাথায় করে মাটি এনে ঘরের মেঝেতে শীতলার আসনটি করেছিলেন। আমার ঘর যেমন আছে তেমনি থাকবে। [বি]

দিত। তাহার অশিষ্টাচারের কথা মা কলিকাতায় লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, তাঁহার পত্র পাইয়াই নিরঞ্জন মহারাজ ও শরৎ মহারাজ কামারপুকুর অভিমুখে ধাওয়া করিয়াছিলেন। একদিন যেমন মা পাশের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন পাগল অমনি তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন বাড়ীতে অন্য কেহ নাই। কী করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া মা ধানের মরাইয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন: সাতবার ঘুরে আর আমি পাল্লুম না। তখন নিজ মূর্তি মনে এসে পড়ল। আমি নিজ মূর্তি (বগলা-মূর্তি)[১] ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ-হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গেছল। [গ] নিরঞ্জন মহারাজ আসিতেছেন শুনিয়াই মার খাওয়ার ভয়ে হরীশ বৃন্দাবনে পলাইয়া যান। মার হাতের চড় খাইয়াই কি তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন? শেষ বয়সে তাঁহাকে যখন দেখিয়াছি তখন তিনি শিষ্ট শান্ত; আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা আলাপ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার শান্তভাবের পরিচয় স্বতন্ত্ররূপে দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সমগ্র জীবনই ঐ ভাবের সমুজ্জ্বল আলেখ্য। সমীপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও তাঁহার স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রবোধবাবু বলেন: পাগলী-মামী যখন তখন মাকে গালাগালি করিতেন। একদিন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর বিশ্রাম করিয়া প্রায় তিনটার সময় মা বিশ্রাম করিয়া উঠিয়াছেন কিনা দেখিতে গেলাম। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শুনি মা বলিতেছেন,—বাপ রে বাপ, আমাকে খেয়ে ফেল্লে। খেয়ে উঠে এখন পর্যন্ত মুখে একটু পানও দিতে পেলুম নি! বোধ হয় তারকনাথের পুজোয় যে ফুল দিয়েছিলুম তাতে কাঁটা ছিল; সেই কাঁটাই রাধির মা হয়ে এখন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আবার বলে কিনা, আমি ওকে আর ওর রাধিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা কচ্চি। (উচ্চ ও তীব্র স্বরে) আরে, আমি যদি তোদিকে মারব বলে মনে করি তা হলে কোন্ দেবতা রক্ষে কত্তে পারে? (আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হাসিতে হাসিতে) আমি কি তা পারি গা? ঘরেরই বৌ তো।

শ্রীশ্রীমা স্বীয় গুরুশক্তির অভয় অঙ্কে যাঁহাদিগকে স্থান দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দানে কৃতার্থ করেন। ক্বচিৎ কাহারও ভার কেবলমাত্র সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে বা অভয় আশ্বাসবাণী দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায় এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে উপগুরুরূপে শিক্ষা দেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পূর্বেই ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মা তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া উপদেশাদি দিয়াছেন,

---

[১] জয়রামবাটীতে একদিন বিকালবেলা (৩রা মাঘ, ১৩২৬) শ্রীশ্রীমা কেমন এক ভাবে ভাবিত হইয়া দণ্ডায়মানা বরাভয়া মূর্তিতে নরেশ চক্রবর্তীর পূজা গ্রহণ করেন। পূজার জন্য কিরূপ ফুল সংগ্রহ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছিলেন, সাদা ফুল, হলদে ফুল দুইই আনতে বল; সাদা ফুল ঠাকুর ভালবাসেন, হলদে ফুল আমি ভালবাসি। তিনি সাদা ফুল তাঁহার ডান পায়ে ও হলদে ফুল বাঁ পায়ে দিতে বলেন। হলদে ফুলের কথায় মা বগলা-স্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। পীতপুষ্প বগলাপূজার আবশ্যিক উপকরণ।

তাঁহারাও নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন গুরুর নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্ত কেহ কেহ কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্বার দীক্ষা দিবার জন্য মাকে কাতর হইয়া ধরিয়াছেন ; আর তিনিও তাঁহাদের বিশ্বাসভক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহাদেরই পূর্বলব্ধ মন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছেন।

মন্মথ চট্টোপাধ্যায় দীক্ষাপ্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, তোমাকে মেয়ে দিয়েচি, তোমাকে মন্ত্র দিলে কুলগুরু চটে যাবেন ; কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই তো অমঙ্গল হবে বাবা! তুমি আমাকে জ্ঞানগুরু কর। জ্ঞানগুরু করায় যে দোষ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য মা তাঁহাকে অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথা বলেন। কিন্তু মন্মথবাবু তাঁহার কাছেই দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মা বলিয়াছিলেন, রাধুর কোষ্ঠী জ্যোতিষীকে দেখানো হয়েছিল, বৈধব্যযোগ আছে। মন্মথকে মন্ত্র দিলুম—ভগবানের নামে বিধাতার কলম কাটা যায়। [বি][৩]

অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত বলেন: বড়দিনের ছুটিতে বরিশাল হইতে আমি ও পুলিনবিহারী দাশগুপ্ত কলিকাতা যাই। আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, মনের বাসনা আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব না, বরাবর শ্রীশ্রীমার কাছে যাইয়া নিবেদন করিব।

ঠাকুরের যেসব কথা পড়িয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটিমাত্র কথা গিরিশবাবুর বকলমা দেওয়া—আমার মনের মত হইয়াছিল ও প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল মার কাছে আমার কেবল ঐ বস্তুটিই চাহিবার আছে।

গঙ্গাস্নান করিয়া মার বাড়ীতে গেলাম ও কোন কথা না কহিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ও মাকে দর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে উপরে যাইয়া দেখি মা আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ দেখিতে না পাইয়া আমরা কী করিব ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? প্রণাম করে নিন। আমি মার পাদপদ্মের উপর একটি আপেল রাখিয়া প্রণাম করিলাম ও মনে মনে বলিলাম, মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন। মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখি মার সেই আবক্ষ ঘোমটা মাথার উপরে উঠিয়াছে ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন ; তাঁহার মুখে এক অপূর্ব স্নেহমাখা হাসি। সেই সস্মিত মুখেই আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। স্থূলচক্ষে মাকে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা। অনেক দিন পরে মনে হইয়াছিল, মা আমাকে এখনও মনে রাখিয়াছেন কি? আর তারপরেই কলিকাতার এক আত্মীয়ার কাছে শুনিলাম, মা তাঁহাকে বরিশালের অন্নদার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন!

এক মস্তবড় পণ্ডিত শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলে রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে উপরে লইয়া যান। পণ্ডিত প্রণাম করিয়াই মার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ও দুইহাতে পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে ও বলিতে থাকেন, আপনি আমার মাথায় পা দিয়ে বলুন যে আমার চৈতন্য হোক। বোম্বাই চাদরে আপাদমস্তক আবৃতা মা ঘামিয়া উঠিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নাছোড়বান্দা! গোলাপ-মা বকিতে লাগিলেন, তিনি

৩ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'অবতার কপালমোচন'।

কর্ণপাতও করিলেন না। রামবাবু কহিলেন, যখন মাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন তখন আপনার মনোরথ নিশ্চয় পূর্ণ হবে, আপনি মার পা ছেড়ে দিন। দেখচেন না, মার কষ্ট হচ্চে? তখন মাও বলিলেন, আচ্ছা, হবে।

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন ও মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুদের কেহ কেহ তাঁহাকে মার কাছে মন্ত্র লইতে বলিলে তিনি ভাবিতেন, আমার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বলিয়াই তো ইষ্টদর্শন করিতেছি। প্রসন্ন হইয়া অন্তর্যামিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বাবা, এই তোমার শেষজন্ম। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হরিপদ মাঝিকে মা তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলেন। মার আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষমহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়।

যাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদল মার কাছে আগমনের পূর্বেই স্বপ্নে তাঁহার ও ঠাকুরের মধ্যে একতরের কিংবা উভয়েরই দর্শন পাইয়াছেন। দ্বিতীয় দল আর্ত; ইঁহারা রোগে মরণাপন্ন হইয়া, বা অন্যপ্রকার কষ্টকর অবস্থায় পড়িয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। তৃতীয় দল ঠাকুরের ভক্তদের সংস্পর্শে আসিয়া, বা অন্যপ্রকারে মার কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ শুভকর হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ভক্তদের সংখ্যাই অধিক। চতুর্থ দল বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া, কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে মার সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যদের যে চারিটি বিভাগ করা হইল, ঐসকল বিভাগের কোনটিকেই একেবারে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায় না, অনেক শিষ্যেরই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী একাধিক বিভাগে পড়িবে। আর ইঁহারা সকলেই অল্পাধিকতর মুমুক্ষু। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট হইবে এবং অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ও জানিতে পারা যাইবে। অবতীর্ণ জগদ্গুরুশক্তি যখন লোকোদ্ধার-কার্যে প্রবৃত্ত হন তখন মানুষের কল্পনাতীত বিচিত্র উপায়ে দূরদূরান্তরের ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণকাম করেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের সেই নিগূঢ় ইতিহাসের আংশিক উপাদানও এই সকল আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

বরিশালের প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত রাত্রি প্রায় তিনটার সময় স্বপ্ন দেখেন, এক মাতৃমূর্তি দেখা দিয়া বলিতেছেন,—তুই এখনো বসে আছিস? তোর যে বয়েস হয়েচে! এখন শুভ সময়। আমি কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেচি—আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়! ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে মাকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহার ছবি পর্যন্ত তিনি চোখে দেখেন নাই; মার কোন ছবি বাহির না হওয়ায় দেখিবার সম্ভাবনাও ছিল না। অনতিবিলম্বে তিনি জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হইলেন। জয়রামবাটীতে পেঁৗছিয়া মার বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখেন মা স্নানের জন্য বাহির হইতেছেন। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা কিন্তু কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; স্নেহমধুর কণ্ঠে

চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত কহিলেন, বাবা এসেচ? আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলুম। যাও এখুনি স্নান করে এই ঘরে এস, আমিও স্নান করে আসি, পরে ডেকে নেব।

গৌরী-মা রাঁচিতে ভক্তদের কাছে বলিয়াছেন: শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল; এবং 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা, ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী?'—এই বলিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিল। মা তাহাকে শান্ত করিয়া একটি ফুল সংগ্রহ করিতে বলিলেন: সে ফুল আনিয়া তাহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। কুলি-বেশী এই ভক্তটি নিশ্চয়ই স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় মাকে শ্রীসীতারূপে দর্শন করিয়াছিল; নতুবা দীর্ঘকাল তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে কেন? দেখিবামাত্রই বা চিনিতে পারিবে কেন?

তন্ময়ানন্দ লিখিয়াছেন: আমি তখন গৃহস্থাশ্রমে। রাত্রে স্বপ্ন দেখি, ঘরবাড়ী কিছুই নাই, ময়দানে শুইয়া আছি। এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, কই, যাবি তো আয় না! তিনবার ঐ ডাক শুনিয়া আমি 'যাই যাই' বলিতে বলিতে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দরজার নিকট আসিলাম, কিন্তু কপাট খুলিতে পারিলাম না। একজন আমার পেছনদিকে ধরিয়াছিল, ঘুমের ঘোরে তাহারই উপর ঢুলিয়া পড়িলাম। স্ত্রীলোকেরা বলিল, নিশিতে ডাকে, তাই বুঝি হবে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আমার পেটে একটা বেদনা সুরু হইয়া চিকিৎসা সত্ত্বেও বাড়িতে থাকে। একদিন বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিলে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করি। তখন গভীর রাত্রি—অন্ধকার। কলিকাফুলের গাছের তলায় যাইয়া, ঐ ফুলের বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য হাতড়াইতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম কেহ বলিতেছেন মরবি কেন? সাধু হয়ে যা। একবার তোকে ডেকেছিলুম, তখন এলি নি; তাইতো এ রোগ হয়েচে। তুই বাণেশ্বর যা, সেখান থেকে ওষুধ এনে খেলে ভাল হয়ে যা'বি। পরদিনই বাণেশ্বর যাত্রা করিলাম। পথে দুইজন সাধুর সহিত দেখা হইল, তাঁহারা বলিলেন, তুমি নিশ্চয় ভাল হবে। বড়ডোঙ্গলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় আছে, সেখানে আমাদের এক সাধু থাকেন, ভাল হয়ে তাঁর কাছে যাবে। বড়ডোঙ্গলের আশ্রমে ঠাকুরের ছবি দর্শন করিয়া ঐ মূর্তিই আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম।

অতঃপর কলিকাতায় গিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি। দীক্ষার পর আমি ব্রহ্মচর্য নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা বলিয়াছিলেন, এখন কিছুদিন এই ভাবেই থাক, রোজ ধ্যানজপ কোরো। কিছুদিন পরে মা দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাই। প্রণাম করিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিগো ভাল আছ তো? আমি বলিলাম, হাঁ মা; আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি, ডহরকুণ্ডে একটি বিদ্যালয় খুলে ছেলেদের পড়াই। মা বলিলেন, বেশ বেশ, এসব কাজ ঠাকুরের মনে করে করবে নিষ্কামভাবে। নিজের শরীরের উপর একটু নজর রাখবে, তোমার শূলবেদনা আছে কিনা। আমি বলিলাম, মা, আমাকে এবার ব্রহ্মচর্য দিতে হবে। মা বলিলেন, কাল আসবে কাপড়-কৌপীন নিয়ে আর মাথা কামিয়ে, একটা চৈতন রাখবে।

ব্রহ্মচর্য দিয়া মা আমাকে গায়ত্রী শিখাইয়া দিলেন এবং ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে অন্ততঃ দশবার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

একবার আমি ফুল বেলপাতা দিয়া মাকে পূজা করি। প্রণাম করিয়া তাঁহার পা-দুইখানি আমার মাথার উপর রাখিতেই বলিলেন, ওগো মাথার উপর পা রাখতে নাই; ওখানে ঠাকুর আছেন। আমি বলিলাম, মা, ওখানে যে ঠাকুর আছেন তা আমি জানি না। ঠাকুরকে দেখি নাই, আমি আমার ঠাকুরকে সামনেই দেখছি। মা বলিলেন, নাগো, সাক্ষাৎ ভগবান ওখানে সহস্রদল পদ্মে বসে আছেন। আমি বলিলাম, মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান তবে আপনি কে? মা বলিলেন, আমি আর কে, আমিও ভগবতী![৪] আমার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, বলিলাম, তবে আপনি ঠাকুরকে দেখিয়ে দিন। মা বলিলেন, তা কি হয় বাবা, খুব জপধ্যান কর, দেখতে পাবে। তুমি স্বপ্নে যা দেখেচ তা মিছে নয়, সত্যি; দেবস্বপ্ন মিছে হয় না, বিশেষ ভোরবেলার—তারপরে আর ঘুম হয় না। আমি বলিলাম, মা, তা হবে না, আপনি আমাকে ভুলাচ্চেন। মা বলিলেন, দেখ, ঠাকুর নরেনকে স্পর্শ করেছিলেন, তাতে নরেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, ওরকম আধার আর কারো নাই। তখন আমি আর কী বলিব, বলিলাম, মা, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন।

আর একবার যখন জয়রামবাটী যাই, মা কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, এখন বেশ ভালই আছি, বেদনা আর হয় না। মা, এই বেদনা আমার বন্ধুর কাজ করেচে, বেদনা না হলে তো আপনার দর্শন পেতুম না। মা বলিলেন, তুমি আর্ত ভক্ত। কিন্তু তোমার জ্ঞানের ভাবও আছে তুমি ছেলেবেলায় শিবপুজো কত্তে ভালবাসতে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ মা: আপনি কী করে জানলেন? মা বলিলেন, তোমাকে দেখেই জেনেচি।

[৪] সহজ অবস্থায় শ্রীশ্রীমার মুখে স্বীয় স্বরূপ এইরূপে হঠাৎ কখন কখন ব্যক্ত হইয়া পড়িত। প্রবোধবাবু বলেন: জগদম্বা-আশ্রমের বাহিরের দিকে পুরুষদের বসিবার জন্য একখানি ঘর ছিল। কেদারদাদা সেই ঘরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন; অদূরে বটতলায় ষষ্ঠীপূজা দিতে আসিয়া লোকে ঢাক পিটাইতেছে। কেদারদাদা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আঃ, থামনা রে বাপু! অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, 'ও কী কেদার সবই যে আমি! তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন?'

ঋতানন্দ বলেন: পুরাতন বাড়ীতে একদিন শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে ভিখারী হাঁকিল, মা, ভিক্ষে পাই গো! মা আপন মনে 'আর পাচ্চি না, অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ কত্তে পাচ্চি না!'—বলিয়াই থামিয়া গেলেন। অদূরে বসিয়া আমি জলখাবার খাইতেছিলাম, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, দেখ তো! আমার দুহাত, আমার আবার অনন্ত হাত কী বলচি! হাসতে হাসতে মা আবার ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

সিংহবাহিনীর বাড়োতে শ্রীশ্রীমা রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন। আহা, কেমন সুন্দর রামায়ণ শুনেলুম!—বিভূতিবাবু একথা বলিবামাত্র গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'এবার অনেক বড়।'

শ্রীশ্রীমার ভাইঝি নলিনী কাশী যাইবার জন্য উতলা হইয়াছে। সে কেবলই বলিতে লাগিল, পিসীমা, তুমি আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। মা কহিলেন, নলিনী, কাশী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েচিস, কাশী কাশী কচ্চিস, কাশীর অন্নপূর্ণা কি কথা বলচে? নলিনী শান্ত হইল। [ই]

প্রিয়বালা দেবী লিখিয়াছেন: শ্রাবণ মাসের এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি,—প্রকাণ্ড সমুদ্র, জলে জল! জলের উপর এক সুদৃশ্য বজরায় দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময়মূর্তি ঠাকুর ও তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ! আমি ব্যাকুল হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বজরায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু সম্মুখস্থ ময়লার জন্য অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমার কাণ্ড দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তবে হবে, সময় হলে আসবে।

অল্পকাল পরেই বিধবা হইয়া প্রায় প্রত্যহ ঠাকুরকে দেখিতে পাইতাম। ঠাকুরের একখানা ছবি বাবা আমার বিছানার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কোনদিন শোয়ামাত্র, কোনদিন শেষরাত্রে তন্দ্রাঘোরে দেখিতাম, ঠাকুর ছবি হইতে নামিয়া আসিয়া আমার মাথার কাছে দাঁড়াইতেন, তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে দিব্য হাসি। কোনদিন দুই একটি কথা কহিতেন, কোন-দিন একটু হাসিয়া ছবিতে মিলাইয়া যাইতেন। একদিন একটি প্রার্থনা শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, সব সময় এই প্রার্থনাটি কোরো। একদিন জপ করিবার জন্য একটি নামও বলিয়া দিলেন।

একথা জানিতে পারিয়া বাবা আমার দীক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে কাকা আমাকে সঙ্গে করিয়া সুদূর হবিগঞ্জ হইতে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ অধীর হইয়াছিল, কয়েকদিন ঘুমই হয় নাই।

দীক্ষার দিন ঠিক করিয়া কাকা আমাকে নিয়া মায়ের বাড়ীতে গেলেন। আমি উপরে গিয়া ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে দাঁড়াইতেই কোন ভক্ত স্ত্রীলোক বলিলেন, ঠাকুরঘরে মা আছেন, যাও। আহা, কত ভক্তি নিয়ে এরা আসে। আমি যখন মাকে প্রণাম করিতে আগাইয়া গিয়াছি, পাশে দাঁড়াইয়া যোগীন মা আমাকে দেখিয়াই বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মুখে মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া কত আশীর্বাদই করিতে লাগিলেন। মাকে বলিলেন, মা, দেখ দেখ, এ মেয়েটির চোখমুখ দেখ, মেয়েটিকে মা তোমার কাছে রেখে দাও। মা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, রাখলে দেশ হবে, আমি একে জানি। যোগীন-মার সঙ্গে মাও আশীর্বাদ করিতেছিলেন। আনন্দে আমার কান্না আসিল ও সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কতদিন কত ভাবনাই না ভাবিয়াছি ঠাকুর তো আমাদের আপনার, কিন্তু মা কি চিনবেন? হয়তো চিনিবেন না, হয়তো দীক্ষা দিতেই চাহিবেন না। আসিবামাত্র মা কোলে তুলিয়া নিলেন।

দীক্ষার পূর্বে গঙ্গাস্নানের কথায় মা বলিলেন, কিছু করতে হবে না। এস, এই আমি গঙ্গাজলের ছিটা দিচ্ছি। গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া তাঁহার পাশে একখানি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। তখনও আমার শরীর কাঁপিতেছিল, মা তাঁহার বাঁ হাত দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি অংশ জুড়িয়া দিয়া কহিলেন, ঠাকুর এ অংশটুকু আমার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন।

নিরুপমা রায় বলেন: আমার ছোট জা হেমপ্রভা কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন ও আমাকে সেইকথা লিখিয়া পত্র দেন। আমি তখন পিতার কর্মস্থল নবীনগরে ছিলাম। আমার মন্ত্র নেওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং স্বামীকে তাহা লিখিয়া জানাই। স্বামী লোক পাঠাইয়া আমাকে কলিকাতায় আনাইলেন, উভয়ে

একসঙ্গে মাকে দর্শন করিতে গেলাম। দুইতিন বার দর্শনের পর দীক্ষার প্রস্তাব করিতেই মা সম্মত হইলেন। স্বামীর মনে একটা সংশয় ছিল, আমাকে অনুমতি দিয়াও নিজের দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছিলেন। শেষরাত্রে তিনি এক দিব্য দর্শনে উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন,—আমার আর দ্বিধা নাই। ঠাকুর স্বয়ং—সিংহাসনে আসীন, জ্যোতির্ময় মূর্তি, সেই জ্যোতিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে—উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ওর কাছে মন্ত্র নিতে তোর মনে দ্বিধা, যেখানে মন্ত্র নিলে পুনর্জন্ম হবে না? যা যা, কোনো সংশয় রাখিস নি।' দীক্ষার পর মা বলিয়াছিলেন, তোমার তো বাবা, অনেকদিন সময় হয়েচে, এতদিন মন্ত্র নাও নি কেন? তোমার মনে যে বড় দ্বিধা ছিল। তিনি মার পাদপদ্মে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, মা আমি আপনাকে চিনতে পারি নি।

সুরেনবাবু বলেন: শ্রীশ্রীমার নিকটে যাওয়ার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁহার কথা কিছুই জানিতাম না। মাঝে মাঝে স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখিতাম এবং তাঁহার সঙ্গে একটি নারীমূর্তি দেখিয়া ভাবিতাম হয়তো ঠাকুরের ভক্ত কোন স্ত্রীলোক হইবেন। পরে যখন মার কথা শুনিলাম, তিনি কোথায় আছেন জানিয়া লইয়া প্রাণের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া এক পত্র লিখিলাম। লিখিয়াই মনে হইল, মা তো সাক্ষাৎ জগদম্বা, যাহা লিখিলাম তাহা তো তিনি জানিতেই পারিতেছেন। পত্র আর ডাকে না দিয়া বিছানার নীচে ফেলিয়া রাখিলাম। দুইএক দিনের মধ্যেই আমার বন্ধু দুর্গেশ দাস মাকে তিনি জয়রামবাটীতে দর্শন করিয়াছিলেন - স্বপ্ন দেখেন, মা তাঁহাকে বলিতেছেন, দেখ বাবা, আমার একটি ভক্ত শিলং থেকে পত্র লিখেচে, পড়ে দেখ। দেবস্বপ্ন অন্যকে বলিতে নাই মনে করিয়া বন্ধুটি দুইতিন দিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, মা যে চিঠিখানি তাঁহাকে পড়াইয়াছেন উহা খুব সম্ভবতঃ আমার লেখা। বাধ্য হইয়াই তিনি সেকথা আমার কাছে প্রকাশ করিলেন। আমি বিছানার তলা হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া দিলে পড়িয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, এই চিঠিখানিই যে আমি পড়েচি! পরে যখন মাকে দর্শন করিবার জন্য কোঠারে যাই, আমার দর্শনের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ঠিক দেখেচ।

নগেন্দ্র চৌধুরী বলেন: শিলঙে ইন্দুবাবু, শ্রীশবাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীমার কথা আলাপ করিতেন। তাঁহাদের আলাপ শুনিয়া এক এক সময়ে বলিতাম, তোমাদের মা তো আমার কী? পরমহংসদেবের স্ত্রী বলিয়া ভক্তেরা তাঁহাকে বাড়াইতেছেন বলিয়াই মনে হইত। আপিসের কাজে শ্রীহট্টে গিয়াছি; রাত্রে, জাগ্রত কি ঘুমন্ত অবস্থায় ঠিক বলিতে পারি না, এক জীবন্ত দর্শন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি যেন এক পাকাবাড়ীতে একখানি বঁটি দিয়া নিজের গলা কাটিতে যাইতেছি আর এক মাতৃমূর্তি আমার হাতে ধরিয়া ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অল্পদিন পরেই ৺পূজার সময় কলিকাতা যাই। বরাহনগরে খেয়া নৌকায় চাপিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছি, স্বপ্নদৃষ্ট পাকা বাড়ীটি - মাঠের সংলগ্ন উত্তর পাশের বাগানবাড়ী—সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। সেই বাড়ীর মধ্যেই মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবামাত্র মনে হইল, মা আমার অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন, তোমার সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল!

নিশিকান্ত মজুমদার বলেনঃ একরাত্রে স্বপ্ন দেখি, কালীঘাটের মা-কালী আমাকে চারিখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন, আমি যেন ছোট ছেলেটি। ঐ দেবীমূর্তি নারীমূর্তিতে পরিবর্তিত হইয়া বলিলেন, তোমার ভয় কী? আমি তো রয়েচি! তারপরে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, এটি জপ কল্লেই তোমার সব হয়ে যাবে। এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাই। বড়মামার বাড়ীতে মা তখন তরকারি কুটিতেছিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি; মা বঁটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর গেলেন ও আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। আমি আবিষ্টের মত যাইতেই প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁগো, আমায় কী করে চিনলে? উত্তর দিলাম আমি কি চিনতে পেরেচি? যতটুকু চিনিয়েচ ততটুকুই চিনেচি। মা খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন; দিতেই আমি যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম ও প্রণাম করিলাম। দীক্ষাদানের পূর্বে মা আমার সর্বশরীরে ছোট ছোট কাঁসার ঘটি হইতে তীর্থজল লইয়া ছিটাইয়া দিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন এবং আমার বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, এখন ভাব, তোমার জন্ম-জন্মান্তরীণ সব পাপ ভস্ম হয়ে গেল—তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা।

গুরুনাথ নাথ লিখিয়াছেনঃ ১৩১২ সালের বৈশাখ মাস—অর্থার্জনে অক্ষমতার জন্য বাবা ও মার গালাগাল খাইয়া ৺বনদুর্গার বাড়ীতে বসিয়া দিনরাত 'মা, মা' বলিয়া রোদন ও চাকুরি-প্রার্থনা করিতাম। বনদুর্গার বাড়ী বিক্রমপুর কাঁঠালতলীতে; ঘোর জঙ্গল বড় বড় বট ও অশ্বত্থগাছে অন্ধকারময় স্থান। একদিন জোড়হাতে বসিয়া আছি, বেলা প্রায় এগারটার সময় তন্দ্রাবস্থায় দেখিলাম, এক সন্ন্যাসিনী বামহাতে ত্রিশূল, গেরুয়া রঙের সরু লালপেড়ে কাপড় পরা আমার মাথা হইতে পিঠ পর্যন্ত হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, তোর চাকরির যোগাড় হচ্চে, আর কাঁদিস নি। এইরূপে তিনবার গায়ে হাত-বুলানো অনুভব করিলাম ও কথা শুনিলাম। ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে ঢাকায় একটি ছোটখাট কাজ পাই; পরে বদলি হইয়া রাঁচি আসি। ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসে ৺পূজা দেখিতে মঠে যাই ও কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করি। ৺বনদুর্গার বাড়ীতে যে সন্ন্যাসিনী-মূর্তি দেখিয়াছিলাম, মার শ্রীমুখে তাঁহারই মুখচ্ছবি দেখিতে পাইয়া আমি মনে মনে চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম এবং পা-দুইখানি দুইহাতে ধারণ করিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। মা একটু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কথা কহিলেন না।

রাঁচি ফিরিলাম, কিন্তু মন সর্বদাই মাকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কার্তিক মাসে হাওড়ার একখানা ফেরতা টিকেট পাওয়া গেল—নষ্ট হইয়া যাইতেছিল বলিয়া একজন অযাচিতভাবে আনিয়া দিলেন। আমি কতকগুলি জবা ও গোলাপ-ফুলের কুঁড়ি ভিজা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইয়া রওনা হইলাম। কলিকাতায় মার বাড়ীতে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই মা আমাকে ডাকাইয়া নিলেন এবং আমি প্রণাম করিয়া বসিতেই বলিলেন, তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী। ইতঃপূর্বে কখন কখন আমার মনে হইত, আমরা তো বৈষ্ণব—কৃষ্ণমন্ত্রী; যদি মা আমাকে দীক্ষা দেন, কোন্‌ মন্ত্র দিবেন কে জানে!

ইহার দুই বৎসর পরে ঢাকা হইতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়া মাকে দর্শন করিতে যাই। মা তাহাদিগকে পূর্বপরিচিত লোকের মত গ্রহণ করিলেন ও স্ত্রীকে ডাকিয়া নিয়া দীক্ষা দিলেন। চলিয়া আসিবার সময় বলিলেন, সব সময় মনে রেখো, ঠাকুর আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।

মহিমচন্দ্র দত্ত বলেন: মিহির বড়াল শরৎ মহারাজের দূর সম্পর্কে ভাই ছিলেন। তিনি বই দেখিয়া পছন্দ করিয়া একটি মন্ত্র জপ করিতেন। কিছুকাল জপ করার পর স্বপ্ন দেখেন, এক নারীমূর্তি বলিতেছেন, তুমি ও-মন্ত্র জপ কোরো না, এই মন্ত্র জপ করবে। মিহিরবাবু কিন্তু নিজের পছন্দ করা মন্ত্রটিই জপ করিতেন। একবার তিনি খেয়ালবশে 'পরমহংসদেবের স্ত্রী'কে দর্শন করিতে যান ও স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জন্মে। মা তাঁহাকে যে মন্ত্র দিলেন তাহা আগেকার স্বপ্নলব্ধ বস্তু।

প্রাণাত্মানন্দ লিখিয়াছেন: আমি কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করি। সেদিন দোলপূর্ণিমা। আসনে বসিয়া মার সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়: 'তোমার কোন্ মন্ত্র চাই?' 'আমি কিছুই জানি না, আপনি যা আমার উপযুক্ত হয় দিন'। 'তা হয় না; তোমার যা ইচ্ছে বল।' 'আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।' 'আর কারো কাছে দীক্ষা নিয়েচ কি? কুলগুরু? স্বপ্নে?' 'মাসখানেক আগে ভোরবেলায় স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই।' মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ক্ষণেকের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। তারপরে আমাকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, স্বপ্নের মন্ত্রটি এখন বল। আমি বলিলাম, আপনি যা দিলেন, তাই। মা বলিলেন, তবুও বল। আমি মন্ত্র বলিলাম।[৫]

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেন: ১৩২১ সালে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন শ্রীশ্রীমার কাছে আমার দীক্ষা হয়। ললিত (কমলেশ্বরানন্দ) প্রভৃতি কয়েকজন সেদিন দীক্ষা নিতে যাইতেছিল, বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, তুই যা, এদের সঙ্গে বলি হয়ে আসগে যা। দীক্ষা নেওয়ার দুইতিন মাসের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, মা বলিলেন, তোমাকে বিয়ে কত্তে হবে, আর মাদ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণবংশে আর একবার তোমার জন্ম হবে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কোন সাধু বলিলেন, স্বপ্নেও এঁরা যা বলেন তা মিথ্যা নয়। বিষণ্ণচিত্তে মার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, মা, স্বপ্নে আপনারা যা বলেন, তা কি সত্য? মা কহিলেন, হ্যাঁ বাবা। তবে আমাকে এই দুটি কথা বলেচেন,—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন ও বলিলেন, না, তোমার বিয়ে হবে না, আর তোমার জন্মও হবে না—এই তোমার শেষ জন্ম। পরে আর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করি, মা, আপনার কাছে যারা দীক্ষা নেয় তাদের কি শেষ জন্ম? সেই সময়ে সঙ্ঘের মধ্যে কেবল মা ও মহারাজ দীক্ষা দিতেন। মা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা; আমার আর রাখালের কাছ থেকে যারা দীক্ষা নিয়েচে তাদের অনেকেরই শেষ জন্ম। ক্যাবো কারো জন্ম হবে—সেও, ঠাকুরের সঙ্গে তারা আসবে।

---

[৫] শ্রীশ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রও দিয়াছেন এবং উভয় মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছেন।

কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে স্নেহ করিতেন এবং যাহাতে সকলের সঙ্গে মিশিয়া আমার অনিষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। মঠে কাহারও কাহারও সঙ্গে মিশিতে তিনি নিষেধ করিলেও আমি তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া চলিতাম। সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশিয়া, সামান্য কারণে চটিয়া গিয়া কখন কখন হাতাহাতি করিয়াও বসিতাম। একদিন আমরা কয়েকজন মাকে প্রণাম করিয়া যখন নীচে নামিতেছি কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, মা তোমাকে ডাকচেন। আমার আচরণের কথা মাকে বলিয়া দিয়াছেন মনে করিয়া সংকুচিতভাবে উপরে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই 'এই ছেলেটির কথা বলছিলে কেষ্টলাল? এর তো খুব বড় আধার এর শেষ জন্মের আধার' এই বলিয়া মা তাঁহার করস্থিত মালা আমার মাথার উপর জপ করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, রাগ তো চণ্ডাল হ্যাঁ বাবা, অত রাগ করতে আছে?[৬] আমি বলিলাম, মা, আমি যাদের সঙ্গে মিশি তারা তো আপনারই শিষ্য আমার গুরুভাই। মা বলিলেন, হলই বা গুরুভাই, সবার সঙ্গে মেশা কি চলে? সকলের প্রকৃতি এক নয়, তুমি অমুকের সঙ্গে মিশো না। মার কথা আমি রাখিতে পারি নাই, তাহার ফলে অনেক কষ্ট পাইয়াছি।

মা কলিকাতায় আছেন, আমি মহারাজের কাছে বসুভবনে আছি, কিন্তু একদিনও মাকে দর্শন করিতে যাই না এইভাবে দুইতিন বৎসরও মাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে। মার কাছে মন্ত্র পাইলেও জীবনে কোন উন্নতি বোধ করিতে না পারায় অভিমানবশতঃ আমি যাইতাম না। কোন কোন সাধু আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ গোপনীয় কারণ থাকিলে মাকে তাহা জানাইতে পীড়াপীড়ি করেন। তাঁহাদের কথায় আমি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া মাকে মনের কথা জানাই এবং যখন মন্ত্র নিয়াও কিছু করিতে পারিতেছি না তখন মন্ত্রটিও ফেরত নিতে প্রার্থনা করি। মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন: দেখ বাবা, সূর্যকে আকাশে আর জল থাকে নীচেতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু করতে হবে না।

শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলেন: রেঙ্গুনে অবস্থানকালে প্রতিদিন তিনবার, প্রত্যেকবার একঘণ্টা করিয়া, প্রাণায়াম করিতাম। উহার ফলে শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায় এবং কানের কাছে একপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক গোঁ- শব্দ হইতে থাকে। চেষ্টা করিয়াও সেই শব্দ রোধ করিতে পারিতাম না। দীর্ঘ ছুটি নিয়া দেশে আসিতে বাধ্য হইলাম এবং একটু সুস্থ বোধ করিতেই মঠে গেলাম। মঠে বাবুরাম মহারাজের কাছে শ্রীশ্রীমার

---

৬ পড়াশুনা করিবার জন্য ব্রহ্মচারী নেপালেশ্বরকে (নিত্যানন্দ) বাবুরাম মহারাজ কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর কাছে অনেক বন্ধুবান্ধব আসাযাওয়া করিত বলিয়া তথাকার অধ্যক্ষ তাঁহাকে গালিগালাজ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যান ও সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহার মাথায় মন্ত্রজপ করিতেছেন। মা তখন স্থূল শরীরে বিদ্যমানা।

সন্ধান পাইয়া জয়রামবাটী রওনা হইলাম। জয়রামবাটীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র সেই যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল![৭]

মার কাছে যোগসাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেই বলিলেন, তোমার শরীরে কি রেখেচ, আর মনেই বা কী আছে যে যোগ করবে? আমি বলিলাম, তবে কি আমার কোন উপায় নাই? মা বলিলেন, কী বল্তে হবে তা আমি বলে দেব। মা আমাকে দীক্ষা দিয়া দুইবেলা নির্দিষ্ট-সংখ্যক জপ করিতে বলিলেন। আমি ত্রিসন্ধ্যা জপের প্রস্তাব করিলে বলিলেন, তোমাদের চাকরি আছে, সংসার আছে, দুবেলা জপই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। রাস্তায় ঘাটে কী করিব জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, স্মরণ কল্লেই হবে। আমার ধারণা ছিল, দীক্ষা নেওয়ার পর পূজা করিতে হয়। তাই বলিলাম, মা, আমাকে পূজা শিখিয়ে দিন। মা বলিলেন, যাঁর পূজা করবে তাঁর মূর্তির সামনে বা তাঁর উদ্দেশ্যে উপকরণ রেখে প্রণাম করবে; তাতেই পূজা সিদ্ধ হবে। এই সহজ বিধি আমার মনঃপূত হয় নাই; মঠে ফিরিয়া, বাবুরাম মহারাজকে ঠাকুরের পূজার বিধি জিজ্ঞাসা করি। তিনিও বলেন, ঠাকুরের ফটোর সামনে পূজার উপকরণ রেখে প্রণাম করবে।

সেইবারই জয়রামবাটীতে মা আমাকে বলিলেন, রথ সামনে, পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করে যাও। আমি অপটু শরীরে নূতন জায়গায় ভিড়ের মধ্যে যাইতে অমত করায় কহিলেন, রথে জগন্নাথ দেখবে না? আমি বলচি, যাও। মা নিজে ৺পুরীর 'শশী নিকেতনে'র ম্যানেজারের নামে পত্র লিখাইলেন। সেখানে তিল ধারণের স্থান না থাকিলেও ম্যানেজার পত্র পাইয়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্যত্র আমার থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুরীতে বাবুরাম মহারাজের সহিত দেখা হইল; তিনি ৺জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে আদেশ করিলেন। রথের দিন ঘাটে ঘাটে পাহারা অতিক্রম করিয়া বাহিরের লোকের ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না, অথচ বিনা বাধায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া আসিলাম।

সুরেশ ঘোষ লিখিয়াছেন: ১৩২১ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তিনচারি জন ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা রওনা হইলাম। ইচ্ছা—মাসখানেক বেলুড় মঠে থাকিব। প্রেমানন্দ-স্বামিজী ইতঃপূর্বে ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন; তাঁহার ভালবাসায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, মঠে আসিয়া কিছুদিন সাধুসঙ্গ করিতে মনস্থ করি। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন, এই যে সব বালক-ভক্ত পূর্বঙ্গ থেকে মঠে এসে উপস্থিত!

পাঁচসাত দিন হয় মঠে আছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য বসিয়াছি সেই সময়ে তিনি ধীরানন্দ-স্বামিজীকে কহিলেন, কেষ্টলাল, এই অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে এদের মাকে দর্শন করিয়ে দাও। আমরা নিজেদের অত্যন্ত অনুগৃহীত মনে করিলাম। কৃষ্ণলাল মহারাজের সঙ্গে অতি প্রত্যুষে কলিকাতা রওনা

---

৭ সুরমা রায় পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, ডাক্তাররা বলিল, পেটে টিউমার হইয়াছে। তিনচারি বৎসর নিষ্ফল চিকিৎসার পর তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য রওনা হন ও পথিমধ্যে সেই ব্যথা নিঃশেষে সারিয়া যায়।

হইলাম। কালীঘাটে কলুষনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মনে হইল জীবনের সমস্ত পাপ কাটিয়া গেল। শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনাদি করিয়া, কৃষ্ণলাল মহারাজের উপদেশানুসারে নাটমন্দিরে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিলাম। তারপরে বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে আসিয়া দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তে বাড়ীটি পরিপূর্ণ।

জনৈক সাধু আসিয়া বলিলেন, তোমরা এক এক জন করে আসবে। তিনি একজনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, তারপরে আমার ডাক পড়িল। আমি ঘরে ঢুকিতেই শ্রীশ্রীমা বলিলেন, এস, বাবা। আমি শ্রীপাদপদ্মে মাথা রাখিয়া লম্বমান হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে বলিলেন, হয়েচে বাবা। তারপরে একখানা আসন দেখাইয়া বলিলেন, এখানে বস। আমি বসিলাম, পাশেই আর একখানা আসনে নিজে বসিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে, আমি যাহা ভাবি নাই, ভাবিতে পারি নাই, তাঁহার অপার করুণাবারি সিক্ত করিয়া আমাকে দীক্ষা দিলেন। জানি না কোন্ সুকৃতি-বলে তাঁহার এই কৃপা লাভ করিলাম।

বিকালবেলা আবার মাকে দর্শন করিতে গেলাম। শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইবামাত্র স্নেহময়ী আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা হইল: 'মা, দীক্ষা তো নিয়েচি, কিন্তু কর্তব্য কাজ করতে পারব কি?' 'খুব পারবে; কেন পারবে না?' 'এখন পাঠ্যাবস্থায় আছি, মেসে থাকি—ধ্যানজপ করবার নানা প্রতিবন্ধক আছে; সময়মত করতে না পারলে পাপ হবে না?' 'না; পাপ আবার কিসের? স্নান করে ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম করবে আর প্রত্যেক কাজে তাঁকে স্মরণ করবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। আর যখন সময় পাবে, একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।' সন্ধ্যাহ্নিক যাঁরা করেন সবাইকে দেখি, স্নান করে পবিত্রভাবে করেন। আমার দ্বারা তো তা সম্ভব হবে না।' 'খুব ভোরে আর রাত্রে ঘুমবার আগে যা পার তাই কোরো। ধ্যানজপ করা তাঁকে লাভ করবার জন্যে, তাঁর কৃপা পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ।'

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যগণের প্রাগুক্ত শ্রেণীবিভাগ উপরের উদাহরণগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার দীক্ষাদান-কার্য অতি সরল, তাহাতে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। পূর্বাহ্ণে ঠাকুরের নিত্যপূজা সমাপ্ত করিয়া, কদাচিৎ পূজা করিবার পূর্বেও, তিনি দীক্ষার্থীকে আহ্বান করিতেন এবং নিজের পার্শ্বস্থিত বা সম্মুখস্থ আসনে তাহাকে বসিতে দিয়া আচমন করাইয়াই মন্ত্রদান করিতেন। আচমন করাইবার কালে সাধারণতঃ মন্ত্রপাঠ করাইতেন না। আশুতোষ সেনগুপ্তকে আচমন করাইয়া এই বৈদিক মন্ত্রটি পাঠ করাইয়াছিলেন: তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ দুইএক জনের দীক্ষার সময় কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও করিয়াছেন, শুনা যায়। গৌরীকান্ত বিশ্বাসকে দীক্ষাদান-কালে তিনি ঘট-স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রয়োজন হইলে শ্রীশ্রীমা যখন তখন, যেকোন অবস্থায় মন্ত্রদান করিতেন। প্রমীলা বসুকে কোয়ালপাড়ায় সন্ধ্যার পর মন্ত্রদান করেন। জয়রামবাটীতে ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া যখন মা বরদানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন সেই সময় নবাগত একটি

লোক তাঁহার পা-দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরে এবং মুখে কোন কথা না বলিয়া ও জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া কেবলই কাঁদিতে থাকে। মা অন্য সকলকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়াই তাহাকে মন্ত্র দিলেন। জগদ্ধাত্রীপূজার সময় রাঁচি হইতে একটি ছেলে দীক্ষা নিতে আসে। মা পূজার কাজে ব্যস্ত থাকায় ছেলেটিকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই দেওয়া হয় নাই। ভোরবেলায় বিদায়ের সময় ভক্তেরা শয়ন-ঘরেই মাকে প্রণাম করিতে গেলেন, তাঁহার শরীর তেমন ভাল ছিল না। মার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ছেলেটি এমন কাঁদিতে আরম্ভ করিল যে, চোখের জলে তাঁহার পা ভিজিয়া গেল। তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মা বলিলেন, কাঁদচ কেন বাবা? কী চাও, মন্ত্র নেবে? (অন্যান্যের প্রতি) তোমরা একটু বাইরে যাও, আমি একে মন্ত্র দেব। দরজা বন্ধ করিয়া সেই অবস্থায়ই মা তাহাকে দীক্ষা দিলেন। [ত]

সুরেন্দ্র রায় বলেন: মেসে অবস্থান-কালে ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, একটি রক্তবর্ণ জ্যোতির রেখা শ্রীশ্রীমার বাড়ী হইতে কালীঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। বাগবাজারে যাইয়া শুনি, মা সেখানে নাই, কালীঘাট গিয়াছেন। সেইদিন বিকালবেলা মাকে প্রণাম করিতে আবার বাগবাজারে গেলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকালে এসেছিলে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। অন্য একদিন যাইয়া আমার স্বপ্নের কথা উত্থাপন করিতেই মা বলিলেন, ছেলে-মানুষ, ওসব খবরে কাজ কী? স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির রেখা সত্য কিনা জানিবার জন্য জেদ করায় বলিলেন, না হয় সত্যিই দেখেচ, তাতে কী হবে? এই সময় আমার কেমন ভাবান্তর হইল; বলিলাম, মা, তুমি লোকজনকে কী দীক্ষা দাও? কী দীক্ষা দাও, আমাকে বল তো। 'এই দীক্ষা দিই', বলিয়াই আমার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

জয়রামবাটী হইতে শেষবার কলিকাতায় আসিবার পথে বিষ্ণুপুরে এক কলু শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে। মা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া যামিনী দেবীকে বলেন, দেখ মা, একজন কলু এসেছিল দীক্ষা নিতে। কলুকে তো কখনো দীক্ষা দিই নি। যামিনী বলিলেন, আপনি তো জগতের মা, আমি কী করে জানি মা, আমি কী করে বলব মা, আপনি কী করবেন? মা বিকালবেলা সেই কলুকে ডাকাইয়া আনিয়া দীক্ষা দিলেন।

শ্রীশ্রীমা যখন কাহাকেও শ্রীপদে আশ্রয় দিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, কার্যকালে যেকোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না। বসন্তকুমার চৌধুরী বলেন: ছেলেবেলা হইতে বৈষ্ণবভাবের উপর ঝোঁক থাকায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করি। আমার দুই ভগিনী মার মন্ত্রশিষ্যা হওয়ায় তাঁহার কথাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বা শক্তি সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। একবার বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসি ও গঙ্গাস্নান করিয়া মাকে প্রণাম করিতে যাই। মা পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, আমি বারান্দায় থাকিয়া প্রণাম করিতেই আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম কর। আমি আদেশ পালন করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা অননুভূতপূর্ব আনন্দের ভাব আসিয়া চিত্ত অধিকার করিল। আমি করজোড়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলে মা কহিলেন, গোবিন্দ কৃপা

করবেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর স্ত্রীবিয়োগ হইল, এবং পুনরায় বিবাহ করিবার স্বল্পকাল পরেই দ্বিতীয় স্ত্রী ভূতাবিষ্ট হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহাকে সুস্থ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে একদিন দেহপ্রবিষ্ট ভূত তাহাকে লইয়া মার কাছে যাইতে আদেশ করিল।

এই ঘটনার পূর্ব হইতেই মনে হইতেছিল, যে-পথ নিজে বাছিয়া লইয়া সস্ত্রীক শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা ঠিক হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। আশা-নিরাশার দোলায় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। পরিবার মার কাছে দীক্ষার কথা তুলিতেই গোলাপ মা তর্জন করিয়া কহিলেন, মন্ত্র ভুলে গেছ নাকি? না গুরুত্যাগ করে এসেচ? মা কিন্তু শান্তভাবে দীক্ষায় দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও আমাদের দুইজনকেই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বদিন রাত্রেই স্ত্রীর ভীষণ জ্বর হইল; ভূতাবিষ্ট হওয়ার পর হইতেই মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। তথাপি মার আদেশানুসারে উভয়ে স্নান করিয়া আসিলাম। আমার দীক্ষার পর যখন স্ত্রীর পালা আসিল, গোলাপ-মা চীৎকার করিয়া, 'একে গুরুত্যাগ করে এসেচে, তাতে আবার জ্বর, কিছুতেই এর দীক্ষা হবে না' এই কথা বলিয়া উপস্থিত সুধীরা দেবীকে 'জ্বরের কাঠি' লাগাইয়া দেখিতে আদেশ করিলেন। সুধীরা কাঠিটি বগলে দিয়াই তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ও কিছু নয়, স্নান করে শরীরটা একটু গরম হয়েচে মাত্র। তথাপি গোলাপ মা বাধা দিতে থাকায় মা জোরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, সুধীরা, নিয়ে এস। কাহারও আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সাহস হইল না: নির্বিঘ্নে স্ত্রীর দীক্ষা হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র নিতে আসিয়া কেহ যে ফিরিয়া যায় নাই এমন নহে। তবে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। অনেক স্থলেই মা তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্মণ বলেন: পিংনার গঙ্গাধর সাহা (বড়) নামে একটি ছেলে আমার কাছে আসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিত। কিছুদিন পরে গঙ্গাধর সাহা (ছোট) নামে তাহার এক বন্ধুও আসিতে থাকে। একবার আমার গর্ভধারিণী ও পরিবারকে মার কাছে লইয়া যাই, আমার টেলিগ্রাম পাইয়া ঐ দুই বন্ধু কলিকাতায় যায়; আমিই তাহাদের দীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেই। প্রথমে বড় গঙ্গাধরের দীক্ষা হইয়া গেলে মা ছোটটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সে ইত্যবসরে সরিয়া পড়িয়াছে। মা আসনে বসিয়াই ছিলেন, সে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, হতভাগার কপালে নাই! পলাইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছেলেটি পরে বলে যে, তাহার মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল।

শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে শ্রীশ্রীমা দীক্ষাদানে প্রথমতঃ অসম্মত হইলেও, যাহারা তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছে, অথবা মুখে কিছু না বলিলেও অন্তরের অন্তস্তলে বা অশ্রুজলে আকুলতা নিবেদন করিয়াছে তাহারা কোনকালে তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। প্রকৃত ব্যাকুল ব্যক্তির প্রতি মা বিমুখ হইয়াছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা জানি না। প্রাণের আবেগ বর্ধিত করিয়া ভক্তকে অধিকতর কৃতার্থ করিবার জন্য, কোন বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য, কিংবা ভক্তের অনুরাগ-মাধুর্য বাহিরে

প্রকটিত করিয়া স্বয়ং উহা আস্বাদন করিবার জন্য মা যে কাহাকেও কাহাকেও প্রথম প্রস্তাবে দীক্ষাদানে অসম্মত হইতেন, কোন কোন ঘটনায় ইহার আভাস পাওয়া যায়।

নরেশ চক্রবর্তী বলেন: কৃষ্ণলাল মহারাজের আদেশে দুই বন্ধুকে নিয়া ১৩২৬ সালের পৌষসংক্রান্তির দিন জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। জনৈক সাধু ইহাদের অভিপ্রায় শ্রীশ্রীমাকে জানাইলে তিনি শরীর অসুস্থ বলিয়া দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। ইহারা কাঁদিতে লাগিল: তখন আমি নিজে একবার বলিয়া দেখিব মনে করিয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম। মার সঙ্গে আমার এইরূপ কথাবার্তা হইল: 'বাবা, কিছু বলবে?' 'হ্যাঁ মা; এরা দীক্ষা নিতে এসেচে, তুমি দেবে না বলাতে বাইরের ঘরে বসে ভয়ানক কাঁদচে।' '(স্নেহমাখা স্বরে) দেখ, আমার শরীরটা এখন ভাল নয়; এখন তো দীক্ষা হবে না।' 'কিন্তু মা, বড় কাঁদচে যে ওরা? তুমি না দিলে দেবে কে?' '(একটু থামিয়া) তুমিও বলচ?' 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলচি।' 'কিন্তু এদের দেহ যে অশুদ্ধ। এদের এখানে তিন রাত্রি বাস কত্তে বল। এখানে তিন রাত্রি বাস কল্লে দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, এটা শিবের পুরী কিনা।'

বসন্ত সরকার লিখিয়াছেন: শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আমার দীক্ষা হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার আদেশে নীচে নামিয়া গেলাম। তারপর আমার স্ত্রী দীক্ষা প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, বেলুড় মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে, তাদের কাছে মন্ত্র নাওগে। সে বলিল, মা, আমি বাড়ী থেকে, তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাব এই আশা নিয়ে, ধারকর্জ করেও অতি কষ্টে এখানে এসেচি; এখন তুমি আশ্রয় না দিলে আমি কোন্ মুখে, প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে যাব? আমি আর কারো কাছে দীক্ষা নেব না। তাহার দৃঢ়তায় মা যেন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আর বাঙ্গাল নয়, আর বাঙ্গাল নয়, বাঙ্গালরা বড়ই নাছোড়বান্দা! ঠাকুর আগে চলে গিয়ে সব আমার উপর ফেলে গেছেন! মার কথায় ও ভাবে তাহার মনে দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, প্রাণের আবেগে ভূমিতে পড়িয়া গান ধরিল, 'যে হয় পাষাণের মেয়ে তাঁর হৃদে কি দয়া থাকে, দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে?'[৮] মা ঠাকুরপুজো করিবার জন্য আসনে বসিয়াছিলেন মাত্র, আর করা হইল না; ভাবে বিভোর হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন এবং শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, আর একটি গান গা মা, আর একটি গা—তোর গান বড়ই মিষ্টি। তুই আমার পাগলী মেয়ে, তোর অনেক ভাল চিহ্ন আছে। কয়েকটি গান শুনিবার পর মা বলিলেন, উঠে বস্ মা; তোর গানে যে আমি পুজো কত্তে পারি নি। আদেশ কর্ মা, আমি পুজো কত্তে বসি, তুই একটু বিশ্রাম কর্। পুজান্তে সে পুনরায় ধরিয়া বসিলে মা দীক্ষার দিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন এবং প্রসাদী পান আনিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিলেন, তোর মুখ শুকিয়ে গেছে, পান ভালবাসিস যে, এই প্রসাদী পান খা।

যেসকল ভক্ত দূরদেশ হইতে জয়রামবাটীতে আসিতেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের কথা অন্তরে জানিয়া অনেক সময়ে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই বলিয়া রাখিতেন।

---

[৮] গানের অবশিষ্টাংশ: দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে, গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে। মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও তা মা শুন না কি, নরা এমনি লাথিখেকো তবু দুর্গা বলে ডাকে। [নরা=নরচন্দ্র রায়]

মাখনলাল দত্ত যেদিন জয়রামবাটীতে আসেন মা সেইদিন সকালবেলা কেদারের মাকে বলিয়াছিলেন, আজ একটি ছেলে কষ্ট করে মন্ত্র নিতে আসচে। মহেন্দ্র গুপ্ত সন্ধ্যার সময় জয়রামবাটিতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন, আজ একটি ঠাকুরের ভক্ত আসতে পারে, তোমরা কিছু বেশী রুটি করে রাখবে।

কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, ভক্তসন্তানকে দেখিবার পূর্বেই বা একবারমাত্র দেখিয়াই, শ্রীশ্রীমা তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে তাহার চরিত্র সংশোধন করিতেও চাহিয়াছেন। পূর্বোক্ত মহেন্দ্রবাবু বলেন: অরূপানন্দের মুখে আমার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা জানিয়া আমাকে না দেখিয়াই মা বলিয়াছিলেন, মন্ত্র নেবার ইচ্ছে তো ভালই, কিন্তু এই ইচ্ছেটা কি ধর্মলাভের জন্যে, না কুলগুরুর পাওনা নষ্ট করবার জন্যে? না কল্লে দিতে পারি। আমার দীক্ষার একমাস পরে স্ত্রী ধরিয়া বসিল, সেও মন্ত্র লইবে, মার কাছে তাহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনমাসের সন্তান কোলে, কোনরকমে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম। সে দীক্ষার জন্য আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিবার পূর্বেই মা বলিলেন, চারদিন পরে হবে। বাসায় গিয়া দেখা গেল, তাহার চারিদিনের ভিতর দীক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

যদুনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন: দীক্ষা লইবার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া জ্ঞানেন্দ্র বসু কলিকাতায় আমার অতিথি হন। আমরা দুইজন শ্রীশ্রীমার কাছে যাইব শুনিয়া শীতল মিত্র মাকে দর্শন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। শীতল কলেজের ছাত্র, তাহার বয়স তখন ১৭/১৮ বৎসর হইবে। বৈকালে মায়ের বাড়ীতে একত্র মিলিত হইয়া তিনজন মাকে প্রণাম করিতে উপরে গেলাম। মার দর্শন যখনই পাইতাম তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জানিয়া দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী বলিতে বলিতে হাত জোড় করিয়া চোখ ভরিয়া দেখিতাম। প্রণাম করিয়া আজও ঐভাবে দর্শন করিতেছি এমন সময় জ্ঞানবাবু কহিলেন, দাদা, আমার দীক্ষার কথা মাকে বল। আমি বলিলাম, তুমি বল। মা সবই শুনিতেছেন। জ্ঞানবাবু সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, মা, আপনি দয়া করে আমাকে দীক্ষা দিন। আর আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এক নজরে তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া মা কহিলেন, আচ্ছা, নীচে যেয়ে বস, দিন ঠিক করে পাঠাচ্চি। এমন সময় শীতলও দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলে মা তাহাকে শুধু নীচে যাইতে বলিলেন, দীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। আমরা আপিসে বসিয়া আছি, রাসবিহারী মহারাজ আসিয়া জ্ঞানবাবুকে বলিলেন, মা তোমাকে মঙ্গলবার সকালে গঙ্গাস্নান করে আসতে বলেচেন। খানিক পরে তিনি আবার আসিয়া বলিয়া গেলেন—যদু, মা বল্লেন, আজকাল এমন অনেক ছেলে এসে দীক্ষা নিয়ে যায় যাদের গভর্ণমেন্ট পরে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে, আর তাদের মা-বাপ দুঃখ জানিয়ে পত্র দেয়। শুনিয়া চমকিত হইলাম; শীতল যে দেশের কাজের জন্য ডাকাতিও করে তাহা জানিতাম। রাসবিহারী মহারাজ পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদু, কী জানিস বল। আমি আর কী বলিব, কতকটা চাপিয়া গিয়া বলিলাম, এর শিক্ষক ত্রিবেণীবাবুকে গভর্ণমেন্ট অন্তরীণ করেচে; শীতল তেমন গুরুতর কিছু করে থাকলে তাকেও নিয়ে যেত। 'তুই দায়িত্ব নিলে মা দীক্ষা দেবেন!' তাঁহার এই কথা শুনিয়া, শীতলকে প্রশ্ন করিয়া আমি

তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য জামিন হইলাম।[৯] নির্ধারিত দিনে দুইজনেরই দীক্ষা হইয়া গেল।

সকলের অন্তর্দর্শিনী শ্রীশ্রীমা নানাভাবে ভক্তের মৌন জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিতেন। মহেন্দ্রবাবু আরও বলেন: স্ত্রীর দীক্ষার দিন আমি নীচে বসিয়া ভাবিতেছি, যে প্রসাদ পাইলাম তাহা মায়েরই প্রসাদ কিংবা সাধুরাই খাইয়া দিয়া গেল বুঝিলাম না। একটু পরেই মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি একটি সন্দেশ যেন আমাকে দেখাইয়াই খাইতেছেন! আমি প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, খাও।

প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন: একদিন বিকালে কিছু মিষ্টি ও মাটির ভাঁড়ে কিছু গব্যঘৃত লইয়া মার বাড়ীতে গেলাম। একজন ব্রহ্মচারীর হাতে জিনিসগুলি দিতেই উপরে লইয়া গেলেন কিন্তু জিনিসগুলি মার কাছে দেওয়া হইল কিনা সে বিষয়ে মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সেদিন বহু-লোকের সঙ্গে প্রণাম করিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে আবার মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি; প্রণাম করিয়া উঠিতেই দেখি তাঁহার খাটের নীচে সেই ঘৃতভাণ্ডটি রক্ষিত! মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ঘি তুমিই এনেছিলে?

সুরেনবাবু বলেন: একদিন মা আসনে বসিয়া আছেন আর আমি তাঁহার সম্মুখস্থ অপর একটি আসনে বসিয়া কহিতেছি, হঠাৎ মনে হইল, পুঁথিতে আছে যে মার পদতল রাঙা, কিন্তু একদিনও তো তাঁহার পদতল দেখিতে পাইলাম না। যেমন মনে হওয়া অমনি মা তাঁহার পা দুইখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন, যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত হইলাম।

জনৈক দশনামী সন্ন্যাসী, চট্টগ্রামের লোক, একসময়ে আপন মনে ভাবিতেন: ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তি মানবজীবনের কাম্য শাস্ত্রে বলে। আমার চারিবর্গই লাভ হইয়া গিয়াছে, না কোনটি এখনও বাকি আছে? কে বলিয়া দিবে: এইরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় তিনি পরমহংসদেবের স্ত্রীকে দর্শন করিতে কলিকাতায় আসিলেন। পরমহংসদেবের ভক্তেরা তাঁহাকে জগদম্বা বলেন, একথা সত্য হইলে জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর অবশ্যই পাইবেন তিনি মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার শরীর তখন অসুস্থ ছিল। সাধুটি ব্যাকুলভাবে জানাইলেন, তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জীবনে আর কখনও আসা হয়তো সম্ভব হইবে না, একটিবার দর্শনের সুযোগ পাইলেই কৃতার্থ হইবেন, কথাটি কহিবেন না। সাধুকে উপরে লইয়া যাওয়া হইলে মা বলিলেন, এস বাবা ভিতরে এস। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া নীচে চলিয়া গেলে মা সেবককে কহিলেন, ছেলেটিকে তিনটি ফল দিয়ে এস। তিনটি আম্রফল হাতে করিয়া সাধু ভাবিতে লাগিলেন, এ কী ব্যাপার! আমার কি তাহা হইলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া গিয়াছে? কোন্‌টিই বা কি? বাকিটিও এই জন্মেই পাইব কি? এমন

[৯] যদুবাবু শতাধিকবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গগুণে বহু ছেলে মার কাছে আসিয়া মন্ত্রগ্রহণ করে।

সময় মার আদেশে সেবক তাঁহাকে আর একটি ফল আনিয়া দিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মোক্ষফলটিই তাঁহার লাভ হয় নাই; সেইটিও পাইবেন, কিন্তু বিলম্বে।[১০]

কোন ব্যাপারে শ্রীশ্রীমার মুখ হইতে যদি কোন কথা বাহির হইয়া পড়িত তাহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও কার্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। মহাদেবানন্দ বলেন: কোয়ালপাড়া হইতে তরকারির ঝুড়ি মাথায় লইয়া জয়রামবাটী গিয়াছি। জলখাবার খাইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই মা বলিলেন, এখন যেয়ো না, খেয়েদেয়ে বিকেলে যাবে। আমি থাকিতে সম্মত না হওয়ায় যেন ভয় দেখাইয়া বলিলেন, যেয়ো না, এখুনি বৃষ্টি আসবে। মা ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন আমাকে দেখাইবেন যে আকাশে মেঘ করিয়াছে। কিন্তু আকাশে তখন মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। আমি প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম। আমোদর পার হইয়া মাঠের খানিকটা আসিয়াছি আর মুষলধারে বৃষ্টি। দৌড়াইতে দৌড়াইতে দেশড়ায় এক ডোমের কুটিরে আশ্রয় লইলাম; কাপড়চোপড় একেবারে ভিজিয়া গেল।

শ্রীশ ঘটক বলেন: রাঁচি হইতে নিশিকান্ত মজুমদার আমাদের সঙ্গে জয়রামবাটী গিয়াছিল। সে আপিসে ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বিভাগীয় কর্তা নারাজ থাকায় ছুটি পায় নাই। এই কথা শ্রীশ্রীমার কানে পৌঁছিলে তিনি নিশিকে তখনই ফিরিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু নিশি ধরিয়া বসিল, আমাদের সঙ্গে ফিরিবে। অগত্যা মা অভয় দিয়া কহিলেন, তাই হোক। রাঁচিতে ফিরিয়া আসার পর বিভাগীয় কর্তা নিশির বিরুদ্ধে বড় সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিল। কিন্তু সাহেব কোন মন্তব্য না করিয়াই কাগজখানা ফেরত দিলেন। এইভাবে বারকয় ফেরাফেরির পর চতুর্থবারে সাহেব লিখিলেন, বিনা বেতনে অনুপস্থিত সময়ের ছুটি মঞ্জুর হইল। এ হুকুম-লিখিত কাগজখানাও হারাইয়া গেল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি, ইহার মধ্যে নিশির কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র নাই।

এই মহাশক্তিরূপা মায়ের নিকটে কথায় বা আচরণের কোনরূপ লঘুতা প্রকাশ করা চলিত না। চন্দ্রমোহন দত্ত লিখিয়াছেন: বৈশাখের শেষাশেষি একদিন বেলা প্রায় দশটার সময় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছি, খুব গরম পড়িয়াছে। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন, শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, চন্দ্র, তুমি মার কাছে সর্বদা যাও আর প্রসাদ খাও; আমি একটি কথা বলি, এই কথাটি মাকে বলতে পার? তুমি মাকে গিয়ে বল,—মা, আমি মুক্তি চাই। আমি বলিলাম, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি এখনই বলে আসছি। উপরে গিয়া দেখি, মা ঠাকুর-পূজায় বসিয়াছেন। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটু পরেই মা আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার এইরকম চাহনি আমি আর কখনও দেখি নাই, আমার বুক দুড়দুড় করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্র, কী চাও? আমার গলা কে যেন চাপিয়া ধরিল, মুক্তির কথা বলিতে পারিলাম না। মা আবার বলিলেন, চন্দ্র, কী চাও? আমি বলিলাম, প্রসাদ চাই। মা হাত দিয়া তক্তাপোশের নীচে প্রসাদ দেখাইয়া দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হইল না।

---

১০ জপানন্দস্বামীর কাছে ঘটনাটি বলিয়া সাধুটি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে মানা করেন, তাঁহার শিষ্যেরা পাছে জানিতে পারে এই ভয়ে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গুরুরূপ

(পূর্বানুবৃত্তি)

কাহাকেও মন্ত্রদান করিবার পূর্বে শ্রীশ্রীমা তাহার ব্যক্তিগত ও কুলপরম্পরাগত সংস্কার—শ্রীভগবানের কোন্ রূপের সে উপাসক—দেখিয়া লইতেন। ব্যক্তিগত সংস্কার প্রায়শঃ কুলপরম্পরাগত সংস্কারের অনুরূপ হয়; কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় শক্তিমন্ত্র প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, তোমার ভিতরে তো বাবা, রামকে দেখছি। তোমার বংশে কি সকলে রামমন্ত্রের উপাসক? রাম আর শক্তি তো ভিন্ন নয়; তবে আর রামমন্ত্র নিতে আপত্তি কী? সত্য সত্যই উহারা বংশানুক্রমে রামমন্ত্রের উপাসক। [ত]

সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে মা জিজ্ঞাসা করিতেন, ব্রাহ্মণ-সন্তান বোধ হচ্ছে, তোমার কোন্ মূর্তি ভাল লাগে? তিনি বলিলেন, শিবের কোলে কালী বসে আছেন এইটি আমার খুব ভাল লাগে। 'শক্তি কি কখন শিব ছাড়া থাকেন? তোমার শক্তিমন্ত্র'-এই বলিয়া মা মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র ভিতর দিয়া যেন তড়িৎপ্রবাহ চলিয়া গেল এরূপ তাঁহার বোধ হইল, সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা আনন্দ ও নেশার ঘোর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

সারদাকিংকর রায়ের পূর্বপুরুষ শাক্ত। বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিয়া তিনি বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে যখন মার কাছে মন্ত্র নিতে গেলেন, মা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিলেন। ইহাতে মনে খট্‌কা লাগিলেও তিনি মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। বিকালে আবার মার কাছে যাইতেই মা বলিলেন, আমি তোমাকে ঠিকই দিয়েচি।

কাহারও কাহারও ইষ্ট নিরূপণ করিতে যে শ্রীশ্রীমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যাহাদের জন্মান্তরীণ সংস্কার তেমন প্রবল নাই, বা কর্ম-দোষে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে তাহাদের বেলায়ই ঐরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। অল্পকাল আত্মস্থ থাকিয়াই মা তাহাদের ইষ্টরূপ দেখিয়া লইতেন।

ইষ্টমন্ত্ররূপে শ্রীশ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও ঠাকুরের নামের মন্ত্র দিয়াছেন; কাহাকেও বা ঐ মন্ত্র দিয়া ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে জপ করিতে বলিয়াছেন। তারকনাথ রায়চৌধুরীকে লিখিয়াছিলেন: 'ঠাকুরের নাম ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে।...আর এক কথা, মন্ত্র দিতে হইলে নিজের ইষ্টমন্ত্র কদাচ কাহাকেও দিবে না।'[১]

---

[১] স্বামী জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, মাদ্রাজের একটি বিধবা মেয়ে শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র পাইয়াই বলেন, এখন থেকে আমি মন্ত্র দেব; আমাদের সব শিষ্যরা আসে, কী দিতে হয় এতদিন জানতাম না। তাহাতে মা বলেন, না না, নিজেরটি দিয়ো না; আমি তোমাকে আর একটি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেটি দেবে। বিশ্বেশ্বরানন্দকে বহুমন্ত্র বলিয়া দিয়া মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি মন্ত্র দেবে? আর তিনি সবিনয়ে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বলিয়াছিলেন, দিলেই বা, দোষ কী?

শ্রীশ্রীমা যেমন ঠাকুরের নাম সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে বলিয়াছেন, তেমনি তাহাতে সকল দেবদেবীরই পূজার বিধান দিয়াছেন ; আবার ঠাকুরের উপর যে কোন ভাবারোপেও তাঁহার সম্মতি ছিল। ঠাকুরকে পতি জ্ঞান করিয়া কমলেশ্বরানন্দ মধুর-ভাবে ভজনা করিতেন ; সেই কথা মাকে নিবেদন করিলে মা উত্তর দেন, বেশ তো বাবা, তাতে কিছু দোষ নাই ; ঠাকুরের সব ভাবই ছিল।[২]

আহারের সময় অন্ন নিবেদন করিবার মন্ত্র জানিতে চাহিলে তন্ময়ানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দিয়েচি ঐ মন্ত্র। ঐ মন্ত্রে সকল দেবদেবীর পূজোও হবে। তন্ময়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, মন্ত্র না নিলে কী পুজো করা চলে না ? মা উত্তর দেন, মন্ত্র না নিলে কী পুজো করবে ? সে তো ছেলেখেলা !

মন্ত্রদানের পর শ্রীশ্রীমা অনেককেই ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই তোমার গুরু। সাধনানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, মা, আপনি তো বল্লেন, ঠাকুরই গুরু ; তবে আপনি কী ? মা উত্তর দিলেন, বাবা, আমি কিছুই না ; ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। তাঁহার ঐরূপ কথায় সকল ভক্তই সন্তুষ্ট হইতেন না। এক শিষ্যকে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি দেখাইয়া যেমন বলিলেন, 'এই তোমার গুরু', শিষ্য বললেন, 'হ্যাঁ মা, উনি তো জগদ্-গুরু।' আবার দক্ষিণেশ্বরের ৺ভবতারিণী-মূর্তি দেখাইয়া যেমন বলিলেন, 'এই তোমার ইষ্ট', অমনি শিষ্যটি বলিলেন, 'মা, সাক্ষাতে থাকতে অসাক্ষাতে যাব কেন ?' তাঁহার আন্তরিকতায় প্রসন্ন হইয়া স্মিতহাস্যে মা বলিলেন, আচ্ছা বাবা, তাই হবে। 'তাই' শব্দটি মা জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। [উ]

কোন ভক্তের তথাকথিত নিষ্ঠা ঠাকুরকে বাদ দিয়া কথায় কথায় মার নাম করা - উৎকট আকার ধারণ করিতেছে দেখিলে শ্রীশ্রীমা অপূর্বভাবে শিক্ষা দিয়া তাহা বিদূরিত করিতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে নিজের অভিন্নত্ব তাহার হৃদয়ে গাঢ়মুদ্রিত করিয়া দিতেন। প্রাণাত্মানন্দ লিখিয়াছেন ঃ কোয়ালপাড়ায় আমি দীক্ষান্তে প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা বলিলেন, আজ খুব ভাল দিন—দোলপূর্ণিমা, গৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মদিন ; এই আবীর লও, ঠাকুরকে দাও। আমি আদেশ পালন করিলাম। কলিকাতায় মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি ; জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ ? আমি বলিলাম, আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি। মা বলিলেন, তোমাদের ঐ বড় একটা দোষ। সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন ? ঠাকুরের নাম বলতে পার না ? যা কিছু দেখচ সবই ঠাকুরের। আর একদিন মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, বলিলেন, এত দেরী করে এলে কেন ? আমি এখন কাপড় কাচতে যাচ্চি। আমি বলিলাম, অনেকক্ষণ এসেচি, কিন্তু বড়ই কড়া হুকুম। মা, ইচ্ছে করে, প্রত্যহ একবার আপনাকে দর্শন ও প্রণাম করি, কিন্তু এখানকার কড়া হুকুমের জন্যে ভয় করে। মা আমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, বাবা, ঠাকুরের ইচ্ছেই বলবতী। তোমার যেটুকু দরকার তিনি তাই দিচ্চেন ; এর জন্যে মনে দুঃখ না করে আনন্দ কোরো। দোল-পূর্ণিমার দিন মার পাদপদ্মে আবীর দেওয়ার সাধ করিয়া গেলাম, কিন্তু কিছুতেই দর্শনের অনুমতি পাইলাম না। গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিলেন, - মাকে দর্শন করব না বলে, ঠাকুরকে দর্শন করব বলুন ; তা হলে মার দর্শনও হবে। সত্যই ঐরূপ হইল। আমি মাকে প্রণাম

২ কমলেশ্বরানন্দ ইহা ত্র্যম্বকানন্দকে বলিয়াছিলেন।

করিয়া আবীর পায়ে দিব কিনা চিন্তা করিতেছি, মা বলিলেন, আবীর এনে থাকলে আগে ঠাকুরকে দাও, তারপর আমাকে দাও। তাঁহার আদেশ পালন করিয়া বলিলাম, মা, খুব আশা করে এসেছিলুম আপনার পায়ে আবীর দেব বলে, কিন্তু দর্শনের অনুমতি না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করে এলে? তারপরে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমাকে বলেচি যে, যা কিছু সবই ঠাকুরের। তা ভুল কর বলেই তো বাধা পাও। আমি বলিলাম, আজ আপনার পায়ে আবীর দিতে না পারলে মনে খুব কষ্ট হত। মা বলিলেন, এভাবে কখনো মনে কষ্ট করবে না; ঠিক জানবে, মনের সঙ্গে সবই ঠাকুর গ্রহণ করেন। 'ঠাকুর তো করেন, কিন্তু –।' আমার কথা শেষ না হইতেই মা বলিলেন, আবার ভেদ ভাব কেন?

নলিনবাবু কথায় কথায় শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, আমরা তো ঠাকুরকে দেখি নি, আমরা আপনাকেই জানি। মা বলিলেনঃ না বাবা, ঠাকুরকেও ডাকবে; আর যা কিছু খাবে, তাঁকে নিবেদন করে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে। নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্মণকে মা বলিয়াছিলেনঃ যে ঠাকুর, সেই মা— এই জেনে জপধ্যান কোরো!

ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এমন কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা তাঁহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলেও শ্রীশ্রীমাকে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিতেন, আর তাহা করিতেন বলিয়াই ঠাকুর হইতে তাঁহাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন নলিনবাবু ও শ্যামবাজারের অদ্বৈত দাস কলিকাতায় মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। মা, ঠাকুরের প্রসাদ ঠোঙায় রাখিয়া, নিজের জিহ্বায় ঠেকাইয়া তাঁহাদের হাতে এক এক ঠোঙা দিলেন, উপস্থিত আর একটি ভক্তকেও দিলেন। ভক্তটি ঠোঙা হাতে করিয়া বলিল, মা, আমি যে ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া খাই না! মা বলিলেন, তবে খেয়ো না; ভক্তটির কথায় তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন; দেখিলেন সেও গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু খানিক পরেই উৎফুল্ল হইয়া বলিল, মা এবার বুঝতে পেরেচি; ঠাকুর যা, আপনিও তা—অভেদ। মা বলিলেন, তবে খাও।

মঠে একদিন সন্ধ্যাবেলা মহেশ্বরানন্দ-প্রমুখ ভক্তদের নিকটে শ্রীশ্রীমার কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেনঃ যে শালারা ঠাকুর আর মাকে দুই-দুই ভাববে তাদের কিছু হবে না—কিছু হবে না - কিছু হবে না। টাকার এপিট আর ওপিট।

অধিকারী-ভেদে শ্রীশ্রীমার শিক্ষাদান এক অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যক্তিবিশেষের জন্মান্তরাগত সংস্কার, বর্তমান মানসিক পরিণতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দানে তিনি যে ঠাকুরের মতই সমর্থ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নলিনবাবু শ্রীশ্রীমার কাছে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, মা, কোন কাজকর্ম না করে জীবনটা বৃথা কাটানো ভাল লাগচে না। মা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তা বইকি; কিছু না কল্লে শরীরমন পবিত্র হবে কিসে? দশের সেবা কর। এই ভক্তটি চলিয়া যাইতেই আর একজন আসিয়া বলিল, মা, আর গু-মুত ঘাটতে পারি না। মা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তা বইকি, ওসবে কী আছে? ও সব করে কী হবে? জপধ্যান কর, ঈশ্বরে ভক্তি হোক।

কোয়ালপাড়া মঠে তন্ময়ানন্দের প্রধান কাজ ছিল হাঁড়ি মাজা। বর্ষার সময় হাতে পায়ে হাজা ধরিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, তিনি জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, মা, আমি আর হাঁড়ি মাজতে পারচি না। মা বলিলেন, টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস! তোমার এত কষ্ট সহ্য হবে না, তুমি ডহরকুণ্ড যাও, যতগুলি পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানজপ করবে।

শ্রীশ্রীমা ঐশ্বরিক প্রসঙ্গে কথা কহিতেছিলেন এমন সময়ে একটি গ্রাম্যলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মা উপস্থিত প্রসঙ্গ পালটাইয়া দিয়া এমনভাবে বৈষয়িক কথা কহিতে লাগিলেন যেন ঐসকল কথাই এতক্ষণ ধরিয়া চলিতেছিল! [সু]

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার জ্বর। দুইজন সাধু তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-ছিলেন ও মা বলিতেছিলেন -ঠাকুর নরেন, শরৎ এদিকে নিয়ে তান্ত্রিক চক্র করেন। এমন সময়ে জনৈক গৃহস্থভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেই হঠাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কে এখানে আছে? তিনি আর সেই প্রসঙ্গ করিলেন না। [প্র]

শ্রীভগবানের কাছে সকাম প্রার্থনা করা উচিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি—কী চাইতে কী চাইবে। তবে ভক্তি আর নির্বাসনা চাইতে হয়। আবার তাঁহার উপর একান্তভাবে নির্ভরকারী কোন ভক্ত-সন্তানকে বলিয়াছেন, তোমার যখন যা দরকার আমার কাছে চাইবে। আর 'চাওয়া কী ভাল?'—এই প্রশ্নের উত্তরে জোরের সহিত বলিয়াছেন, আমার কাছে চাইবে না? আমি মা! [আ]

সাধনা ও সাধকজীবন-সম্পর্কিত শ্রীশ্রীমার কতকগুলি উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৈলাসকামিনী রায়কে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ কত্তে হয়; সেইজন্যে এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।' অব্যয়ানন্দকে লিখিয়া-ছিলেন, 'ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস -তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।'

কৈবল্যানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, মনে নানারকম ভালমন্দ চিন্তা উঠে, এর কী হবে? মা উত্তর দেন: ওর জন্যে তুমি ভেবো না। কলিতে মনের পাপ পাপ নয় যদি কাজে না করে। আর যুগে মনের সংকল্পেই পাপপুণ্য হত। কলিযুগে সৎচিন্তা মনে হলে তার উত্তম ফল হবে।

মন সকল সময়ে জপধ্যানে বসিতে চায় না; কখন বেশ ভাল থাকে, কখন আবার খারাপ হয়। নলিনবাবু ইহার কারণ জানিতে চাহিলে মা বলিলেন: কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ যেমন আছে মনেরও সেরকম অবস্থা হয় -কখন ভাল কখন মন্দ। এই প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক না কেন, সকালসন্ধ্যায় বসতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ বসতে চায় না, আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখন কখন বেশ বসে যায়। কোন্ মুহূর্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।

গোপালকিংকর সেনকে মন্ত্র দিয়া মা বলিলেন, এতদিন মানুষ ছিলি, এখন মানহুঁশ হলি। তুই ডাকিস তাঁকে—বেশী জপ কর্ আর না কর্।

প্রাণাত্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তীর্থভ্রমণের ইচ্ছে হয়, তীর্থভ্রমণ কি ভাল? মা বলিলেন, তীর্থভ্রমণ খুব ভাল, ওতে মন পবিত্র হয়। তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থদর্শনে যাওয়া ভাল।

যতীন্দ্র রায় স্বপ্নে একটি নাম পাইয়া জপ করিতেন, সেই কথা উত্থাপন করিলে মা বলিলেন, বীজ ছাড়া কি মন্ত্র হয় গা? মা তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

তারকনাথ রায়চৌধুরীকে মা পত্রে জানাইয়াছিলেন, বকলমা দেওয়া মানে, মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকলমা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র. জপ কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ করিতে হয়।

অসুস্থ রাধুকে লইয়া ব্যস্ত থাকায় শ্রীশ্রীমা নন্দরাণী দত্তকে ঠাকুরপূজা করিতে বলেন। নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করেন, আমি পুজোর মন্ত্র জানি না, কী করে করব? মা বলিলেন, ঠাকুরের গা মুছায়ে চরণে ফুল তুলসী চন্দন দেবে; তারপর যা খাবার করেচ, ঠাকুর খাও বলে ধরে দেবে; তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।

ঠাকুরকে কতজনে কতভাবে দেখতে পায়, শুনি; আমার ভাগ্যে কি তা হবে না? —এই প্রশ্নের উত্তরে নিশিকান্ত মজুমদারকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে? স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তা হলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। কোয়ালপাড়ায় একদিন যখন ঠাকুরকে প্রণাম করে ঘরে গেলাম, দেখি ঠাকুর মেজেতে শুযে আছেন। বল্লুম, সে কী গো, তুমি এমন করে শুয়ে কেন? ঠাকুর বল্লেন, আমার বড় ভাল লাগে। বলিয়াই মা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

উমেশবাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়ঃ "ঠাকুর বলেচেন, তাঁর কাছে যে যাবে তারই মুক্তি হবে। আপনার কাছে যারা আসে তাদের কী হবে?" (সহাস্যে) তাদেরও তাই হবে।' 'অনেকে তো নির্বাণ-মুক্তি চায় না, তাদের কী হবে?' 'শোন নাই, নিত্যকৃষ্ণ নিত্যভক্ত? সেভাবে তারা থাকবে। তোমাদের ভয় কী, তোমাদের জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ-লোক তৈরী করেচেন।' 'ধ্যান করার সময় গুরুমূর্তি ও ইষ্টমূর্তি দুটিই আসতে চায়, অথচ দুই মূর্তি ধারণা করা কষ্টকর। এর কী করা যায়?' 'প্রথম প্রথম একরকম হলেও, পরে দেখবে একটি মূর্তিই আসবে। যে মূর্তিটি আসে তাকেই ধরে থাকবে।' 'আমার বাসার ভৃত্য যামিনী তো আপনার কৃপা পেয়েচে, এখন তার সেবা কী করে নেওয়া যায়?' 'সখ্যভাবে তার সেবা নেবে।'

একদিন মা কথায় কথায় বলিলেনঃ লোকে ভগবান ভগবান করে, এই যে খুঁটিটি দেখচ, এর ভিতর ভগবান আরোপ কত্তে পাল্লেও ভগবান লাভ হতে পারে। [উ]

বরদানন্দ কালীঘাটের প্রসাদী সিন্দুরের ফোঁটা কপালে দিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। দেহের বর্ণ, গৈরিক ও সিন্দুরের ফোঁটা মিলিয়া দেখিতে খুব বাহার হইয়াছিল। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন, ঠাকুর বলতেন, ধর্মের আঁচড়টি পর্যন্ত যেন বাইরে না থাকে।

তন্ময়ানন্দ লিখিয়াছেনঃ শ্রীশ্রীমা প্রসাদী জিলিপী দিয়াছেন, আমি খাইতে ইতস্তত; করিতেছি—একাদশীর দিন, তাহা ছাড়া ময়রার তৈরি জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মা আমার হাত হইতে একখানা জিলিপী লইয়া উহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আবার আমার হাতে দিলেন ও বলিলেন, আর ময়রার জিনিস নাই, এখন খাও। যে জিনিস ঠাকুরকে নিবেদন করা হয় সে জিনিস যেমনই হোক, আর তা থাকে না—প্রসাদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রসাদ হলেও লোভ করে কখনো খাবে না। তারপরে মার সঙ্গে আমার

এইরূপ কথাবার্তা হয় : 'মা, ধ্যানজপ করার সময় ঐসকল চিন্তা আসে কেন ?' 'আসবে বইকি। সহজে কি কেউ ছেড়ে দিতে চায় ? সবাই নিজের দিকে টানে।' আপনি কিছু করে দিন যেন একেবারে ভুলে যাই।' (আমার মাথায় হাত দিয়া) এখন থেকে আর ও বিষয়ে চিন্তা আসবে না—এমনকি তার ছবি পর্যন্ত নয়।' 'মা, আমার সাকার-ধ্যান হয় না।' 'তাতে কী ? একটা ভাবলেই হল। তবে (ঠাকুরের মূর্তি দেখাইয়া) এই রূপ ভাববে। খুব জপ করবে। যদি লাখ লাখ কত্তে পার, দেখবে, আমি যা বলেছি সব মিলে যাবে। রোজ এক অধ্যায় গীতা পড়বে মনে মনে—সংকল্প করে যে তাঁর প্রীতির জন্যে পড়ছি। যেদিন সময় হবে না, দুচার শ্লোক পড়ে নেবে। কোন একটা আসন ঠিক করে নেবে যাতে বেশীক্ষণ বসতে পার, অন্ততঃ দুইতিন ঘণ্টা। অভ্যাস কত্তে কত্তে হয়ে যাবে। যখন দেখবে পা ঝিন্‌ঝিন্ কচ্চে তখন পা বদলে নেবে ; পরে আর কষ্ট হবে না।' 'ধ্যানের সঙ্গে জপ করব, না পরে করব ?' 'একসঙ্গে কত্তে পার। না হয় পরে করবে।' 'একবার এটা (এক রূপের ধ্যান), আর তারপর ওটা (অন্য রূপের নামজপ), বিরোধী হবে না ?' ('হাসিতে হাসিতে) ক্ষ্যাপা ছেলে। ও দুইই তো এক। একজনের দুই রূপ—বিরোধী কেন হবে ?'

সন্ন্যাস-দানের পর সম্মুখে বসাইয়া মা আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশগুলি দিয়াছিলেন : তোমার বেদনার জন্যে কষ্ট হয়, তুমি বেশী খাটুনির কাজ কোরো না। বাসী পচা জিনিস খাবে না। যা খাবে, মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে। শরীরের উপকারী জায়গায় থাকবে। যদি কখন কোন আশ্রমে থাক, প্রথমেই বলে রাখবে,—আমি বেশী খাটতে পারব না। ঐ জন্য অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়। ঝগড়া, মনকষাকষি করে কখনো আশ্রমে থাকবে না ; না পোষায়, আর কোন জায়গায় চলে যাবে, সেও ভাল। আশ্রম হল দ্বিতীয় সংসার। আশ্রমে এসে নানা কাজে জড়িয়ে ছাড়তে পারে না। এমন মোহ এসে জোটে যে, তাকে অপর জায়গায় যেতে বল্লে যেতে চায় না ; গেলেও ঘুরে ফিরে আবার এসে জোটে। সংসারে দুঃখ পেয়ে বৈরাগ্য আসে, তাই ছেড়ে পালায়। আর আশ্রমে থেকে থেকে ক্রমে বৈরাগ্য কমতে থাকে। আশ্রমে তো বেশী কষ্ট কত্তে হয় না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে ; উদ্দেশ্য ভুলে যায় তাকে যে ভগবান লাভ কত্তে হবে সেটা মনে হয় না। (সন্ন্যাসের পর বাড়ী যাওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে) সন্ন্যাসীর বাড়ী যাওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ যায় বটে, তবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তোমার তো কেউ নাই ; আর থাকলেই বা কী, নিজের লোক দেখলে আগের কথা মনে পড়ে। ওসব ভুলে যেতে হবে, এমনকি নিজের শরীর পর্যন্ত, তবে তাঁর দর্শন হবে।

অসিতানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাদের পাদপদ্মে বিশ্বাস কী করে হয় ? শ্রীশ্রীমা উত্তর দেন, বিশ্বাস কি সোজা কথা বাবা ? বিশ্বাস শেষের কথা। বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।

ভক্তিশাস্ত্র বলেন, ভগবান দীনের বন্ধু। নিজে দীন না হইলে দীনবন্ধুকে কেহ চিনিতে পারে না। এ দীনতা অন্তর সর্বপ্রকার অভিমানে পূর্ণ রাখিয়া বাহিরে দীনভাব প্রদর্শন করা নহে, অন্তরের অন্তস্তলে সত্য সত্যই আপনাকে দীনহীন বোধ করা। এই দীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন ভক্তচূড়ামণি দুর্গাচরণ নাগ ও বলরাম বসু।

এইরূপ ভক্তের প্রতি শ্রীশ্রীমার করুণার অন্ত ছিল না। যখনই কোন ভক্ত অন্তরে দীনভাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন।

অঘোরনাথ ঘোষ কথামৃতে পড়িয়াছিলেন, ঠাকুর ঘোর বিষয়ী লোকের হাওয়া সহ্য করিতে পারিতেন না, ঐরূপ লোক দেহস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে তাঁহার কষ্ট হইত। সেইজন্য শ্রীশ্রীমাকে যেদিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। মা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিলেন।

সিদ্ধানন্দ বলেন ঃ ভূপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে আসি। পথে মনে হইয়াছিল, মা যদি ইহাকে কৃপা করেন তো বেশ হয়। আমরা প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র মা বলিলেন, বাবা, এই ছেলেটির দীক্ষার কথা বলচ? তিনি দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি অযাচিতভাবে কৃপা করিতে চাহিলেও, ভূপেন নিজের অবস্থা আলোচনা করিয়া সে যে এরূপ কৃপা পাইতে পারে না এবং হয়তো কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পাইবেও না এই কথাই বারবার আমাকে বলিতে লাগিল। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার দীক্ষা হইয়া গেল। সেদিন আরও কয়েকজন দীক্ষা নিয়াছিল ; মা আমাকে বলিলেন, তোমার ঐ ছেলেটির মন ভাল ; তাই আমি তাকেই আগে দীক্ষা দিলুম।

রমণীমোহন চৌধুরী বলেন ঃ পাঠ্যবস্থা হইতেই দীক্ষার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়। শিক্ষকদের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা শুনিয়াছিলাম। মার কাছে মন্ত্র নেওয়ার ইচ্ছা হইত, কিন্তু আমার মত অযোগ্যের পক্ষে তাঁহার দর্শনলাভও অসম্ভব বিবেচনা করিয়া গম্ভীরানাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করি। কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল, গম্ভীরানাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মনটা দমিয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া অবিলম্বে মাকে একটিবার অন্ততঃ দর্শন করিবার জন্য ঢাকা হইতে রওনা হইলাম। জয়রামবাটী পেঁীছিয়া মার বাড়ীর বাহিরের ঘরে এক ঘণ্টা বসিয়া রহিলাম, কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না। অগত্যা ভিতরে যাইয়া জ্ঞানানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, যাও যাও, শীগ্‌গির স্নান করে এস, মা সকাল থেকে বলছিলেন, আজ একটি ছেলে আসচে। মা পূজা শেষ করে আসবেন বসে আছেন।

ভক্তিশাস্ত্র আরও বলেন, ভক্তের কৃপা হইলে ভাগবানেরও কৃপা হয়। সে কৃপা প্রত্যক্ষ করা সচরাচর মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীশ্রীমার আচরণে ভক্তিশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতে দেখিয়া তৎকৃপায় চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা ধন্য হইতেন। স্বামী জগদানন্দের মুখে শুনিয়াছি, কেহ মার কাছে উপস্থিত হইয়া কোন ভক্তের উপদেশানুযায়ী আচরণ করিলে মা প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন। বহু সুকৃতির ফলে যেসকল ভাগ্যবান ব্যক্তি মার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন তাঁহারা যখন তখন যেকোন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেও মা তাহাকে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তন্ময়ানন্দের সঙ্গে আগত তাঁহার এক ছাত্রকে মা বলিয়াছিলেন, তবে কালই তোর দীক্ষা হবে রে, তোর পণ্ডিত মশাই যখন বলচে। তন্ময়ানন্দ বলিলেন, সে কী মা, আপনার ইচ্ছে হয় তো দিন ; আমার কথা আপনি কেন শুনবেন?

মা বলিলেন, না বাবা, কখন কখন শুনতে হয়, ছেলের আব্দার মাকে রাখতে হয়। ছেলেদের আব্দার রাখিতে ও স্বভাবসিদ্ধ করুণার বশে মা পাপিতাপি-নির্বিশেষে শত শত লোককে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।[৩]

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : মন্ত্রের ভিতর দিয়ে শক্তি যায়—গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের পাপ গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। শিষ্য পাপ কল্পে গুরুরও লাগে। রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না ; বলে- 'মা, মন্ত্রের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে।' [গ] চৈতন্যরূপিণী মা চেতনমন্ত্র দানের সংগে সংগে শিষ্যে চৈতন্যসঞ্চার করিতেন। শিষ্যের বহুজন্মের কর্মফলের কতক নিজে গ্রহণ করিয়া ও প্রারব্ধক্ষয়ের সংগে সংগে যাহাতে নিঃশেষ হইয়া যায় সেইভাবে অবশিষ্ট সমুদয় কর্মফল নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাকে জীবন্মুক্ত করিয়া দিতেন। মা, আমাদের এত রোগভোগ হয় কেন ?—রামানন্দ এই প্রশ্ন করিলে মা বলিয়াছিলেন, তোমাদের এই শেষ জন্ম ; তাই বাকি সব জন্মের কর্মফল এই জন্মেই ভোগ হয়ে যাচ্চে।

'আমি জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পাপ করেচি সব তোমাকে অর্পণ করলুম' বহু শিষ্যকে এই সম্প্রদানবাক্য পাঠ্য করাইয়া শ্রীশ্রীমা তাহাদের পাপতাপ বরণ করিয়া নিয়াছেন। আর যাহাদিগকে তিনি ঐরূপ করান নাই তাহাদের দুর্ভোগও যে নিজের শরীরে গ্রহণ করেন নাই এমন নহে। প্রবল দুষ্কর্মের জন্য যাহারা সাধনভজন ও উপলব্ধির পথে বিশেষ বাধা অনুভব করিতেছে তাহাদিগকে ঐরূপ সম্প্রদানবাক্য পাঠ করাইয়া তাহাদের মনের ভার লাঘব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাছে আসিয়া অনেকের চিকিৎসার অতীত উৎকট ব্যাধি যে একেবারে সারিয়া গিয়াছে সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। যাহারা একবারমাত্রও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল তাহাদের অনেকেই দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহ-মন নির্মল ও আনন্দপরিপূর্ণ বোধ করিয়াছে। যতীন্দ্র দত্তের[৭] কাছে লেখক তাহার প্রথম বয়সে শুনিয়াছিল,- বছরে একবার মাকে দর্শন করে আসতে পারলেই হল, একবার মাত্র দর্শন করলেই দেখি একটি বছর আনন্দে কেটে যায় ! আর এবিষয়ে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। যদি পরকালের ভয়ে ভীত, নিদারুণ রোগ হইতে সদ্যোমুক্ত, দুর্বার অন্তঃসংগ্রামে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, দিশাহারা যুবক মার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া মনের সাম্য ফিরিয়া না পাইত, স্বল্পকালের মধ্যে যমের ভয়ের পরিবর্তে জীবন্মুক্তের অভয় অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব না করিত, জীবনের সংকটমুহূর্তে

[৬] শ্রীশ্রীমার বাঙ্গালী মন্ত্রশিষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে বাগ্দি পর্যন্ত সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকেরা আছেন। অনুসন্ধানে মার তিনজন বাগ্দি শিষ্যের কথা জানিতে পারি। ভুষণচন্দ্র পুইল্যা তাঁহার মাতুল শিবদাস দোলই ও মাতুলের কাকা যতীন্দ্র দোলইয়ের সঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। মা প্রথমতঃ দীক্ষাদানে অসম্মত হইলে ভুষণ এই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন,—তোমার তো এক বাগ্দি বাবা ছিল, বাগ্দি ছেলে তবে কেন হবে না ? শিবদাসের জমিদারী ছিল, তিনি বাগ্দি রাজা নামে খ্যাত ছিলেন।

[৭] শ্রীশ্রীমার এই হৃদয়বান সন্তান একদা লেখকের প্রতিবেশী। ইনিই প্রথম তাহাকে মার কথা শুনাইয়াছিলেন ; এবং মার অন্য সুসন্তান অতুলচন্দ্র চৌধুরী তাহার মার কাছে আসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নিজেকে দেবরক্ষিত বলিয়া বুঝিতে না পারিত, তাহা হইলে বহুপূর্বেই তাহার অস্তিত্ব ইহলোক হইতে মুছিয়া যাইত; আর বাহ্যদৃষ্টিতে একান্ত অসহায় স্বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও দয়ারূপিণীর জগৎপাবনকাহিনী লোককে শুনাইবার দুঃসাহস করিতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইত না।

শ্রীশ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন: কী বলব, এমন সব লোক আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে মা বলে ডাকে, আমি ভুলে নাই—যে যার যোগ্য নয় তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতায় কামড়ায়। তা হোক, তোমরা শরৎকে একথা বোলো না। [সু] 'শরৎকে একথা বোলো না' বলার উদ্দেশ্য,—পাছে শরৎ মহারাজ মার বিশেষ কষ্ট হইতেছে জানিয়া বিচলিত হন ও যাহাকে তাহাকে তাঁহার কাছে আসিতে না দেন। দুশ্চরিত্র লোককে আশ্রয়দানের কথায় না বলিতেন, ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটিকে কে নেয়? কেশবানন্দ প্রমুখ মঠে আগত ভক্তগণকে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন,—যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারচি না সব মার কাছে চালান দিচ্চি, মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্চেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা। সকলকে আশ্রয় দিচ্চেন, সকলের দ্রব্য খাচ্চেন আর সব হজম হয়ে যাচ্চে! মহীশূররাজ্যের কর্মচারী নারায়ণ আয়েঙ্গার একবার মার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবেন না সংকল্প করেন। ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্পর্শাদির ফলে মার শরীরে পাপ সঞ্চারিত হইয়া উহাকে পীড়িত করে। সেকথা শুনিয়া মা বলিলেন, আমরা পাপতাপ না নিলে আর নেবে কে? আমরাই পাপ নিয়ে হজম কত্তে পারি, আমরা তো সেই জন্যেই এসেচি!

শ্রীশ্রীমার কোন শিষ্যের নৈতিক অবনতি ঘটিলে মাষ্টার মহাশয় ঐ ব্যক্তির মার কাছে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন। তাহা শুনিয়া সকরুণভাবে মা বলিয়াছিলেন, আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। কোন স্ত্রীলোক একসময়ে মার কাছে আসিতেন বলিয়া সাধুরা ও স্ত্রীভক্তেরা বিরক্ত হইতেন। বলরামবাবুর স্ত্রী গোলাপ-মাকে দিয়া জানান যে, ঐ স্ত্রীলোকটি এভাবে যাতায়াত করিলে মার কাছে তাঁহার আসা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে মা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, আমার কাছে যার আশ্রয় নিয়েচে তারা আসবে; একজন এলে যদি আর একজন না আসে, আমি তার কী করব? আগে ঐ স্ত্রীলোকটির হাতে কেহ কিছু খাইতেন না; কিন্তু মা তাহার হাতে খান এবং অন্য প্রকারে তাহার সেবাও গ্রহণ করেন দেখিয়া সকলেই খাইতে আরম্ভ করেন। [গ]

অসীমশক্তিময়ী এবং সহনশীলতার প্রতিমূর্তি হইলেও, নরদেহধারিণী শ্রীশ্রীমা নিত্য বহুলোকের পাপজ্বালার সংস্পর্শে আসিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় এক এক সময়ে যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া না পড়িতেন এমন নহে। একদিন বলিয়াছিলেন, এ শরীর আর বয় না। এক এক দিন ঠাকুরকে বলি, আর কেন? সেদিন একপাল এনে হাজির করেন। [সু] মাকে বিচলিত হইতে দেখিয়া অরূপানন্দ বলিয়াছিলেন, তুমি যে মন্ত্র দাও সে তো ইচ্ছা করেই দাও। তাহাতে মা উত্তর দেন: দয়ায় মন্ত্র দিই—ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া

হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কী লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।

দয়ার অতিশয্যে প্রবল জীবোদ্ধারবাসনা এবং বহু তাপিতের জ্বালাগ্রহণজনিত অসহনীয় যাতনা—এই দুইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব একদিনের ঘটনায় শ্রীশ্রীমার কথার উচ্ছ্বাসে যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অতিশয় করুণ। গৌরীশানন্দ বলেন: জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রে ভীষণ জ্বরের অবস্থায়, পায়ের বাত বাড়িয়াছে, মা বলিতে লাগিলেন,—আজ আর কেউ এল না। ঠাকুর বলেছিলেন, কত কাজ কত্তে হবে, বাকি আছে। একটি দিন বৃথা গেল! পরদিন সকালে তিনজন লোক মহারাজের পত্র লইয়া দীক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত। পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতেই মা কাতরস্বরে কহিলেন, ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিস পাঠায়, রাখাল আমাকে শেষকালে এই পাঠালে।

শ্রীশ্রীমার দয়ার কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে পারেন এমন শক্তিমান কেহ সংসারে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাঁর মাতৃভাবে ভাবিতা, করুণায় গঠিতা, মানবী-রূপিণী ঈশানীর দয়ার সমগ্র ধারণা করিতে জীব কোনকলে সমর্থ হইতেও পারে না। তথাপি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ও তদীয় শ্রীপদাশ্রিত সন্তানগণের সংস্পর্শে আসিয়া লেখকের যে ক্ষুদ্র ধারণাটুকু জন্মিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার শক্তিও যে নাই। মাকে কষ্ট দিয়া, মার কাছে শত অপরাধ করিয়া, সেই কষ্টদানের, সেই অপরাধের বিনিময়ে যাহারা কেবল তাঁহার অহেতুক স্নেহ ও করুণাই প্রাপ্ত হইয়াছে, ক্ষমারূপিণীর দয়ার মর্ম তাহারাই কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছে। অন্যের কথা কী, মার অপরিসীম দয়া দেখিয়া স্বয়ং ঠাকুরও তাঁহাকে 'দয়াময়ী' বলিয়া গিয়াছেন; আর ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসু তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'।

যিনি জগতের ইষ্ট তিনি যখন গুরু-মূর্তিতে জীবোদ্ধার-কার্যে প্রবৃত্ত হন বহু জীব হেলায় খেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়; তাহাদের কাছে ঈশ্বরদর্শন, আত্মোপলব্ধি আর কল্পনার বিষয়মাত্র থাকে না। শ্রীগুরুর অভয়পদে আশ্রয় লইয়া জীবের 'আমি মুক্ত' ইত্যাকার অভিমান সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; কাহারও উহা তৎক্ষণাৎ, কাহারও অল্পাধিক বিলম্বে সমুদিত হয়। কাহারও বা সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের রূপদর্শনাদি হইয়া ভাবতন্ময়তা কিংবা আত্মোপলব্ধির আভাস আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহার হাতে মুক্তির চাবি তিনি যে যাহাকে তাহাকে শ্রীপদে আশ্রয় দিয়া বলিবেন, 'এই তোমাদের শেষ জন্ম', তাহাতে আর আশ্চর্য কী? অনেক কামনা বাসনা রহিয়াছে, সুতরাং এই জন্মে মুক্তি কী করিয়া হইবে একথা বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে মা উত্তর দিয়াছেন, তা হোক, শেষকালে তা থাকবে না। জিতেন্দ্র চৌধুরী-প্রমুখ অনেক ভক্তকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও মা বলিয়াছেন, এই তোমাদের শেষ জন্ম; আর তাহারা সবিনয়ে নিজেদের মানসিক দৈন্য প্রকাশ করিলে উত্তর দিয়াছেন, ঠাকুর যখন আশ্রয় দিয়েচেন তখন আর ভাবনা কী। নিশিকান্ত মজুমদারকে বলিয়াছিলেন, কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরে ঘুরে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছে গেছ। সুরেনবাবুকে বলিয়াছেন, মুনি-ঋষিরা জন্মজন্ম তপস্যা করে যা পায় নাই তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে।

'তখন আর ভাবনা নাই', 'ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে' এবং 'অনায়াসে সব পাইবে'

জানিয়াই শ্রীশ্রীমা কোন কোন শিষ্যকে বলিয়াছেন, কিছু কত্তে হবে না, যা করবার আমিই করব। কিন্তু তিনি 'কিছু কোরো না'—এইরূপ নিষেধাত্মক উক্তি কখনও করেন নাই। যাহা নিজের এবং জগতের অশেষ কল্যাণের নিদান এমন কাজ তিনি নিষেধ করিতে পারেন না। বরং কেহ এই মুহূর্তেই চরম অবস্থার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে বলিয়াছেন, আমার যা করে দেবার এক সময়ে করে দিয়েচি; যদি সদ্য শান্তি দাও, সাধনভজন কর, তা না হলে দেহান্তে হবে। কাহারও কাহারও মানসিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই যে মা বলিয়াছেন, 'কিছু কত্তে হবে না', ইহা নিশ্চিত। যাঁহাদিগকে তিনি একথা বলিয়াছেন তাঁহারাও যথাশক্তি জপধ্যান বা স্মরণমনন করিয়া থাকেন। আর জগদ্‌গুরুর স্বেচ্ছায় এই বকলমা-গ্রহণ ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগকে আপনা হইতে যে ইষ্টচিন্তা করাইয়া নিতেছে সেই পরোক্ষ সাধনার মর্মই বা কয়জন বুঝে।

প্রেমেশানন্দ এক সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার জন্য ইচ্ছানুরূপ সাধনভজন করিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমাকে সেকথা নিবেদন করিলে মা উত্তর দেন, যদি মা বলেই বিশ্বাস থাকে তবে আর ওসবের দরকার কী? শচীবালা সরকার বলিয়াছিলেন, সংসারে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়; জপতপ করবার সময় নাই—কিছুই হয়ে উঠে না। তাহাতে মা বলেন, আমাদের যা কিছু, তোমরাই তার মালিক; তোমাদের কিছুই কত্তে হবে না। ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত বলিয়াছিলেন, কিছু তো করতে পারি না। মা উত্তর দেন, তুমি কী করবে, তুমি কী কত্তে পার? তোমার জন্যে আমিই কচ্চি। গোকুলদাস দেকে মা বলিয়াছেন, ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনি সব করে দেবেন। উপেন্দ্র সরকারকে বলিয়াছেন, যদি কিছু নাও কর, তিনি করিয়ে নিতে ছাড়বেন না। লক্ষ্মীকান্ত দত্ত বলেন: দীক্ষার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, কতবার জপ করব? মা বলিলেন, তোমরা সংসারী, তোমরা বেশী জপ কত্তে পারবে না, দ্বাদশবার জপ কল্লেই তোমার হয়ে যাবে। দীর্ঘকাল সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া করে জপ করিবার প্রণালী ভুলিয়া যাই। দাদা জয়রামবাটীতে ছিলেন, তাঁহাকে সেকথা লিখিয়া জানাইলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, তাতে আর কী হবে? তবে মা, মন্ত্রজপের কোন প্রয়োজন নাই?—এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, ওসব মনের বিশ্বাসের জন্যে। শৌর্যেন্দ্র মজুমদারের হাতে বাত থাকায় তাঁহার দীক্ষার পর মা বলিলেন, তোমার তো বাবা করজপ হবে না, ২৫টা রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা করে নিয়ো, দিনে সেই মালা একবার করে জপ করবে আর ঠাকুরকে ভক্তি করবে। এই সকল ব্যক্তিগত বিধানের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণভাবে মা অধিকাংশ ভক্তকেই সকাল-সন্ধ্যায় ১০৮ বার করিয়া জপ ও স্মরণমনন করিতে বলিয়াছেন। আর যাহাদের অধিক করিবার শক্তি আছে বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাদিগকে লক্ষ জপ করিতেও উৎসাহ দিয়াছেন। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হয়, সেইজন্য মা ন্যূনপক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তাহারই বিধান দিতেন। রাজেন্দ্র দত্ত ১০৮ বার জপের কথায় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন, মোটে ১০৮? মা উত্তর দেন, হ্যাঁ বাবা; আমার কাছে ওরকম খোলো না।

নলিনবাবু একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলেন, এত সাধুসঙ্গ করচি, আপনার কাছেও আসচি, কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করতে পারচি না কেন? মা বলিলেন: মনে কর, তুমি খাটের

উপর আমার এই এই ঘরে ঘুমিয়ে আছ, তোমাকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় খাটসুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে নেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙতেই কী মনে হবে ? মনে হবে, যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি। তারপরে যখন খেরে ঘুম ভেঙে যাবে তখন দেখবে, কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেচি !

কালীপদ রায় দীক্ষার পর শ্রীশ্রীমাকে বলেন, মা, আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। মা বলিলেন, এখন তো ছেলে হলে, আর কী ! সামান্য কথায় মা শিষ্যের মনে গুরুর সঙ্গে তাহার ভাব-সম্পর্ক কিরূপ গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন এখানে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উমেশবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, তোমরা অত ভাব কেন ? মনে বাসনা-কামনাগুলো মিটিয়ে ফেল ; পরে তো ঠাকুরই আছেন। উমেশবাবুর মৃত্যুস্থানে গ্রহযোগ ভাল নয় শুনিয়া মা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, রেখে দাও কোষ্ঠী। তাহা ছাড়া, অনেক ভক্তকেই তিনি বলিয়াছেন, শেষে ঠাকুরকে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি জীবের কাছে খুব বড় জিনিস হইলেও ঐ মুক্তিদান ঈশ্বরের কাছে কঠিন কাজ নয়। একদিন ভক্তি ও মুক্তির প্রসঙ্গে মা তাঁহার ডান হাতখানা নাড়িয়া দেখাইয়াছিলেন ঃ মুক্তি তো যখন তখন দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিটুকু ভগবান দিতে চান না। ভক্তি দিলেই যে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন।[৫]

শ্রীভগবানের জন্য যাঁহারা জন্মজন্ম তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন, কিংবা শ্রীগুরুর অহেতুকী করুণা তন্মুহূর্তে যাঁহাদের উপর উছলিয়া উঠিয়াছে এমন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী কেহ কেহ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখোচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু-মূর্তির স্থলে ইষ্টমূর্তি দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্বচিৎ কাহাকেও মন্ত্রদানের পূর্বেই মা তাহার ইষ্ট নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন, শুনা যায়। সু— বলেন ঃ দীক্ষার পূর্বদিন রাত্রে নিমতলার শ্মশানঘাটে বসিয়া অনেক চিন্তার পর সংকল্প করিলাম গঙ্গাস্নান করিয়া দীক্ষা লইতে যাইব। অসুখের জন্য আমি মোটেই স্নান করিতাম না। পরদিন সকালে মার বাড়ীতে গিয়া সেকথা ভুলিয়া যাই। কলের জলে মাথা ধুইতে যাইতেছি এমন সময় শরৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ওরে আহাম্মক, গঙ্গায় না স্নান করার কথা ছিল ? হাসিতে হাসিতে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন। দীক্ষার পূর্বে মনে হইয়াছিল, মা কী মন্ত্র দিবেন কে জানে ! যে দেবতার চিন্তা এতকাল করিয়া আসিয়াছি সেই ঠাকুরের মন্ত্র দিবেন কি ? দীক্ষার সময় আমাকে স্পর্শ করিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, এই দেখ। বলিবামাত্র আমার চক্ষুর সম্মুখে ইষ্টমূর্তি জ্বলন্তভাবে আবির্ভূত হইলেন। মা বলিলেন, এই তোমার ইষ্ট, কেমন ? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান করে এসেচ ? দীক্ষার পরে নেশার মত অবস্থা হইল। বসিয়াই আছি, খাওয়ার সময় শরৎ মহারাজ আসিয়া চোখে জলের ঝাপটা দিয়া তুলিয়া নিলেন। বিকালবেলা মঠে গেলাম, আমাকে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ মহাপুরুষকে বলিলেন, তারকদা, দেখেচ কী করে ছেলেটাকে খেয়ে দিয়েচে মা ? তারপরে হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা - মা- মা—।

---

[৫] অক্ষয়কুমার সেনকে শ্রীশ্রীমা লিখিয়াছিলেন ঃ তুমি যে স্বপ্নের কথা লিখিয়াছ যে তিনি যেন কোথাও বদ্ধ আছেন, ভগবান ভক্তের নিকটই বদ্ধ থাকেন।

দীক্ষাগ্রহণের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও কেহ কেহ শ্রীশ্রীমাকে নিজের ইষ্ট বা অন্যরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। শৈশবে মা-হারা এক বালক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পড়িতে পড়িতে যেমন মার কথা জানিতে পারে অমনি তাহার মনে হইতে থাকে সে পুনরায় মা পাইয়াছে। তাহার গর্ভধারিণীর নামও ছিল সারদা। মার শেষ অসুখের সময় দর্শন করিতে গিয়া সে তাঁহার ইংগিতক্রমে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার কাছেই থাকিতে পায়। যোগীন-মা এই সময়ে মার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। মার চরণস্পর্শ করিয়া ছেলেটির একরূপ আবেশের মত অবস্থা হয়; এবং 'গুরু ও ইষ্ট অভেদ', 'ঠাকুর ও মা অভেদ', 'ঠাকুর মাকে জগদম্বারূপে পূজা করিয়াছিলেন, অতএব ইঁনিই মা-কালী', 'যিনি রাধা তিনিই সারদা'—এই চারিটি চিন্তার পরপর উদয়ের সংগে সংগে সে অর্ধশয়ানা মার মূর্তির স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি, ঠাকুর, মা-কালী এবং শ্রীরাধামূর্তি দর্শন করে। কালী-রূপ দর্শন করিবার সময় সে একপ্রকার ভয়ে অভিভূত হয়, মা শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। রাধা-রূপ দর্শনের পর মা বলিয়াছিলেন, তুমি বৈষ্ণব বংশে জন্মেচ, সেই সকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে।[৬] যদি আর কখন এঁকে দর্শন কর, মা বলে ডেকো না।[৭]

---

[৬] 'রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে গো; সে যে সুদুর্লভ ধন।' ঠাকুর গাহিতেন।

[৭] শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যবশত অপূর্ব দর্শন লাভের কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। কুসুমকুমারী দেবীর উক্তি: সন্ধ্যার পরে অশ্বমূলে শ্রীশ্রীমার কাছে বসিয়া ধ্যান করিতেছি, দেখিলাম মা জ্যোতির ভিতর বসিয়া—দিগম্বরী; পোকার মত ছোট ছোট মানুষ প্রসব করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে খাইয়া ফেলিতেছেন। দেখিয়া ভয় হইল, চাহিয়া দেখিলাম মা ধ্যান করিতেছেন। আমার দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুর তোমাকে প্রকৃতি দর্শন করিয়েচেন।

নগেন্দ্র চক্রবর্তীর উক্তি: দ্বিতীয়বার যখন শ্রীশ্রীমার কাছে যাই, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া গেলাম। তাহার দীক্ষার পর, সে মেয়ে-কোলে, আর আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, মাকে দর্শন করিতেছি—দেখিলাম মা এলোকেশী, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মূর্তি, ত্রিনয়না—ভ্রূমধ্যের লম্বা তৃতীয় চক্ষু। নীচে আসিয়া মনে হইল, যাহা দেখিয়াছি, তাহা ধাঁধা? এই সময়ে গৌরী-মা আসিয়া হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, চল্, মাকে দেখে আসি। উপরে যাইয়া দেখি, যথাপূর্বং তথা পরং—মা ত্রিনয়না। তখনও দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম, ত্রিনয়না মা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া।

শ্রীশ ঘটকের উক্তি: ৺কাশীতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম তিনি একপাশ হইতে বামচক্ষু দিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। চক্ষুটি নাসিকা হইতে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ও অতিশয় উজ্জ্বল। চক্ষুর ভ্রম মনে করিয়া হাত দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া চাহিয়া তাহাই দেখিলাম। দুই-তিন বার দেখিয়াও কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম না।

মহাদেবানন্দের উক্তি: ৺কাশীতে একদিন বিকালবেলা মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠাইলেন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। আমার মন সেদিন ভাল ছিল না, মহারাজ আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই যাইতেছি, নতুবা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। লক্ষ্মী-নিবাসে দোতলার সিঁড়ির উপর উঠিয়া দেখি আটদশ জন স্ত্রীলোক একসঙ্গে বসিয়া আছেন। মার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখি সকলেই মায়ের মূর্তি। ভাবিতে লাগিলাম কাহাকে মহারাজের কথাগুলি

কলিকাতায় জনৈক শিষ্য একদিন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করজোড়ে সংসারাতীত আনন্দের জন্য প্রার্থনা করিলেন, বাবা, সব হবে, সব পাবে ; ব্যস্ত হয়ো না। দেখ নি, শোল মাছের ছানা হলে যদি কেউ ঐ শোলটিকে নিয়ে যায়, ছানাগুলিকে আর আর মাছে নষ্ট করে ? শিষ্যটি কহিলেন, মা, তা তো বুঝি, পাঁচ-মিনিটের জন্য কি হয় না ? তা হলেও তো বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কী। মা তাঁহার মাথায় করজপ করিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন, আর সিদ্ধির নেশার মত একরূপ আবেশের ঘোরে বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি চারিদিকে কেবল মাকেই দেখিতে লাগিলেন—মা মা মা, সমস্ত জগৎ মা-ময় হইয়া গিয়াছে ! মিনিট কয়েক পরেই সেই ঘোর কাটিয়া গেল। [উ]

শুদ্ধচিত্তে আবার শ্রীগুরু দর্শন, স্পর্শ বা সান্নিধ্যমাত্র লাভ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব উপলব্ধি করে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহার নিজের ঐরূপ একটি উপলব্ধি সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছেন : তখনও মাকে দেখি নি, দেখতে গিয়েচি ; মা উপরে রয়েচেন, আমি নীচের তলায় বসে—আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।

দেবস্বপ্নে, ধ্যানে বা ভাবাবস্থায় জীবনে দুইএক বার ইষ্টরূপের দর্শন পাইলেই যে সাধক চিরকালের জন্য কৃতকৃত্য হইয়া গেল, কিংবা স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া তাহার চিত্ত বাহ্য রূপরসাদি হইতে চিরবিমুখ হইয়া পড়িল তাহা নহে। বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য জন্মিয়া ইষ্টের অবাধ অথবা ইচ্ছামাত্র দর্শন আসিয়া উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উহা হয় না। তবে ঐরূপ দর্শনের মহৎ ফলও অস্বীকার করা চলে না। কিছুদিন যাবৎ ঘনঘন ইষ্টরূপ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দপ্রাপ্তির ফলে সহজেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে, মনে বিষয়বিমুখ হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হয়।

রূপদর্শনাদি আবার সকল ধাতের সাধকের হয় না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বিবেক-বৈরাগ্য, কামকাঞ্চনে অনাসক্তি, চিত্তের সমতা ও প্রসন্নতা ঐরূপ সাধককে দিনদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতির নিকটবর্তী করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কাহারও আবার প্রথমজীবনে দর্শনাদি, এমন কি ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়া শেষজীবনে বিচার-ভাবের বা জ্ঞানভাবের প্রাবল্য ঘটিতে দেখা যায়। শ্রীশ্রীমার কৃপায় তাঁহার আশ্রিত সন্তানগণের মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন থাকের সাধকদের দর্শন লেখকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

সংসারে রাখিলেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার কোন কোন গৃহী সন্তানকে অন্তসন্ন্যাস দিয়া গুপ্তযোগী করিয়াছেন।[৮] 'অন্তর-সন্ন্যাসী—যেমন নারদের ; ভিতরে গেরুয়া, বাহিরে

বলি, প্রকৃত মা কে ? অধিক সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে ইঁহারাই বা কী মনে করিবেন ? দুইতিন মিনিট এভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, মা, মহারাজ আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেচেন। যখন মা উত্তর দিলেন তখন দেখিলাম স্ত্রীলোকদের মধ্যস্থল হইতে মা কথা কহিতেছেন, তাঁহাদেরও আর মায়ের মত রূপ নাই।

[৮] উমেশবাবু লিখিয়াছেন : জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, আপনি দয়া করে কিছু করে কিছু করে না দিলে আমি কার কাছে যাব ? মা বলিলেন, আর কোথাও যেতে হবে না ; কাল ঠাকুর-পূজার সময় এসো, যতটা পারি করে দেব। পূজান্তে মা হাতের ইসারায় ভিতরে যাইয়া বসিতে ও আচমন করিতে বলিলেন। তারপরে দাঁড়াইয়া আমার মাথায়, কপালে, বুকে ও পিঠে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া মনে মনে কিছু বলিতে লাগিলেন। শেষে জোরে বলিলেন, ঠাকুর তোমাকে ভিতর সন্ন্যাস দিন।

সাধারণ মানুষের মতন।'—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা। বাহিরের ভেক সাধুত্বের অভিমান জাগ্রত রাখিয়া অনেকের পক্ষে বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া মা বাহ্য সন্ন্যাস অপেক্ষা এই অন্তঃসন্ন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যতদিন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে ততদিন পর্যন্ত মা বাহ্য সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। একজনকে বলিয়া ছিলেন, গেরুয়া পরে কখনো মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ো না ; নেড়ানেড়ীর দল করার চেয়ে বিয়ে করা ভাল। [আ] কচিৎ এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে,—'কলিতে অনেক লোক সন্ন্যাসী হইবে, নাচিয়া গাযিয়া তারা নরকে যাইবে।' উপযুক্ত আধার দেখিলে শ্রীশ্রীমা নিবৃত্তির পথে উৎসাহিত করিতেন। জয়রামবাটীতে রাজনারায়ণ সাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা, বিয়ে করেচ কি ? আর সে অবিবাহিত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ তো বাবা, এভাবেই থাক। কর্মসূত্রে রাজনারায়ণকে প্রায় সমগ্র জীবনই ঘরে থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিষ্কলংক চরিত্র ও সেবাময় জীবন চিরদিন স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষিত অনেকে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের কাছে বিরাজহোক করিয়া আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের সাধুগণের নিকট গুরু-পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের কেহ কেহ মন্ত্রগুরুর বা সন্ন্যাসগুরুর নামে পরিচয় দিবেন, স্থির করিতে অসমর্থ হন। মা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, মন্ত্রদাতা গুরুই গুরু। ঐ মন্ত্র থেকেই কালে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস—সব। মার সুস্পষ্ট উক্তি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, তান্ত্রিক সন্ন্যাস বা পূর্ণাভিষেক ও বৈদিক সন্ন্যাসের গুরু, মন্ত্রদাতা গুরু হইতে অভিন্ন ব্যক্তি না হইলে, উপগুরু মাত্র। দুই গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে মা নিষেধ করিয়াছেন।

প্রার্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমা যেসকল শিষ্য-সন্তানকে স্বহস্তে গৈরিক বস্ত্র দিয়াছিলেন তাহাদিগকে অন্যত্র বিরজাহোম করিতে নিষেধ না করিলেও ঐরূপ অনুষ্ঠানের আত্যন্তিক প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। কৈবল্যানন্দ মার নিকট হইতে গেরুয়া কাপড় ও সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। পরে কেহ কেহ তাহাকে মঠে বিরেজাহোম করিতে বলিলেও তাঁহার মন তাহাতে সায় দেয় নাই। মা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ঃ তোমাকে আমি যাহা কিছু প্রযোজন সবই দিয়াছি। তবে যখন উহারা বিরজাহোম করিতে বলিতেছে, লোকে তীর্থ-ব্রতাদি যেভাবে করিয়া থাকে সেইভাবে করিবে।[১]

'ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাব, সমাধি এসব হত ; আপনি তো আমাদের তা করচেন না!' কোন ভক্তের মুখে একথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা উত্তর দেন ঃ ঠাকুর করেছিলেন, সে আর কটির ? (হাতে গণিবার মত করিয়া দেখাইয়া) হাতে গণা যায়। তাতেই তাঁর শরীর এত শীঘ্র গেল। আমি যদি অমনটি করি, কদিন এ শরীর থাকবে ? আমায় কত ছেলেকে দেখতে হচ্চে। [সু] যাহা হউক, মার আশ্রয়প্রাপ্ত বহু ভক্তের সংগে মিশিবার সুযোগ পাইয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা

[১] শ্রীশ্রীমা কোন স্ত্রীলোককেই গৈরিকবস্ত্র বা সন্ন্যাস দেন নাই। তাঁহার প্রকট অবস্থায় একমাত্র যে মহীয়সী নারী বিরজাহোম করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের সুপরিচিতা যোগীন-মা। কিন্তু তাঁহার এই সন্ন্যাসগ্রহণও মায়েব নিকটে নহে, স্বামী সারদানন্দের কাছে।

সকলেই পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত : এবং এক অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত অধিকার করিয়া আছে।

আর একটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করিয়াই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। এই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপ মতলব আঁটিয়া এবং বারবার প্রশ্নগুলি মনে তোলা-পাড়া করিয়া অনেকে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিতেন। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার পর কোন কথাই আর বলিতে পারিতেন না, অন্তর ভরপুর হইয়া জিজ্ঞাসারূপ মনস্তরঙ্গ লুপ্ত হইত। এভাবে জিজ্ঞাসানিবৃত্তি ঘটিলেও মার নিকট হইতে চলিয়া আসার কিছুদিন পরে আবার মনে প্রশ্ন জাগে দেখিয়া উমেশবাবু তাঁহার প্রশ্নগুলি খাতায় লিখিয়া লন ও কলিকাতায় আসিয়া মার সম্মুখেই খাতাখানি খুলিয়া পড়িতে থাকেন! এটা কী বাবা, এটা কী ?—বলিয়া হাসিতে হাসিতে মা প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তীর্থদর্শন

ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমার দুইবার কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থে এবং দুইবার পুরীধামে গমনের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পর একবার তিনি দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং রামেশ্বর হইতে ফিরিবার প্রায় দেড়বৎসর পরে তৃতীয়বার কাশীধামে যান। এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ ঐ দুইটি ভ্রমণের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

রণজিৎ রায়ের দীঘি আরামবাগের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ডিহিবায়ড়া গ্রামে অবস্থিত। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবতী রণজিৎ রায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বালিকা-বয়সে এই দীঘিতেই অন্তর্হিত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এক বৎসর বারুণী উপলক্ষ্যে যাইয়া শ্রীশ্রীমা এই দীঘিতে স্নান ও বিক্রমপুরে ৺বিশালাক্ষী দর্শন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর আরামবাগ ও ডিহিবায়ড়ার মধ্যপথে অবস্থিত।

১৩১০ সালের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীমা কলিকাতার পথে বর্ধমানে স্বামিজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বাসায় দুইদিন বাস করেন এবং ৺সর্বমঙ্গলা, অষ্টোত্তরশত শিব ও দক্ষিণ শ্মশানের কালী দর্শন করিতে যান। দক্ষিণ শ্মশানে কালীমূর্তির বিপরীত দিকে অবস্থিত ভৈরবের মূর্তির মা প্রশংসা করেন।

বিষ্ণুপুর কামারপুকুর হইতে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় সংস্কারাভাবে শ্রীহীন হইয়াও অদ্যাপি বাঙ্গলার স্থাপত্যশিল্পের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। একবার বিষ্ণুপুর হইয়া যাইবার সময় শ্রীশ্রীমা এখানকার লালবাঁধের ধারে সর্বমঙ্গলার মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া বলিয়াছিলেন: ঠাকুরের কথা তো আজ সত্যি হল। তিনি বলেছিলেন, ওগো, বিষ্টুপুর গুপ্তবৃন্দাবন: তুমি দেখো। আমি বললুম, আমি মেয়েমানুষ, কী করে দেখব? তিনি বল্লেন, না গো, দেখবে দেখবে। [বি][১]

শ্রীশ্রীমা শৈলানন্দকে বলিয়াছিলেন, তিনি দুইবার নিজের মাসীবাড়ীতে গিয়াছেন ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বগড়ী-কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায়জীউকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মাসীবাড়ী বগড়ী-কৃষ্ণনগর হইতে একক্রোশ ব্যবধানে—পিয়াশালা গ্রামে।

---

[১] বিষ্ণুপুরে পোকাবাঁধ, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকাসকল বর্তমান। প্রথম প্রথম বিষ্ণুপুর হইয়া গমনাগমন-কালে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ পোকাবাঁধ কিংবা কৃষ্ণবাঁধের ধারে বিশ্রাম করিতেন। স্বামী সদানন্দ ১৩১৫ সালের চৈত্রমাসে বিষ্ণুপুরে যাইয়া প্রায় দুইমাস বাস করেন; তাঁহার সঙ্গগুণে সুরেশ্বর সেন ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই ঠাকুরের ভক্ত হন। ১৩১৮ সাল হইতে বিষ্ণুপুর হইয়া যাতায়াত-কালে মা ইঁহাদের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতেন।

এক বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীমা গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাহেশে গমন করেন ; এবং প্রায় সমস্ত দিন তথায় থাকিয়া, প্রসাদগ্রহণ করিয়া ও রথরজ্জু ধরিয়া টানিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐদিন রাধু ও নিতাইবাবুর মা মার সঙ্গে মোটরগাড়ীতে এবং যোগীন-মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তেরা নৌকাযোগে মাহেশে গিয়াছিলেন।

গিরিজা গুপ্তাকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : কালীঘাটের মা বড় প্রত্যক্ষ দেবী। একদিন আমি দর্শন কত্তে গিয়েচি, অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে প্রসাদী সিন্দুর নিয়ে এলুম। বাইরে এসে ভাবলুম, এখানে সধবা মেয়ে অনেক আছে তাদের প্রসাদী সিন্দুর একটু একটু দিয়ে দি। সামনে অল্প ঘোমটা দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কপালের মাঝখানে সিন্দুর দিতেই মেয়েটি শিউরে উঠল ও মাথা সরিয়ে নিল। সে ব্যথা পেয়েচে মনে করে বল্লুম, এ কী মা, এমন কচ্চ কেন ? কপালে লেগেচে ? মেয়েটি খানিক চুপ করে থেকে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে চাইলে। তখন দেখতে পেলুম তার কপালে আর একটি চোখ, তাতে সিন্দুর লেগেচে। আহা, মা কী দেখালে !—এই বলতে বলতে আমার চোখ বুজে এল। তার পরেই চেয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলুম না।

ভক্ত-পরিবারের আমন্ত্রণে, ১৩১৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন[২] ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর উড়িষ্যার জমিদারী কোঠারে পদার্পণ করেন। তথায় তিনি ৺সরস্বতীপূজা পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক দুইমাস বাস করিয়াছিলেন। ঐ পূজা উপলক্ষে উৎকলদেশীয় যাত্রাগান হয়, সেই যাত্রায় দুইটি বালক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সাজিয়া অপূর্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। তাহা দেখিয়া মা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরদিন রাত্রেও সেই যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। মার আদেশে দ্বিতীয় দিন পূজা করিয়া তৃতীয় দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। [আ]

কোঠারের তৎকালীন পোষ্ট-মাষ্টার দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবস্থাচক্রে পড়িয়া খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি অনুতপ্ত ও স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহান্বিত হইলে সেবকেরা মাকে সকল কথা নিবেদন করেন। মার অনুমতিক্রমে দেবেনবাবু সরস্বতীপূজার পূর্বদিন বলরামবাবুদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-চাঁদজীউর মন্দিরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃষ্ণলাল মহারাজের হাত হইতে গায়ত্রী সহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। মুণ্ডিতমস্তকে যজ্ঞোপবীতস্কন্ধে আসিয়া প্রণাম করিতেই মা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং পরদিনই মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া প্রসাদস্বরূপ নিজের একখানি কাপড়ও দিলেন। [আ]

৺সরস্বতীপূজার পর শ্রীশ্রীমা ৺রামেশ্বর-দর্শন-মানসে যাত্রা করেন। আশুতোষ মিত্র লিখিয়াছেন : "কোঠারে একদিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কথোপকথন-কালে দেখিলাম তাঁহার তীর্থ করিবার অত্যন্ত ঝোঁক। রামেশ্বরে যাওয়ার কথা উত্থাপন করিতেই বলিয়া উঠলেন, ঠিক বলেচ বাবা, আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন আর সেখান থেকে রামশিলা নিয়ে এসেছিলেন এখনো কামারপুকুরে নিত্য পুজো হয়, দেখেচ তো ?

[২] তারিখটি স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুলসীরাম ঘোষ কোঠারের জমিদারী সেরেস্তা হইতে উদ্ধার করিয়া লেখককে জানাইয়াছেন।

আমি যাব। অতঃপর ঠিক হইল, স্বামী ধীরানন্দ, আত্মানন্দ, রাধুর মা[৩] ও রাধু, গোলাপ-মা, রামের মা, নিতাইয়ের মা ও আমি—সবসুদ্ধ আমরা আটজন মার সঙ্গে যাইব।[৪] বন্দোবস্তের জন্য মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা হইল ; মাদ্রাজ হইতে উত্তর আসিলে আমরা মাঘের শেষে রওনা হইলাম। ভদ্রকে আসিয়া পুরুষদের জন্য মধ্যম শ্রেণীর ও স্ত্রীলোকদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া মাদ্রাজ মেলে যাত্রা করিলাম। বলরামবাবুর উপযুক্ত পুত্র রামকৃষ্ণ বসু খুরদা রোড পর্যন্ত আমাদিগকে পেঁাছাইয়া দিয়া পুরী চলিয়া গেলেন।

"খুরদা রোড পার হইয়া অল্পদূর যাইতেই প্রসিদ্ধ চিল্‌কা-হ্রদ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাতঃকালের ফুরফুরে হাওয়ায় বকপংক্তি রাত্রির অবসাদ ত্যাগ করিয়া, পাখা মেলিয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হ্রদকূলে বিচরণ করিতেছে ; হয়তো আর এক পংক্তি অদূরস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত হইতে উড়িয়া আসিতেছে ; আবার নীলকণ্ঠাদি পক্ষিনিচয় নীলাকাশে উড্ডীন হইতেছে—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মা বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে লাগিলেন ; নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। গাড়ী হুড়হুড় শব্দে বেলা আন্দাজ আটটার সময় গঞ্জাম জেলার বহরমপুর ষ্টেশনে পেঁাছিল। এখানে কেলনার কোম্পানীর বাঙ্গালী ম্যানেজার আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন, আমরা সেইদিনের জন্য ইঁহার অতিথি হইলাম। অপরাহ্ণে কদলী-নারিকেলাদি ফল হাতে করিয়া কয়েকজন মাদ্রাজী ও গঞ্জামবাসী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে দর্শন করিতে আসিলেন।

"পরদিন পুনরায় মাদ্রাজ মেলে রওনা হইলাম। পথিমধ্যে অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যাবাস ওয়ালটেয়ার পড়িল। অট্টালিকাসমূহ বক্ষে নিয়া দণ্ডায়মান ওয়ালটেয়ার পর্বত গাড়ী হইতে একখানি ছবির মত দৃষ্টিগোচর হইল। এখানেও মা সানন্দে ছোট বালিকাটির মত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ দেখ, যেন ছবির মতন বাড়ীগুলো পাহাড়ের গায়। আমরা সেই দিন ও রাত্রি গাড়ীতে থাকিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে মাদ্রাজ পেঁাছিলাম। ষ্টেশনে তিনখানি মোটরগাড়ী লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও কতিপয় মাদ্রাজী ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানেই মা এই প্রথম মোটরগাড়ী চড়িলেন। আমরা ময়লাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

"মাদ্রাজে প্রায় একমাস রহিলাম। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে দর্শন করিতে মাদ্রাজী ভক্তগণের অতিরিক্ত ভিড় হইতে লাগিল। নারীবিদ্যালয়ের মহিলারা ও বালিকারা

---

[৩] শ্রীশ্রীমা যখন কোঠারে আসেন রাধুর মা তখন জয়রামবাটীতে। রামেশ্বর গমনের প্রাক্কালে মা তাঁহাকে কোঠারে আনাইয়া লন।

[৪] 'কেদারের মা' নামে আর একজন স্ত্রীভক্তও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন। মহাদেবানন্দ বলেন : কেদারের মার তখন দীনহীন অবস্থা, আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন বলিলেই হয়। তাঁহার কথা মিত্র মহাশয়ের মনে না থাকারই সম্ভাবনা। কেদারের মার কাছে মীনাক্ষীদেবীর গল্প শুনিয়াছি। আরও শুনিয়াছি যে, রামেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা, যেমনকার তেমনটি আছে গো!' কী বল্লে মা, কী বল্লে ?—গোলাপ-মা এই প্রশ্ন করাতে মা সেই কথা চাপিয়া যান।

আসিলেন ; মহিলারা তামিল ভজন এবং বালিকারা বেহালাবাদ্য শুনাইলেন। আমরা মাকে লইয়া সান্ধ্যসমীর সেবনের নিমিত্ত প্রায়ই সমুদ্রতীরে যাইতাম ; তথায় বসিবার ও পাদচারণ করিবার সুন্দর বন্দোবস্ত। একদিন প্রাচীন দুর্গটি দেখা হইল, ইহাই ভারতে ইংরাজের প্রথম দুর্গ। দুর্গ দেখিতে যাইয়া মা এই প্রথম রিক্সায় চাড়লেন। অন্যদিন সমুদ্রতটে মৎস্যাগার দেখিলাম ; বাড়ীটি তখনও সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি তন্মধ্যে নানা বর্ণের ও নানা আকারের সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত হইয়াছে। অপর দুইদিন ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথির মন্দির ও ময়লাপুরে শিবমন্দির দর্শন করা হইল।

"মাদ্রাজে কতিপয় নরনারী শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে অমৃতানন্দ নামে আমেরিকার এক ব্রহ্মচারীও ছিলেন। আর ইঁহাদের কেহ কেহ স্বপ্নে ঠাকুর ও মার দর্শনাদি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।[৫]

"নিতাইয়ের মার অসুখ হওয়ায় মাদ্রাজে বিলম্ব হয়। অবশেষে তাঁহাকে এখানে রাখিয়াই আমরা রামেশ্বরাভিমুখে রওনা হইলাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সঙ্গে চলিলেন ; রামলালদাদা পরে মাদ্রাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। আমরা রাত্রে যাত্রা করিয়া প্রত্যুষে মাদুরা পেঁছিলাম এবং তথাকার পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

"মাদুরা বাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের একটি পুরাতন শহর। মাদুরার মন্দিরের ন্যায় সুন্দর, প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। মন্দিরমধ্যে সুন্দরেশ্বরস্বামী বা সুন্দর নামক শিবলিঙ্গ ও মীনাক্ষী দেবীর মূর্তি ; মন্দিরপার্শ্বে শান-বাঁধানো শিবগঙ্গা নামক সরোবর। আমরা অপরাহ্ণে ঐ সরোবরে স্নান করিয়া যথাবিধি দর্শনাদি করিলাম। স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার সময়ে দীপ কিনিয়া শিবগঙ্গার তীরে নিজেদের নামে রাখিয়া যায়, মাও নিজের নামে দীপদান করিয়াছিলেন। মাদুরায় এই প্রথম নারিকেল-তেলের রান্না ও নূতন একটি জিনিস—ভাতের পাঁপর খাইলাম।

"পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে পাম্বান-প্রণালী বা হরবালার খাড়ির তটে আসি। এইস্থানে রেলপথ শেষ হইয়াছে। ষ্টেশনটির নাম মণ্ডপম্। আমাদিগকে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার-যোগে দুই মাইল বিস্তৃত খাড়িটি পার হইয়া রামেশ্বর-দ্বীপে আসিতে হইল। এক্ষণে ঐ খাড়ির উপর রেলগাড়ী চলিতেছে, কিন্তু আমরা যখন যাই তখন সেতুর স্তম্ভগুলির কিয়দংশ মাত্র নির্মিত হইয়াছে। আমরা দ্বীপের যে স্থানটিতে আসিলাম তাহাকে পাম্বান বা পবন-বন্দর বলে। ঐ বন্দর হইতে পুনরায় রেলযোগে রওনা হইয়া রামেশ্বর ষ্টেশনে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় পেঁছি এবং পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বরের বন্দোবস্তে একখানি দ্বিতল বাড়ীতে গিয়া উঠি।

"রামেশ্বরের মন্দির প্রস্তরনির্মিত, অতি প্রকাণ্ড ও কারুকার্য-সমৃদ্ধ। মন্দিরের বাহিরে চারিদিকেই রাজপথ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, পূর্বদিকের বারান্দা নৃপতিগণের ও মন্ত্রিগণের প্রস্তরমূর্তিসমূহে পরিপূর্ণ। মন্দিরমধ্যে তিনটি মহল আছে ; দুই মহল অতিক্রম করিয়া রামেশ্বরের মহলে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ

---

[৫] 'যখন কোঠারে আর মাদ্রাজে গেলুম তখন যে আসে সে এসেই বলে স্বপ্ন আর স্বপ্ন।'—শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন। [উ]

মহলের প্রাঙ্গণে প্রায় একতলা সমান উচ্চ প্রস্তরনির্মিত নন্দী-বৃষ আছে ; নিকটেই প্রায় তিনতলা সমান উচ্চ একটি স্তম্ভ প্রোথিত—প্রত্যহ উহার পূজা হয়। ঐ মহলের চতুর্দিকে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতির লিঙ্গমূর্তি পৃথক্ পৃথক্ বিরাজিত। পার্শ্বস্থিত ভিন্ন মহলে পার্বতীদেবীর মূর্তি।

"রাত্রে আমরা ধূলা-পায়ে রাজপথ হইতেই রামেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাসায় যাই। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদ্রস্নানান্তে অন্যান্য দেবদেবী-সকল দর্শন করিতে করিতে অবশেষে রামেশ্বরের স্থানে উপনীত হই। রামেশ্বরের বালুকাময় প্রস্তরের লিঙ্গমূর্তি কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত, অতি ক্ষুদ্র কুণ্ডের উপর প্রায় অর্ধহস্তপরিমিত উচ্চ। উহা স্বর্ণমুকুটে আবৃত থাকে এবং ঐ মুকুটের উপরেই জল চড়ানো ও পূজাদি করা হয়। প্রাতঃকালে গঙ্গাজলে সর্বপ্রথম স্নান করাইবার সময় মুকুটাবরণ উন্মোচন করা হইলে প্রকৃত মূর্তির দর্শন ঘটে। কোন যাত্রী গঙ্গোত্রীর জল চড়াইতে চাহিলে এবং সেই উদ্দেশ্যে রামনাদের রাজার কাছারিতে এক টাকা বার আনা জমা দিয়া অনুমতিপত্র লইয়া আসিলে মন্দিরের পূজারীগণ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই জল বাবার মাথায় ঢালিয়া দেন। বাবার নিত্যস্নান ও ভোগে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ ঐ জল সরবরাহের ব্যয়নির্বাহার্থে পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

"বাবার পূজারীরা দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ ; তাঁহাদের হাত দিয়াই বাবাকে পূজা দিতে হয়। বাবার গৃহে সব যাত্রী প্রবেশ করিতে পায় না ; দাক্ষিণী ব্রাহ্মণীরা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আর্যাবর্তবাসী ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নাই ! তবে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। রামনাদের রাজার বন্দোবস্তে মার সঙ্গে আগত স্ত্রী লোকেরা পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে বাবাকে গঙ্গোত্রীর জল ও বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পাণ্ডাদের নিকট পাঁচসিকা তোলা হিসাবে গঙ্গোত্রীর জল কিনিতে পাওয়া যায়।

"আমরা বাবার পূজা ও আরতি দর্শন করিলাম। তৃতীয়দিন শ্রীশ্রীমা বিশেষভাবে বাবাকে পূজা দিলেন এবং পাণ্ডাদের পুঁথিতে লিখিত রামেশ্বরতীর্থের কাহিনী কথক মুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডাভোজন করাইলেন। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটি করিয়া জলের ঘটী দান করা হইল। হাতে সুপারি, পান ও পয়সা নিয়া পুরাণকথা শুনিতে এবং শ্রবণান্তে ঐ সকল জিনিস কথক-ঠাকুরকে দিয়া প্রণাম করিতে হয়। মা যথাবিধি কার্য করিয়াছিলেন।

"রামেশ্বরের মন্দির হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে, দ্বীপের, শেষ সীমায় প্রসিদ্ধ ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি। ঐ স্থান পর্যন্ত রেল গিয়াছে। ধনুষ্কোটিতে সোনা বা রূপার তীরধনুক দিয়া সমুদ্রের পূজা করিতে হয়। আমি ও কৃষ্ণলাল মহারাজ সেখানে গিয়াছিলাম, মা আমাদের হাতে রূপার তীরধনুক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

রামেশ্বর-দর্শনের কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ রামেশ্বরে গেছি ; শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) সব পূজোর ব্যবস্থা করেচে—১০৮ সোনার বেলপাতা আমার জন্যে করিয়ে রেখেচে। আমি সেই বেলপাতা দিয়ে পূজা করলুম। রামনাদের রাজা তার

করেছিলেন,—গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন,[৬] সব ব্যবস্থা করে দিয়ো। মণিকোঠা খুলে দেখালে সে কী দেখলুম! সামান্য আলো জ্বলচে, গোটা ঘরটা ঝক্‌ঝক্ কচ্চে! [বি] মণিকোঠার কোন রত্ন মা পছন্দ করিলেই তৎক্ষণাৎ যেন উহা তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয় এরূপ নির্দেশও রাজা দিয়াছিলেন। ইহাতে মা বিব্রত বোধ করেন, এবং রাজা বা তাঁহার লোকজন পাছে ক্ষুণ্ন হন সেইজন্য বলেন, আমার আর কী প্রয়োজন? আচ্ছা, রাধু যদি কিছু নিতে চায় তো নেবে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাধু বলিল, এ আবার কি নেব, আমার পেনসিলটা হারিয়ে গেছে একটা পেনসিল কিনে দিয়ো। রাধুর মনে যাহাতে বাসনা না জাগে সেইজন্য মা ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন।

রামেশ্বরে ত্রিরাত্র থাকিয়া শ্রীশ্রীমা প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করেন এবং মাদুরায় একদিন মাত্র থাকিয়া মাদ্রাজে আসেন। মাদ্রাজ মঠে এই সময়ে ঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) আসিয়া মাকে তাঁহার মঠে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে মা ১০ই চৈত্র বাঙ্গালোরে গমন করেন।[৭] আত্মানন্দ ব্যতীত দলের অন্যান্য সকলেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তথায় মা মঠের ভিতর বর্তমান ঠাকুরঘরে ত্রিরাত্র বাস করেন। ঐ তিনদিন পুরুষভক্তদের বাসের জন্য মাঠে তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। নিত্য বহু লোক দলে দলে মাকে প্রণাম করিতে আসিত; তাঁহাদের আনীত ফুল এক এক সময়ে স্তূপাকার হইয়া উঠিত। মঠের জমিতে চন্দনের গাছ ও একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া মা আনন্দিত হন, এবং অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ পাহাড়টির উপর প্রস্তরাসনে বসিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে জপ করেন। এখানে মা নারায়ণ আয়েঙ্গার-প্রমুখ কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোর হইতে শ্রীশ্রীমা পুনরায় মাদ্রাজে আসেন এবং তথায় দুইএক দিন থাকিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। রাস্তায় রাজমহেন্দ্রীতে জেলা-জজ এম. ও. পার্থসারথি আয়েঙ্গারের অতিথি হইয়া তিনি একদিন বিশ্রাম ও গোদাবরীতে স্নান করেন। বৃদ্ধ আয়েঙ্গার পণ্ডিত লোক ছিলেন; তুলসী মহারাজের সঙ্গে সংস্কৃতে শাস্ত্রালাপ করিয়াছিলেন।

রাজমহেন্দ্রী হইতে পুরীতে আসিয়া শ্রীশ্রীমা 'শশী নিকেতনে' কয়েকদিন বাস করেন। এই সময়ে মহারাজ পুরীতে ছিলেন; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্র মহারাজকে ও অন্যান্য সাধু-ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বাড়ীতে আনন্দোৎসব

[৬] রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন।

[৭] প্রথমতঃ নারায়ণ আয়েঙ্গার-প্রমুখ ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে বাঙ্গালোরে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মা যাইতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ফিরিয়া গেলে নির্মলানন্দজী নিজে আসেন। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, রাঁচি ও চন্দ্রকোণার ভক্তেরা অনুরূপভাবে মাকে লইয়া যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। চন্দ্রকোণার নলিনবাবুকে মা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আমাকে কেউ কি নিয়ে যেতে পারে বাবা? নিয়ে যায় তো এক শরৎ।

করেন। এই উৎসবে মা ঠাকুরপূজা করিয়াছিলেন।[৮] অতঃপর পুরী হইতে যাত্রা করিয়া তিনি ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। [দি] তুলসী মহারাজ বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন: শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইলে বেলুড় মঠে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। মার গাড়ী দৃষ্টি-পথারূঢ় হইলে নয়টি বোমা ছোড়া হয় এবং শতাধিক ভক্ত দুই সারি হইয়া 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব সুর করিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন! সহচরীগণের সহিত মা সেই দুই সারির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর এরূপভাবে আবৃত ছিল যে, মনে হইতেছিল যেন একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তিকে সচল করা হইয়াছে। মহারাজ বলিয়াছিলেন, খবরদার, মার চরণ এখন কেউ স্পর্শ করতে পাবে না। মহারাজের ভয়ে কেহই মার নিকটে যাইতে সাহস করে নাই, কিন্তু খোকা মহারাজ (সুবোধানন্দ) অতর্কিতভাবে তাঁহার পদস্পর্শ করিতেই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, ধর ধর। এদিকে খোকা মহারাজ কোথায় যে উধাও হইলেন কেহই ঠিক করিতে পারিল না, হাসির রোল পড়িয়া গেল।

শ্রীশ্রীমাকে দোতলার একখানি ঘরে বসানো হইল। পুরুষদের বসিবার জন্য উঠানে সতরঞ্চ পাতা হইয়াছিল। মহারাজ একখানি বেঞ্চে বসিয়া কালীকীর্তনের দলকে কীর্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। তিনি একটি আলবোলা হুঁকায় ধূমপান করিতে করিতে কীর্তন শুনিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে হুঁকার নলটি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সকলে একদৃষ্টে সেই সমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে একঘণ্টা দুইঘণ্টা অতিবাহিত হইলেও তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল না। তখন মার কথানুসারে জনৈক সাধু তাঁহার কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ইহাতে সমাধির ঘোর অনেকটা কাটিয়া গেল ও গায়কমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ—চলুক, চলুক। যেন অল্পক্ষণ মাত্র অন্যমনস্ক ছিলেন!

তারপরে ঠাকুরের বাল্যভোগ হইল। শ্রীশ্রীমা উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বাকি সমস্তই নীচে পাঠাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সেই প্রসাদের থালা হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র বলিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ মার স্পর্শে মহাপ্রসাদ হয়েচে; আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ করতে দেব না। কতিপয় ভক্তকে বিতরণ করিয়া থালাটি তিনি শরৎবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন। আহারান্তে

[৮] পুরীতে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথের তৎকালীন ডাক্তার রতিকান্ত মজুমদার বলেন: উৎসবের দিন আমার বড় ছেলের সংবাদের জন্য টেলিগ্রাম করিয়া উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েকদিন আগেই হাজারিবাগ হইতে তাহার আসিবার কথা ছিল। টেলিগ্রামের উত্তরে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রসাদ পাইতে গেলাম। সকলে আমার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঘরের ভিতর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মা সকল কথা শুনিতেছিলেন, বলিলেন ছেলে ভাল আছে, ভয় নাই। আজই ছেলের সংবাদ পাওয়া যাবে। বাসায় ফিরিবার পথেই ছেলের কুশলসংবাদ পাইলাম।

বিশ্রাম করিয়া সায়াহ্নে মা যখন মঠ হইতে বিদায় লইলেন তাঁহার সম্মানার্থে পুনরায় নয়টি বোমা ছোঁড়া হইল।

১৩১৮ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা ৫ই জয়রামবাটী পেঁছেন। [দি] এই সময়ে তিনি তাঁহার পালিতা কন্যা রাধারাণীর বিবাহ দিতে সচেষ্ট হন ও তাঁহার আহ্বানে শরৎ মহারাজ যোগীন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া কলিকাতা হইতে আসেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তাজপুরের মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধারাণীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। মন্মথের বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, রাধু দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে।

বিবাহকালে রাধুর আপাদমস্তক অলঙ্কারে মোড়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া বরপক্ষীয়েরা শরৎ মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য বেশী টাকা দাবি করিয়া আদায় করিয়াছিল। কেদারনাথ দত্ত তাহাতে আপত্তি ও বিরক্তি-প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ডাকিয়া সরাইয়া লন। বিবাহের পরদিন বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় সকলকেই ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। অনিমন্ত্রিত গরীবদুঃখীরা আহার করিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, শ্রীশ্রীমা পেছনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে খাওয়াদাওয়া কেমন হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা 'বরকনে সুখে থাকুক' ইত্যাদি কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একহাজার টাকা সমেত শ্রীশ্রীমার বড় কালো বাক্সটা রাধুর সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে যায়। বাক্সটা মাই রাধুকে দিয়াছিলেন, টাকাটা যে আছে খেয়াল করেন নাই। বর-কন্যা চলিয়া গেলে ঠাকুর মাকে দেখা দিয়া বলিলেন, একহাজার টাকা রাধুর বাক্সে দিয়ে দিলে? বিভূতিবাবু তাজপুরে গিয়া সেই টাকা লইয়া আসেন।

রাধুর বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, মাষ্টার মশায় মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ, তাঁকে বল্লে তো তিনি সুপাত্র খুঁজে দেন। তাহাতে মা উত্তর দেন, আপনা থেকে ছেলে জুটবে তো জুটুক, আমি কারুকে বন্ধনে ফেলবার জন্যে বলব তা কখনো হবে না।

১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ-লোকে প্রয়াণ করেন। দীর্ঘকাল মাদ্রাজে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। দেহরক্ষার পূর্বে তিনি মাকে দেখিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তাঁহাকে লইয়া আসিতে জয়রামবাটীতে লোকও যায়, কিন্তু মা আসিতে সম্মত হন নাই। শশী মহারাজ কিন্তু দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে উল্লাসভরে 'মা এসেচেন' ইত্যাদি কথা কহিয়া মহাসমাধিমগ্ন হন। তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদে মা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে! [বি] এই ঘটনার প্রায় তিনমাস পরে, ৮ই অগ্রহায়ণ মা কলিকাতায় আগমন করেন! [দি]

১৩১৯ সালে বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব করেন। শ্রীশ্রীমা দেবীর বোধনের দিন মঠে আসিয়া একাদশী পর্যন্ত ছয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। মঠের

উত্তরদিকের বাগানবাড়ীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। বোধনের দিন মার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মঠের প্রবেশদ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া বলিলেন, এখনো কলাগাছ, মঙ্গলঘটের দেখা নাই, মা আসবেন কি! দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র মার গাড়ী আসিয়া মঠে পৌঁছিল। গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুণ এলুম! [সু] এইবারেই পুজায় মহাষ্টমীর রাত্রে 'জনা' নাটক ও ৺বিজয়ার রাত্রে 'রামাশ্বমেধযজ্ঞ' যাত্রা অভিনীত হয়। মা দোতলায় বসিয়া দুইটি অভিনয়ই দেখিয়াছিলেন। [স][৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞান করিতেন, দুর্গাদেবীর অর্চনা প্রকারান্তরে তাঁহারই অর্চনা বলিয়া জানিতেন। এক বৎসর মহাষ্টমীর দিন মহারাজ ১০৮টি পদ্মফুল দিয়া মাকে পুজা করিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালের দুর্গাপুজা সম্বন্ধে লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন: ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দস্বামী ও অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ গাড়ী টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। প্রেমানন্দস্বামী আনন্দে টলিতেছেন—চোখমুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। মহানবমীর দিন দ্বিপ্রহরের পর গোলাপ-মা আসিয়া কহিলেন, শরৎ, মা-ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশী, তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্চেন। শরৎ মহারাজ আনন্দ-গম্ভীরকণ্ঠে 'বটে ?' বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাবুরাম, শুনলে ? উভয়ে তখন আনন্দে কোলাকুলি।

১৩২৩ সালে পুনরায় ঘটা করিয়া মঠে দুর্গোৎসব হয়। সেবারের পুজায় প্রণবানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) পুজক ও জগদানন্দ তন্ত্রধারক। প্রণবানন্দ লিখিয়াছেন: মহাসপ্তমীর দিন প্রত্যূষে চণ্ডীমণ্ডপে নবপত্রিকা-প্রবেশের পর শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার

---

[৯] আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে এই নাটকগুলির অভিনয় দেখার কথা জানা গিয়াছে: গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব, কালাপাহাড়; এবং অপরেশচন্দ্রের রামানুজ। দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শনে মা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একরাত্রে বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর ও জনা অভিনীত হয় কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে; গিরিশবাবু সাধক ও বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করেন। ঐ একই রঙ্গমঞ্চে পাণ্ডবগৌরব অভিনয়ে গিরিশবাবু কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন, অভিনয়-শেষে মা সমাধিস্থ হন। মিনার্ভার রামানুজ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত শ্রীরামানুজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সেই বেশে সজ্জিতা তারাসুন্দরী প্রণাম করিতে আসিলে, 'আয় মা, আয়', বলিয়া মা তাহাকে আদর করেন। স্বামী সারদানন্দের ১৩২৫ সালের ২২শে ভাদ্রের দিনলিপিতে আছে: H. M. to the theatre to witness 'Kumari' (মাতাঠাকুরাণী 'কুমারী' ['কিন্নরী' ?] অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন)। ১২ই কার্তিক তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে নির্বাক ছবি 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' দেখিতে যান। এই বৎসর বড়দিনের সময় একবার গড়ের মাঠে সার্কাস দেখিতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার ভাইঝিরা সার্কাস দেখাইবার জন্য নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসিলে তাহাদের সঙ্গে তাঁহাকেও যাইতে হইয়াছিল।

গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সুধীরা দেবী প্রভৃতি। মঠের প্রবেশদ্বার হইতে চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রেমানন্দস্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর লইয়া আসিলেন। ধূপধুনার গন্ধে, শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসরাদির ধ্বনিতে ও 'মহামায়ী কী জয়' রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। মা ঠাকুরঘরের সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল মহারাজ (আত্মানন্দ) তাঁহাকে পঞ্চপ্রদীপে আরতি ও বাবুরাম মহারাজ চামর ব্যজন করিলেন। অল্পক্ষণ ঠাকুরঘরে থাকিয়া মা অতি ধীরে নীচে নামিলেন এবং চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারই জন্য রক্ষিত গালিচার আসনে উপবেশন করিলেন। আমার বয়স তখন অল্প, আনন্দে আত্মহারা হইয়া কী যে করিব স্থির করিতে পারিলাম না। অন্তর্যামিনী মাই যেন প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিলেন যাহা করিতে হইবে, আর আমি যন্ত্রচালিতবৎ তাহাই করিতে বসিলাম। উৎকৃষ্ট জবা, গোলাপ, পদ্ম, অপরাজিতা ও বিল্বপত্র চন্দনম্রক্ষিত করিয়া চিন্ময়ীর পাদপদ্মে তিনবার অঞ্জলি দিলাম এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রেকাবিতে রক্ষিত ছোট একখানি নৈবেদ্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। মা তখন অর্ধনিমীলিতনেত্রা, ভাবাবিষ্টা ; আমারও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। মা সেই নৈবেদ্য হইতে একটু চিনি গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া মুখে দিলেন। আমি প্রণত হইয়া শ্রীপাদপদ্ম অশ্রুসিক্ত করিলে তিনি তাঁহার কোমল বাঁ হাত আমার মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সপ্তমীর পূজা সমাপ্ত হইলে স্ত্রীভক্তদিগকে সঙ্গে নিয়া মা আবার চণ্ডীমণ্ডপে আসেন ও অঞ্জলি দিবেন বলিয়া আমাকে মন্ত্র পড়াইতে আদেশ করেন। বেশ মনে আছে, তাঁহার কণ্ঠে চণ্ডীর এই শ্লোকটি সুমধুর ও সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইতেছিল ঃ

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥

স্বস্বরূপানন্দ বলেন ঃ ১৩২৩ সালে মঠে পূজা দেখিতে যাই। সপ্তমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা মঠে আসিয়া উত্তরপাশের বাগানবাড়ীতে আছেন। কিছু ক্ষণ পরে কৃষ্ণলাল মহারাজ আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, মা বলচেন রাধুর অসুখের জন্যে তাঁকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে, আপনি গিয়ে একবার বলুন যাতে তিনি থাকেন। বাবুরাম মহারাজ হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কী করবে ? তাঁর যা ইচ্ছা তা তিনি করবেন। পরে দেখা গেল রাধু অনেকটা ভাল আছে, মারও যাওয়া হইল না। গিরিজানন্দ লিখিয়াছেন ঃ সন্ধি পূজার পর পূজেনীয় শরৎ মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়। ব্রহ্মচারীটি মনে করিলেন, বোধ হয় মহারাজ গিনিটা দুর্গা-প্রতিমার সম্মুখে দিতে বলিতেছেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ পুনরায় কহিলেন, ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায় গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়, এখানে তো তাঁরই পূজা হল।

১৩১৯ সালের ১৯শে কার্তিক রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন বেলা প্রায় একটার সময় কাশী পৌঁছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে 'লক্ষ্মীনিবাসে' প্রায় আড়াই মাস

অবস্থান করেন। গোলাপ-মা, ভানুপিসী, কেদারের মা, নিকুঞ্জদেবী, মহামায়া মিত্র প্রভৃতি স্ত্রীভক্তগণ এবং মাস্টার মহাশয়, বিভূতিবাবু প্রভৃতি পুরুষ-ভক্তেরা মার সঙ্গে কাশীতে গিয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথ মাকে কাশীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, কয়েকদিন পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহারাজ, হরি মহারাজ, মহাপুরুষ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী পার্ষদগণ পূর্ব হইতেই কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

কাশীর ডাক্তার পরমভক্ত নৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার এই তীর্থযাত্রার ব্যয়ভার বহন করেন। নিত্য প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া হাতে এক ঠোঙ্গা মিষ্টি লইয়া আসিয়া তিনি মাকে প্রণাম করিতেন ও মা তাঁহাকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেন!

ইতঃপূর্বে দুইবার কাশীতে গিয়া থাকিলেও শ্রীশ্রীমা তথায় অধিকদিন বাস করিতে পারেন নাই। এইবার সেই সুযোগ পাইয়া তিনি কাশীখণ্ড শ্রবণ এবং বিশেষ বিশেষ মন্দির ও স্থানসমূহ দর্শন করেন। বিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-দর্শন করিয়া আসিয়া কয়েকদিন মাকে রামপ্রসাদী ও কাশীমাহাত্ম্য-সূচক গান শুনাইয়াছিলেন।

একদিন শ্রীশ্রীমা বাবু শম্ভুনাথের[১০] ঘোড়ার গাড়ীতে দুর্গাবাড়ী যান। যাইবার সময় বিভূতিবাবুকে বলিলেনঃ তুমি বাড়ীতে থাক। ঠাকুর আমাকে বলতেন, 'কত আর ঠাকুরদের সব প্রণাম করবে? একটা কলসীর ভিতর সব ঠাকুরকে পুরে, সেই কলসীটাকে প্রণাম কল্লেই সবাইকে প্রণাম করা হল।' ৺কেদারনাথের আরতি দর্শন করিয়া মা বলিয়াছিলেন, এ কেদার সেই কেদার এক—যোগ আছে, এঁকে দর্শন কল্লেই তাঁকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।

কাশীতে শ্রীশ্রীমা দুইজন সাধুকে দর্শন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে নবাগত নানকপন্থী এক সাধুকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া মা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন, এবং ঠাকুরের গুরু তোতাপুরীর আখড়া-ভুক্ত নাগাসন্ন্যাসী চামেলিপুরীকে দেখিয়া আসিয়া তাঁহার জন্য ফলমিষ্টি ও কম্বল পাঠাইয়া দেন।

একদিন শ্রীশ্রীমা উভয় আশ্রমের সাধুদের খাওয়াইয়া প্রত্যেককে একখানি কাপড় দিয়াছিলেন। সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তিনি সেই কর্মপ্রতিষ্ঠান ও উহার স্থাপয়িতার প্রশংসা করেন এবং স্বয়ং উহার অর্থ-ভাণ্ডারে দশটাকা জমা দেন। একদিন মাকে সারনাথ দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। মহারাজ ও অন্য অনেকেই সেদিন সারনাথে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় মহারাজ নিজে যে গাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই গাড়ীতে আগে মাকে পাঠাইয়া দিয়া, মা যে গাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই গাড়ীতে নিজে রওনা হন। কিয়দ্দূর না যাইতেই পেছনের গাড়ীর ঘোড়াটি হঠাৎ ক্ষেপিয়া পথভ্রষ্ট হয় ও গাড়ীখানি সবেগে অদূরবর্তী ধ্বংসস্তূপের গায়ে ধাক্কা খায়। আঘাত লাগিয়া

---

[১০] নৃপেনবাবুর পুত্র ননীগোপালের কাছে শুনিয়াছি, বাবু শম্ভুনাথ তাঁহার পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; তিনি সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং নিজের গাড়ী মার ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন।

মহারাজের কোমল শরীর স্থানে স্থানে ছড়িয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল।[১১] মা শুনিয়া বলিয়াছেন, এ বিপদ আমারই অদিষ্টে ছিল, রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে।

নৃপেনবাবুর বন্দোবস্তে বৃন্দাবন হইতে আগত একটি দল শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে তিনদিন রাসলীলা অভিনয় করে। অভিনয় দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রাধাকৃষ্ণ-বেশী বালকদ্বয়কে টাকা দিয়া প্রণাম করেন ও বলিয়াছিলেন, আসল নকল এক দেখলুম! মা টাকা দিয়া প্রণাম করাতে উপস্থিত সাধুভক্তগণও প্রণামী দিয়াছিলেন।

পত্রে লিখিয়াছেন হরি মহারাজ: ৩০শে ডিসেম্বর এখানে খুব ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। সকলে বলিল যে, এরূপ আনন্দ এ আশ্রম হইয়া অবধি আর কখনও পূর্বে হয় নাই।...বাস্তবিকই সেদিন যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়াছিল। সকল বিষয়ই অতি পারিপাটিরূপে নির্বাহ হইয়াছিল।

চারুবালা দেবী বলেন: কাশীতে একটি বাঙ্গালী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া একজন মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক আসিলেন। তিনি মাকে অনেক কথাই বলিলেন, মা তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না। তখন বাঙ্গালী মেয়েটি বলিলেন, ওর পাঁচটি ছেলে, কিন্তু সংসারে মন বসে না। গোয়ালঘরে বসে গরুর সেবা আর ধ্যানপূজা করেন। ধ্যানের সময় 'সোঽহং' শব্দ শুনতে পান, কিন্তু শান্তি পান না। আপনার কাছে স্বপ্নে কী পেয়েচেন, তাই দীক্ষা নিতে এসেচেন। মা কহিলেন, ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেচে, এখন দীক্ষাটি হলেই হয়ে যাবে; কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিই না, এখানে শিব গুরু; জয়রামবাটী কি কলকাতা গেলে হবে।[১২]

২রা মাঘ কাশী হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন কলিকাতায় পেঁছেন; তথায় একমাসের উপর থাকিয়া ১১ই ফাল্গুন দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। মর্ত্যলীলার অবশিষ্ট সাত বৎসরাধিক কাল তিনি কখনও দেশে, কখনও কলিকাতার বাড়ীতে বাস করিয়াছেন।

---

[১১] মহারাজের গাড়ীতে অন্য দুইতিন জন সাধু ছিলেন। আঘাত আসন্ন বুঝিয়া তাঁহাদিগকে 'মাথা বাঁচাও' বলিয়াই তিনি নিজের মাথা দুইদিকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, আর আঘাত লাগিবামাত্র ভাবের আবেগে গাহিয়াছিলেন: সুখের বাসনা কর আর কদিন। ছাড়ি অন্য বোল, কালী কালী বল, মানবজীবন যদিন॥

[১২] অমিয়বালা ঘোষ মজঃফরপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, বৌমা, গুসরের কাপড়টা পর, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া মা বলিলেন, তোমাকে আমি কলকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব, কাশীতে মন্ত্র দিলে সদ্যোমুক্ত হয়ে যাবে। [বি]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পারিবারিক চিত্র

অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, শ্যামাসুন্দরীর পরলোকগমনের পর শ্রীশ্রীমাই সহোদরগণের সংসারে অভিভাবিকা হইয়াছিলেন। বিষয়বিভাগ হইয়া ভাইরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তিনি জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমারের ঘরে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অপর ভাইদের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক কিছুমাত্র শিথিল হইল না, তিনি সকলের হইয়াই রহিলেন।

প্রসন্নকুমারের নলিনী ও সুশীলা (মাকু) নামে দুই কন্যা জন্মিবার পর অভয়ের রাধারাণী নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারপরে কালীকুমারের ভুদেব ও রাধারমণ নামে দুই পুত্র জাত হয়। ইহারা সকলেই শ্রীশ্রীমার স্নেহযত্ন লাভের সুযোগ পাইয়া ছিল। প্রসন্নকুমারের কমলা নামে কন্যা এবং বরদাপ্রসাদের খুদিরাম ও বিজয়কৃষ্ণ নামে পুত্রদ্বয় মার আদরযত্ন লাভ করিলেও তখন তাহারা নিতান্ত শিশু।

নানা কারণে নলিনীর শ্বশুরগৃহে বাস সম্ভব হয় নাই, তাহার জননী স্বর্গতা হওয়ায় (ফাল্গুন, ১৩১৩) ও পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় পিতৃগৃহে বাসও কষ্টকর হইয়া পড়ে। অগত্যা শ্রীশ্রীমা নলিনীকে নিজের কাছেই স্থানদান করেন। মাকুর অবস্থাও নলিনীর প্রায় অনুরূপ হওয়ায় তাহাকেও অনেক সময়ে নিজের কাছে রাখিতেন। রাধারাণী শ্বশুরঘরে কদাচিৎ যাইত;[১] বালক ভুদেব কখন কখন তাহার পিসীমাতার সঙ্গে থাকিত। সুতরাং মা যখন দেশ হইতে কোথাও যাইতেন তাঁহাকে এক বৃহৎ পরিবার সঙ্গে নিতে হইত।

ক্রমশঃ আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় শরৎ মহারাজ পুণ্যপুকুরের পশ্চিমতটবর্তী একখণ্ড ভুমি ক্রয় করিয়া তাহাতে নূতন বাড়ী নির্মাণ করাইয়া দেন এবং ললিত চাটুজ্যের সংগৃহীত অর্থে পুণ্যপুকুরটিও ক্রয় করিয়া উহার পঙ্কোদ্ধারাদি সংস্কার করান। চারিখানি ঘর নির্মিত হয়। বাহিরের ঘরখানি ৺জগদ্ধাত্রীপূজার ও ভক্তদের বাসের জন্য এবং ভিতরের তিনখানি ঘরের মধ্যে একখানি নলিনীর বাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ১৩২৩ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া মা এই নূতন বাড়ীতে প্রায় চারিবৎসর বাস করিয়াছিলেন।

---

[১] ১৩২২ সালের ১০ই চৈত্র ঘারিন্দার নীরদবালা মজুমদারকে শ্রীশ্রীমা লিখিয়াছেন, 'রাধু এখানে (জয়রামবাটীতে) না থাকায় চিঠিপত্রের উত্তর দিবার সুবিধা হইয়া উঠে না।' শরৎ মহারাজের ১০২৫ সাল, ১৮ই বৈশাখের দিনলিপি: Radharani came from Tajpur. Decided that Radhu will come to Calcutta with her husband in the month of Jaistha and not with H. M. at present. রাধু শ্রীশ্রীমার অসুখের সময় কোয়ালপাড়া হইতে তাজপুরে গিয়াছিল।

গৃহপ্রবেশকালে শরৎ মহারাজ বৃন্দাবনে ছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীমার আহ্বানে তিনি জয়রামবাটীতে আসেন ও নূতন বাড়ীর বৈঠকখানায় কয়েকদিন বাস করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। মা তাঁহার ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর নামে বাড়ী, পুকুর ও পূর্বে ক্রীত ধান্যজমি উৎসর্গ করিতেছেন এই মর্মে দলিল নিষ্পন্ন হয়; কলিকাতার পথে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া মা সেই অর্পণনামা রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন।

রাধারাণীর যখন বিবাহ হয়, তখন সে স্বভাবে নিতান্ত বালিকা। তাহার এই বালিকা-ভাবটি আজীবন অব্যাহত ছিল; তাহার মনমুখের অভিন্নত্ব সকলকে মুগ্ধ করিত। এই রাধারাণী, তাইদের পরিবার ও অন্যান্য সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীমার জীবনের যে স্নেহমধুর সহনশীলতাময় ও সহানুভূতিপূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, কতিপয় ঘটনায় তাহারই একটি আংশিক চিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিব।

ইন্দুমতী দেবী বলেন : ১০।১১ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ী আসি। তখন গোলাপ-মা, যোগীন-মা, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী এখানে ছিলেন। আমি মার সঙ্গে খুব কাজ করি দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী বলিলেন, মা, তুমি তো একটি ঝি বেশ ছোট পেয়েচ! মা হাসিয়া বলিলেন, না বৌমা, ও ঝি নয়; ও যে আমার বরদার বৌ গো! সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন।

একদিন মা আমাকে বলিলেন, দেখ্, তোরা ছেলেমানুষ, খুব সাবধান হয়ে কাজ করবি। আমার ঠাকুর হাত-পা-ওলা, যদি অসাবধান হস্, তোদের অপরাধ হবে।

প্রথম প্রথম মা প্রত্যহ নিজে রান্না করিতেন। আমি ও নলিনী তখন ছোট, বেশ রান্না করিতে পারিতাম না। মা বলিতেন, আমার কাছে আয়, রান্না শিখ্, আমি কি তোদের সংসারে বারমাস রান্না কত্তে পারব? পরবর্তী কালে মা আমাকে বলিতেন, তুই রেঁধে এ বাড়ী আগে দিয়ে যাবি, ডুমুরের ডালনা তুই বড় ভাল রাঁধিস। মা ডুমুরের ডালনা, আমরুল শাক, গিমে শাক, এইসব খাইতে ভালবাসিতেন।

রাধু শ্রীশ্রীমাকে মা বলিত আর তাহার গর্ভধারিণীকে বলিত নেড়ী-মা। কখন কখন মা জিজ্ঞাসা করিতেন, রাধু, তুই সিঙ্গীর দুধ খেয়ে শিয়ালই রইলি? আমি যে তোকে এত করে মানুষ কল্লুম, আমার ভাব কিছু নিলি নি মা, তোর মায়ের ভাবই সব নিলি? রাধু চুপ করিয়া থাকিত, রাগ করিয়া, মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া মুখ ফিরাইত! আমি না হলে তোর চলবেক নাই, আমাকে দেখে মাথায় কাপড় দিচ্ছ?— বলিয়া মা হাসিতেন।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র খুদিরাম—মা খুদি না বলিয়া 'ফুদি' বলিতেন—ফল খাইতে ভালবাসিত। কলিকাতা হইতে মা কখন কখন পার্সেল করিয়াও ফল পাঠাইতেন। খাওয়ার শেষে দুধভাত মাখিয়া লইয়া তাহাকে মনে করিতেন, আর খুদিও 'পিসীমা' বলিয়া গিয়া হাজির হইত। মা বলিতেন, এস বাবা, আমি তোমাকেই ডাকছিলুম। যদি কখন বলিতাম, আপনি ওকে ভালমন্দ এত করে খাওয়াচ্চেন, ও কি বরাবরই এমনি খেতে পাবে?—পাড়াগেঁয়ে ছেলে! মা উত্তর দিতেন, তোরা বুঝিস নি গো, যে-খায় চিনি যোগায় তাকে চিন্তামণি।

কলিকাতা যাওয়ার সময় খুদি সঙ্গ নিল, কিছুতেই ছাড়িবে না। মা তাহার হাতে

একটি সোনার আংটি পরাইয়া দিলেন—আংটিটি শম্ভু রায়ের স্ত্রী মাকে দিয়াছিলেন—আর এক কৌটো মিছরি দিয়া বলিলেন, যখনই আমার কথা মনে পড়বে, এই মিছরি খাবে ; তা হলেই আমাকে ভুলে যাবে !

খুদিকে যখন কলিকাতায় লইয়া গেলাম, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, তুমি কী মল লেবে ? খুদি বলিল, আমি দেতুরে (নেপুরে) মল লুব। মা বলিলেন, বেশ তো বাবা, গোপালের পায়ে নুপুর আছে, তোমারও পায়ে নপুরে মল থাকবে। মা গোলাপ-মাকে দিয়া মল গড়াইয়া দিলেন।

একদিন খুদিকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কী দিয়ে ভাত খেলে বাবা ? খুদি বলিল, আমার মা (দুইহাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় একটা মাগুর মাছ কিনেচে। 'কত বড় বাবা ?' 'এত বড়।' 'তোমাকে দিয়েছিল ?' একখানি মোটে দিয়েছিল পিসীমা, সবাইকে দিয়ে দিলে !' বিকালবেলা আমি যাইতেই মা বলিলেন, শুনেচিস ? এত বড় মাগুর মাছ কিনে রান্না করেচিস ; ফুদিকে মোটে একখানা দিয়েচিস, আর দিস নি ? আমি বলিলাম, না, মাছ তো নেওয়া হয়নি। মা হাসিয়া বলিলেন, ওলো, আমার মেজ ভাই উমেশ অমনি বলত ; সেকথাটি আজ ফুদি বল্লে।

খুদির বয়স যখন আড়াই বছর, আমার অম্বলের অসুখ হয়। মা আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান ও শ্যামাদাস কবিরাজ চিকিৎসা করিতে থাকেন। চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় মা আমাকে নানা টুটকা ঔষধ খাওয়াইতে ও রোজ গঙ্গায় নাওয়াইতে লাগিলেন। প্রায় দেড় বছরে ব্যাধি সারে। মা বলিয়াছিলেন, তোর জন্য আমি ছাদে গঙ্গার বাগে চেয়ে কাঁদতুম, পাছে তুই মরে যাস। তা হলে আমি তোর ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হব।

যখন বিজয় হইল, তখন আমার কঠিন অসুখ। মা দেশড়ার যথার্থ ঘোষ, চন্দ্রকোণার নলিন সরকার, বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ তিনজন ডাক্তার আনাইলেন। আমার অসুখে মা এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, তাহারও অসুখ হইল। অসুখ সারিয়া যাইতে বলিলেন : তোর যখন ছেলে হয় তখন আমি বড় কষ্ট পাই ; তোর যত না কষ্ট হয়, আমার তার চেয়ে বেশী যাতনা হয়। তুই যদি মরে যাস, আমাকেই তো দেখতে হবে ! আমি তো ফেলতে পারব নি। আমি আশীর্বাদ করি, আর যেন না তোর ছেলে হয়।

বিজয় জন্মিয়া অবধি আমি অনেক কষ্ট পাই, তাই মা তাহার নাম রাখেন, দুঃখীরাম। যোগীন-মা ও গোলাপ-মা বলিলেন, আপনি যা নাম রাখবেন তাই তো হবে ? অমনিই তো কত দুঃখ পাচ্চে। মা বলিলেন, তবে ওর নাম বিজয়কৃষ্ণ থাক্।

সুবাসিনী দেবী বলেন : মনসাপূজা উপলক্ষে বলরাম বাঁড়ুজ্যের মা আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। রাত্রে কেহ রান্না করিতে চাহিল না, রাঁধুনী নলিনী পর্যন্ত। আমাদের নলিনী বলিল, একদিন মুড়ি হলেই সকলের হয়ে যাবে, একবেলা রান্না নাই বা হল। আমি দুইসের চাউলের ভাত বসাইয়া দিলাম, সকলে বেশ খাইল। পরদিন তরকারির কুটতে বসিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন : নলিনী, রাত্তে বারণ করেছিলি ; বৌ রাঁধলে —একদিন মুড়ি বেঁচে গেল। তা না হলে, কাল মুড়ি ভেজে গেছে, আজ আবার মহেন্দ্র বিশ্বাসের মাকে ডাকতে হত। জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যে বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

বৈশাখের এক দুপুরে মা সকলের ভাত বাড়িয়া দিয়াছেন, আমি থালাগুলি ধরিয়া দিলাম। মণীন্দ্রবাবুর মা, খুদির মা, নলিনী, মাকু, রাধু প্রভৃতি মেয়েরা ছিলেন, সকলের সঙ্গে মাও খাইতে বসিলেন। মা যখন পাতের প্রসাদ সকলকে দিলেন সেই প্রসাদে আবাঠার গন্ধ পাওয়া গেল। সকলে আমাকে একবাক্যে দোষ দিয়া বলিল, তুমি বোধ হয় আবাঠা মেখেচ। কেহ কেহ আমার মাথা শুঁকিয়াও দেখিল, কিন্তু আবাঠা তখন আমাদের ঘরেও ছিল না। সেদিন মার ভাল খাওয়া হইল না। পরদিন শিবু কামারপুকুর হইতে আসিল। মা বলিলেন, কী করে এলি? শিবু কহিল,—কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম একজন বলচেন,—এবার তোর মাকে গাছের পাকা আম দিলি নি? যা দিয়ে আয়। তাই আজ তোমার জন্যে গাছের পাকা আম নিয়ে এসেচি, তা না হলে দুদিন পরে আসতুম। ভানুপিসী বলিলেন, ঠাকুর তাকে বলেচেন আম নিয়ে যেতে। মা ভানুপিসীকে ধমক দিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর শিবু যখন যায়, মা তাহার হাতে সীতা চাল, ছোলার ডাল, আলু, কুমড়া ইত্যাদি দিয়া বলিলেন, শীতলা-মায়ের ভোগ দিবি। কাল কোথাও কিছু দেখলুম নি, খাবারে আবাঠার গন্ধ পেলুম। বৈশাখ মাসে মা শীতলা-রঘুবীরের ভোগ পাঠাইতেন প্রতি বৎসর।

একদিন বিকালে মার ঘর ঝুল ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা হইতেছিল। পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে ৫০।৬০ টাকার একতাড়া নোট ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমি ঐ নোট পাইয়াই আনিয়া মাকে দেই। তাহাতে মা আমার দাড়ি ধরিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন: গৌরদাসী এটি আমার করে দিয়ে গিয়েছিল—গৌরদাসী সেয়ানা আছে কিনা! আমি মন্ত্র দিতে চাই নি, ঘরে মন্ত্র দেব নি, গৌরদাসী বল্লে, তা হোক মা, একটি তোমার বলতে থাক।[২] মায়ের পরিবারকে কাকেও তো বিশ্বাস নাই—একদিন স্নান কত্তে গিয়েচি, ফিরে এসে দেখি, নলিনী বাক্সের চাবি খুলে দেখচে।

একবার মা দশ-পনর দিন কামারপুকুরে ছিলেন। সেই সময়ে আমি একটি মেয়েকে দিয়া পদ্মফুল ও মিষ্টি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, এ সংসারে কেউ আমাকে তত্ত্ব করে না, এই একটিই করে। কামারপুকুরে যাওয়ার সময় মা আমার কাছে পনরখানা গিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মা যখন কলিকাতায়, একডিবা গুল তৈয়ার করিয়া স্বামীর হাতে পাঠাইয়া দেই। ফিরিয়া আসিয়া মা বলিয়াছিলেন, তুমি যে গুল পাঠিয়েছিলে সবাই সুখ্যাত কচ্ছিল।[৩] আমি তখন বলিলাম, মা, তুমি তো মন্ত্র দিয়েচ, সাধনভজন তো কিছু জানি না—জপে মন বসে না। মা বলিলেন, তুমি এই যে কাজ কচ্চ এতেই সাধনভজন করা হচ্ছে; এর চেয়ে আর কী সাধনভজন। ঠাকুরকে জানাও,—আমার যেন ভক্তিলাভ হয়।

মা নূতন বাড়ীতে গিয়াছেন। রান্না করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, বলিলেন, রান্না হল বো? কী কী রাঁধলে? জল খেয়েচ? মা জলখাবার প্রসাদ

---

[২] আত্মীয়দের মধ্যে সুবাসিনী দেবী, সুশীলা, রাধারাণী ও তাহার স্বামী, ভূদেব ও তাহার স্ত্রী—এই ছয়জন শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য।

[৩] শ্রীশ্রীমা প্রত্যহ চারিবার দাঁতে গুল দিতেন। নারিকেলপাতা ও দোক্তা পোড়াইয়া গুল তৈয়ার করা হইত।

দিলেন, তারপর বলিলেন ঃ ইন্দু বলে—ঠাকুরঝি, তুমি আলাদা থাকবে, হরিনাম করবে আর একসের চাল রাঁধবে। তোমার কেন ঝঞ্ঝাট পোয়ানো? ওদের হল চার চাল, আমার হল ষোল চাল।

গঙ্গারাম কখন কখন বলিত, মা, পড় পড়। মা বলিতেন, ওরে এ সংসারে আমাকে কেউ পড়তে বলে নি, মায়ের সংসারে সবাই কেবল দোহ দোহ করে, তুই আমাকে পড়তে বলচিস!

জগদ্ধাত্রী-পূজার আগের দিন ছোট মেয়ে বিমলার পা ফুলিয়া জ্বর হয়, সে অজ্ঞান হইয়া যায়। বৈকুণ্ঠ মহারাজ দেখিয়া বলিলেন, ধাত নাই। আমি মার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ও পায়ের ধুলা লইয়া জল মিশাইয়া মেয়ের মুখে দিলাম। মা তাহার সমস্ত গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, কাল তোমার পূজা হবে মা, বড়বৌ হাউ হাউ করে কাঁদবে? রাত্রে মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

আমাকে মা বলিয়াছিলেন ঃ সতের সঙ্গে থাকবে; সতের সঙ্গে ব্যাভার কল্লে কোন ব্যাঘাত হবে নি। তুমি সকলকে যত্ন করবে; যত্ন কল্লে বনের পশু সেও বশ হয়।

ইন্দুমতী দেবী বলেন ঃ পাগলী (রাধুর মা) একএক সময় মাকে বলিত, তোমার অনেক ভাজ আছে, তাদের ছেলে একটি লাওগে যাও, তুমি কি আমার ছেলেকেই লিবে বলে জন্মেছিলে?

মা পাগলীকে একখানা গরদের কাপড় দিয়াছিলেন। রাধুর জন্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে কাপড়খানা মার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, এই লাও তোমার কাপড়, তোমার ভাল ভাজদের দাওগে। মা বলিলেন, তোর চেয়ে আমার কে ভাল ভাজ আছে? আমি কি তোর ভাতার যে আমার উপর এত উপদ্রব কচ্চিস? আমি যাকে মন চায় তাকেই দিয়ে দেব।

মা আমাকে সোনার চুড়ি করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার বাড়ীর সদর দরজা দিয়া হন্‌হন্ করিয়া পাগলী বাড়ীতে ঢুকিতেছে আর ছেলেরা বলিতেছে, পাগলী মামী এসেচে রে, পাগলী মামী এসেচে। মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, চুড়িগুলি হাত থেকে ঠাণ্ডা কর্, আমি বিকেলবেলা চুড়িওলী ডেকে হাতে চুড়ি দিয়ে দেব।[৪]

একবার পাগলী মাজুটে গ্রামে বাপের বাড়ী যায়। তাহার বাবা তাহার নিকট হইতে একশত টাকা ধার নিয়া কতকগুলি রুপার গহনা বন্ধক দেয়। পাগলীর নিজের অলংকারপত্রও যথেষ্ট ছিল। সেগুলি একটা বাকসে পুরিয়া সন্ধ্যার সময় ফুলুই গ্রামে আসে; ফুলুইয়ে ভানুপিসীর ভাসুরপোরা তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে। তাহাদিগকে

---

[৪] নগেনবালা সিংহ যখন কলিকাতায় দীক্ষা নিতে যান, বার-তের বছর বয়সে, রেশমী চুড়ি তখন নূতন বাহির হইয়াছে। রাধুকে দিয়া শ্রীশ্রীমা চুড়িওয়ালীকে ডাকাইয়া বলিলেন, বৌমাকে চুড়ি পরিয়ে দাও, একএক হাতে ছয়গাছি করে পরাও। নানা রঙের চুড়ি—লাল নীল সাদা সবুজ হলদে। রাধু বলিল, এক রঙের হোক। মা বলিলেন, না, এর একখানা তার একখানা পরাও। চুড়ি পরানো হইলে নগেনবালার হাত নিজের হাতে লইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া মা বলিলেন, বেশ হয়েছে; ছোট বৌমাটির হাতে মানিয়েছে ভাল। মা নিজেই চুড়ির দাম দিলেন।

যত্ন করিতে দেখিয়া পাগলীর সন্দেহ হইল, এত যত্ন কেবল তাহার অলংকারগুলি বাগাইবার জন্য। তখনই 'ওরে বাবা রে—আমাকে মারলে রে—' বলিয়া সে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকারে গ্রামের লোক একত্র হইয়া তাহাকে বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল আর এখানে মার কাছেও সংবাদ পাঠাইল। তাহার বাবা অলংকারগুলি আত্মসাৎ করিয়া পরে অস্বীকার করিল। মা মহা ভাবিত হইয়া লোক পাঠাইয়া পাগলীর বাবাকে জয়রামবাটীতে আনাইলেন এবং অনুনয় করিয়া, এমনকি পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মা সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া কলিকাতায় চিঠি দিয়াছিলেন। চিঠি পাইয়া মাষ্টার মহাশয় ও ললিত চাটুজ্যে জয়রামবাটী আসিলেন। ললিতবাবু পুলিশের উপরওয়ালা একজনের চিঠি লইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি পেন্টালুন পরিয়া পালকিতে চাপিয়া বদনগঞ্জ থানায় উপস্থিত হইতেই তাঁহার চেহারা ও পোষাক দেখিয়া থানার দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির। মাষ্টার মহাশয়কে মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের যেন হাতকড়ি না পড়ে। পুলিশ যাইয়া একটু ধমকাইতেই অলংকার আদায় হইয়া গেল এবং সেইদিন ব্রাহ্মণকে জয়রামবাটীতে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্র সাজাইয়া আনন্দ করা হইল। পাছে ব্রাহ্মণের বিশেষ কোন অপমান হয় এই চিন্তা সারাদিন করিতে করিতে মার শরীর অসুস্থ হইল—বায়ু প্রবল হইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না!

কমলা ঘোষ বলেন: একদিন বড় মামী ও পাগলী মামীতে ঝগড়া হইতেছিল; বড় মামা শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া বলিলেন, দিদি, এর একটা কিনারা করে দাও। এমন সময় দুই মামীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই পাগলী মামী মাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, দেখ্, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ঘরে বাঁধা; আমিও সরে পড়ব, তোদেরও দুর্দশার শেষ থাকবে নি।

কলিকাতায় চন্দ্রমোহন দত্ত শুনিতে পান, পাগলী মামী বিড়বিড় করিয়া শ্রীশ্রীমাকে কটুকথা কহিতেছেন। মা তখন পূজায় ছিলেন, পূজা শেষ হইলে পাগলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কত মুনিঋষি তপস্যা করেও আমাকে পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি! ৺কাশীতে একদিন সকালবেলা মা বলিয়াছিলেন, কাল সারা রাত ছোটবৌ আমাকে গাল দিয়েচে,—বলেচে, 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।' ছোটবৌ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েচি! [বি]

পাগলী মামী গালাগাল দিলেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথায় সাধারণতঃ কান দিতেন না, সকল কথার জবাবও দিতেন না। কখন কখন রঙ্গরস করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন,—পাগলে কী না বলে। কামারপুকুরে রাত্রে ঘরে শুয়ে আছি, শুনতে পাচ্চি মাতালদের একজন বলচে, ওরে আমার পা-টা গেল কোথা-রে? আর একজন বলচে, ওরে, লাহাবাবুদের ঘরে দুর্গাপুজো হচ্ছে, তোর পা-টা তার প্রধান নৈবিদ্যিতেই বোধ হয় গেছে! বলিয়া মা খুব হাসিতে থাকেন। [ই] আর একদিন বলিয়াছিলেন, একটা প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে সিকনি-নেকো মেয়ে, তার জন্যে মাগী গরব করে মরে! দেখ্ দিকিনি (প্রবোধবাবু-প্রমুখ ভক্তদিগকে দেখাইয়া) আমার কত

শত সোনার চাঁদ ছেলে ![৫]—না বিইয়ে ছেলের মা ! কখন কখন মিষ্টিমুখে তাঁহাকে নানাকথা বলিয়াও বুঝাইতেন। একদিন বলিয়াছিলেনঃ তুই আমাকে সামান্য মনে করিস নি। আমি দেবাংশী, ঈশ্বরজানিত লোক। তুই যে আমাকে এত বাপান্ত মাঅন্ত করে গাল দিচ্চিস, আমি তোর অপরাধ নিই না ভাবি, দুটো শব্দ বই তো নয় ? আমি যদি অপরাধ নিই তা হলে কি তোর রক্ষে আছে ? যে কদিন না মানুষ হয় সে কদিনই আমি। নতুবা, আমার কি মায়া ? এখুনি কেটে দিতে পারি। [গ]

একএক সময়ে পাগলীর কথাবার্তা বেশ উপভোগ্য হইত। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে ফুল দিয়া সাজাইতেছেন, আর পাগলী ঈষৎ হাসিয়া স্ত্রীভক্তদিগকে বলিতেছেন, দেখ তোমাদের মার কী কাণ্ড নিজের স্বামীকে নিজেই সাজাচ্চে।

অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যাহাই করুন না কেন, শ্রীশ্রীমার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুরবালা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। মা টাকাপয়সা অন্যকে বিলাইয়া দিতেছেন দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাঁহার নিজের জন্য অর্থাদি কামনা করিতেন না, মা দিতে চাহিলেও নিতেন না। মার নূতন বাড়ী নির্মিত হইলে আনন্দিত হইয়া তিনি বলিযাছিলেন, ঠাকুরঝি, তুমি চব্বিশ-প্রহর করাও।

রাধারাণীকে শ্রীশ্রীমা লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, তাহার উপর যে মাতৃজন-সুলভ আকর্ষণ অনুভব করিবেন ইহা স্বাভাবিক। যখন কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে প্রথম আসেন তখন রাধু বড় হইয়াছে। তাহার সঙ্গে একই তক্তাপোষে শোয়া মার কষ্টকর হইতেছে মনে করিয়া শরৎ মহারাজের আদেশে গণেন্দ্রনাথ একখানি ছোট খাট প্রস্তুত করাইয়া আনেন। উদ্দেশ্য, মা খাটে শুইবেন, রাধু তক্তাপোষে শুইবে। দুইখানি একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইলে উপরোধে পড়িয়া মা সেই খাটে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কয়েকদিন শুইবার পরেই গণেন্দ্রনাথকে কহিলেন, বড় অসুবিধে হচ্চে, রাধি কাছে না শুলে আমার ভাল ঘুম হয় না। আমি তো খাটে দিনকতক শুলুম, এ খাট তোমাকে দিলুম, তুমি শোবে।

বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যখন ছিলেন তখন সিস্টার নিবেদিতা রাধুকে অনেকগুলি ফ্রক তৈয়ার করিয়া দেন। রাধু ব্যবহার করিলেও কতকগুলি ফ্রক একপ্রকার নূতনই থাকিয়া যায়। মা সেইগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখেন, রাধুর ছেলে হইলে পরিবে বলিয়া। ঐ ফ্রকগুলি মাকুর ছেলেকে দিবার জন্য গণেন্দ্রনাথ ও গোলাপ-মা অনেকবার বলিলেও মা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মা যখন যে কাজটি করিতেন সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিতই করিতেন, এই ঘটনায় ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমা বিছানায় পা মেলিয়া বসিয়াছেন ; কাছে শুইয়া রাধু তাঁহার বেতো পায়ে হাত বুলাইতেছে, আর সুমধুর আবৃত্তি করিয়া মা তাহাকে শিখাইতেছেন, —ওর রসনা রে, পুরো বাসনা রে, রাধাগোবিন্দ গোবিন্দ বলে নেরে। জয় রাধা-গোবিন্দ শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।

---

[৫] জয়রামবাটীতে সুশীল সরকার শুনিতে পান, শ্রীশ্রীমা তরকারি কুটিতে কুটিতে বলিতেছেন,—একজনের যদি পাঁচটি ছেলে থাকে, একএকটি হয় একএক রকমের—কেউ ভাল তো কেউ মাতাল, কেউ আরো কত কী। আমার এত যে ছেলে সবই বাছা বাছা ছেলে, একটিও খারাপ নাই।

একবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার ভীষণ জ্বর হয়। রাত্রিকালে জ্বরের ঘোরে অন্যান্য কথার সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—যেতে দেবে না? কেন?—রাধির জন্যে? আচ্ছা তাই। [আ]

বাল্যকাল হইতেই রাধুর দেহ রুগ্ন ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার রোগ লাগিয়াই থাকিত। তাহার রোগ হইলে শ্রীশ্রীমা মহা ভাবিত হইয়া পড়িতেন এবং ডাক্তারি ও কবিরাজী চিকিৎসা, দৈব ঔষধ প্রয়োগ, ঠাকুরদেবতার কাছে মানত একটার পর একটা করাইয়া বা করিয়া যাইতেন। একবার চন্ড নামাইয়া রোগ ও তাহার প্রতিকার অবগত হইবার জন্য ইরকোণা গ্রামে বিভূতিবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন। একদিন বলিলেন, রাধুর অসুখের জন্যে সব ঠাকুরকে বল্লুম, কিছু হল না; কত ডাক্তার কবরেজ এসে গেল, তাদেরই সুবিধে হল!

১৩২৫ সালে রাধু যখন অন্তঃসত্ত্বা হইয়া অসুস্থ হয়, শ্রীশ্রীমা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও তাহাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কোয়ালপাড়ায় চলিয়া যান। সেইবারে দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী থাকিলেও মার অশেষ যত্নে রাধু নিরাময় হইয়াছিল। মহেশ্বরানন্দ বলেন, প্রসব-কালের অনেকদিন পূর্ব হইতেই রাধু স্নায়বিক অবসাদে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়ে। শরৎ মহারাজ রাধুর কোষ্ঠী দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহার সুখপ্রসব হইবে না, অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। তিনি ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ সরলাকে পাঠাইয়াছিলেন, আমাকেও থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও সুখপ্রসব হইয়াছে, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। ইহাকে মার প্রভাব ভিন্ন আর কী বলিব? রাধুর প্রসবের জন্য ডাক্তার আনাইবার পূর্বে ইন্দুভূষণ সেনগুপ্তকে মা বলিয়াছিলেন, কুকুর শিয়াল যারা বনে থাকে তাদের কি আর প্রসব হয় না? কে দেখে? ঠাকুরই দেখবেন।

রাধুর সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারে এক এক সময়ে শ্রীশ্রীমার অপূর্ব বালিকা-মূর্তি ফুটিয়া উঠিত। এই বালিকা-রূপটি তাঁহার চরিত্রের এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। সুশীলা দত্ত বলেন: একদিন রাধু মার কাছে আসিয়া নালিশ করিল, বর তাহাকে চড় মারিয়াছে। মা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, সে বরকে গামছা ছুড়িয়া মারিয়াছিল। মা বলিলেন, একটা গামছা ছুড়ে মারলেই কি একটা চড় মারতে পারে? মা যেন মন্মথের উপর রাগিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, রাধু যদি গামছা ছুড়ে মেরে থাকে তা হলে তো বর এরকম করতেই পারে। মা বলিলেন, তাই কি বৌমা? তোমাদের কি এরকম করে? ঠাকুরের সঙ্গে তো আমার এরকম ব্যবহার কখনো হয় নাই, এসব জানি না। (রাধুর প্রতি) ঐ শোন্, তোরই তো দোষ তা হলে। স্বামীকে এরকম কত্তে নাই—ঐ যে বৌমা বলে।

শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ীর অর্পণনামা রেজিস্ট্রী হইবে। শরৎ মহারাজ উপস্থিত আছেন, কোতুলপুর হইতে মুসলমান সাব্‌রেজিস্ট্রার আসিয়াছেন। তাঁহাকে কোয়ালপাড়া মঠে ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসানো হইল। মা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন, সাব্‌রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিলেন, আপনার নাম কী? মা আস্তে আস্তে বিভূতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভূতি, আমার নাম কী? তিনি কহিলেন, মা, আপনার নাম সারদামণি। তখন মাও বলিলেন, সারদামণি।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার অসুখ হইয়াছে; বিভূতিবাবু বলিলেন, মা, আপনি ভাল হয়ে যান। মা কহিলেন, বিভূতি, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কল্লে? নৃপেন ডাক্তারও কাশীতে আমাকে ঐরকম আশীর্বাদ করেছিলেন।

কত সেবক কাছে থাকিলেও তাহাদিগকে না বলিয়া শ্রীশ্রীমা একটি ছোট ছেলেকে বলিতেছেন, দে বাবা চারটি ফুল তুলে, লক্ষ্মী ধন আমার! আর সে ছেলে বলিতেছে, যাঃ, আমি পারব নি। সে ছেলে কিছুতেই কথা শুনিবে না, মাও ছাড়িবেন না। শেষকালে তাহাকে দিয়াই ফুল তুলাইলেন। কত সেবিকা কাছে থাকিলেও তাহাদিগকে না বলিয়া গ্রামের এক বৃদ্ধাকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, দে মা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে, পাটা বড় কামড়াচ্চে। আর সেই বুড়ী উত্তর করিতেছে, আমি পারব নি বাছা, সমস্ত দিন গেল, আর এই রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দাও! আমি আর পারব নি। মা বলিলেন, দে মা একটু হাত বুলিয়ে, কী আর করবি বাছা বল্! সেও করিবে না, মাও ছাড়িবেন না, শেষকালে তাহাকে দিয়াই হাত বুলাইয়া নিলেন। [ত]

শ্রীশ্রীমা ঘরের দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছেন। জনৈক ভক্ত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, এ ধূলা-মাটিতে শুয়েচেন যে? বাবা, একদিন তো মাটিতেই মিশতে হবে!—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিলেন, যেন পাঁচ বছরের মেয়েটি! [উ]

শ্রীশ্রীমা নিজের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে সর্বপ্রকার সংশিক্ষা দিয়া মানুষ করিলেও রাধুর ক্ষুদ্র আধারে অতটা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। মার আদরযত্ন তৎকালে তাহার চরিত্রের একগুঁয়ে ও আব্দেরে ভাবটিই বর্ধিত করিয়াছিল, গর্ভধারিণীর মস্তিষ্কবিকৃতিও তাহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল। সে অকারণে মার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের প্রাণে ব্যথা দিত। মার তিরোভাবের অনতিকাল পূর্বে তাহার এইরূপ স্বভাবের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। মা বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে আসিতেছেন, রাধু তাঁহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া বলিতে লাগিল, তুই সর্, তুই সর্, তুই গাড়ী থেকে নেমে যা। মা গাড়ীর পেছন দিকে সরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, আমি যদি যাব তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে? [বি]

রাধুর স্বামী মন্মথকে লইয়াও শ্রীশ্রীমাকে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতে হইত। বড় ঘরের ছেলে, বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী যুবক তখন শ্বশুরগৃহে আসিয়াও স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে জানিতেন না। রাধুর অসুখের সময় তিনি মাঝে মাঝে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া তথাকার মঠে অবস্থান করিলেও মঠের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে চাহিতেন না। একদিন আরতির সময় আড্ডা ও বৈঠকী গানে তাঁহাকে মত্ত দেখিয়া মঠাধ্যক্ষ মৃদু তিরস্কার করিলে তিনি ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ গোযানের ব্যবস্থা করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যান। মা তাহা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন।[৬]

শ্রীশ্রীমা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় যখন ব্যস্তভাবে দিন কাটাইতেছিলেন সেই সময় জয়রামবাটীতে যাইয়া মাকুর তিন বছরের ছেলে ন্যাড়া ডিপ্থিরিয়া রোগে মারা যায়। এই দেবস্বভাব শিশুটিকে মা লালনপালন করিয়াছিলেন এবং তাহার শোকে

[৬] নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কথিত।

এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর আটদশ দিন পরেও ন্যাড়ার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল ঝরিয়াছে। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কেহ বলিয়াছিল, সংসারী লোকের ছেলেমেয়ের মৃত্যুতে কতটা কষ্ট হয় তা বোধ হয় এবার আপনিও বুঝতে পারলেন? মা বলিলেন, তা কি আর বলতে? যে কষ্ট হচ্চে মাকুর ছেলেকে পালন করে তা ভুলতে পাচ্চি নি। [উ] ন্যাড়ার মৃত্যুর দুইতিন দিন পরে মা বলিয়াছিলেন: ন্যাড়া আমাকে যাবার সময় পেন্নাম করে যায় নি। দুফুরবেলা আমি খেয়ে শুয়েচি, পাল্কি এসে পেঁছেচে; নলিনী চীৎকার করে বলচে, মাকি, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েচিস? শীগ্গির চলে আয়। মাকু অমনি ন্যাড়াকে নিয়ে চলে গেল—মাকু আমাকে পেন্নাম না করিয়েই নিয়ে চলে গেল।[৭] ন্যাড়া যে আমাকে সীতা বলেছিল! ন্যাড়া যে আমাকে সীতা বলেচে! আমার দাঁত পড়ে গেছে, পায়খানার সিঁড়িতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বলচে নিজের দাঁত দেখিয়ে, পিসীমা, আমার দাঁত দুটি দাও। [বি]

জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিবেন। সমস্ত জিনিসপত্র গাড়ীতে তোলা হইয়াছে, কেবল 'ঠাকুরের বাক্স' তুলিতে বাকি আছে। বিভূতিবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখেন, ন্যাড়া ঠাকুরের বাক্সের উপর বসিয়া আছে আর মা হাততালি দিতেছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে হইল, বাক্সের ভিতরে যিনি বাহিরেও তিনি— এইরূপ দেখিয়াই যেন মা হাততালি দিতেছেন!

কোয়ালপাড়ায় বনের মত স্থানে জন্মিয়াছিল বলিয়া শ্রীশ্রীমা রাধুর ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বনু বা বনবিহারী।[৮] প্রত্যহ সকালে মা এই গান গাহিয়া বনুর ঘুম ভাঙ্গাইতেন,—উঠ লালজি, ভোর ভায় সুর-নর-মুনি-হিতকারী। স্নান করে দান দেহি গো-গজ-কনক-সুপারি। মা বলিতেন, কৌশল্যা রামচন্দ্রকে এমনিভাবে গান গেয়ে উঠাতেন।

রামলালদাদার কনিষ্ঠা কন্যা রাধার বিবাহে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে আসেন। অন্য লোক না থাকায় তাঁহাকেই বাসর জাগিতে বলা হয়। বাসরঘরে বসিয়া মা আপন মনে গান ধরিলেন: রাধাশ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল। রাই আমাদের হেমবরণী শ্যাম চিকন কালো॥[৯]

ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের বিবাহে শ্রীশ্রীমাকে অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছিল। সহোদরগণের সংসারের যেকোন ব্যাপারেই তাঁহাকে এরূপ পরিশ্রম করিতে হইত। বিবাহের দুইদিন পরে মা নিজের পায়ের ফুলা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, গিরিশবাবু সত্যই বলেচেন,— এরা সব মাথা কেটে তপস্যা করেচে! [বি]

[৭] শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণদেশ হইতে আসেন রামলালদাদা সঙ্গে ছিলেন। রাখাল ছেলেরা ঢিল ছুড়িতেছিল, রামলালদাদার কপালে লাগে। হাওড়ায় গাড়ী হইতে নামিয়া মাকে প্রণাম করিয়া যেমন তিনি ঢিলের কথা বলিলেন, মা বলিয়া উঠিলেন,—রামলাল, গাড়ীতে উঠবার সময় তুমি তো আমাকে প্রণাম কর নি। [বি]

[৮] ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ বনুর জন্ম হয়। [দি]

[৯] কৃষ্ণময়ী দেবী-কথিত।

ভূদেবের যখন বিবাহ হয় (২৪শে বৈশাখ, ১৩২০), তাহার স্ত্রী নিতান্ত বালিকা। বিবাহের দিন কয়েক পরেই শাশুড়ী নূতন বৌকে শাসন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন: ও মেজবৌ, চুপ—চুপ কর্। এলো কি অমনি এসেচে? এলোর বিয়েতে কত বাদ্যি বেজেচে, কত বাজনা বেজেচে! (গম্ভীরভাবে) তুই বকচিস কেন? কত সাধের বউ![10]

এই রঙ্গরসপ্রিয়তা শ্রীশ্রীমার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। পাত্রভেদে অনেক সময় ইহার মধ্য দিয়াই তিনি শিক্ষাদান করিতেন। অক্ষয়কুমার সেন বলিয়াছেন: আমি একদিন মার কাছে গিয়ে বল্লুম, 'মা!' মা বল্লেন, 'হ্যাঁ বাবা।' তখন বল্লুম, মা, আমি বল্লুম —মা, আর তুমি বল্লে—হুঁ, আর কিসের ভয়? মা বল্লেন, না বাবা, অমন কথা বোলো না, যার আছে ভয় তারই হয় জয়। [সু]

মার জ্বর হইয়াছে, একটা বাটিতে প্রায় একসের পরিমাণ দুধসাগু তাহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। মা খানিকটা মাত্র খাইয়া বাটি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, কিগো, আজ যে প্রসাদে ভক্তি নাই? ভক্তেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর গিয়া সেই প্রসাদ ভাগ করিয়া খাইলেন। [উ]

ঘরের ভিতর মা পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন, প্রকাশ মহারাজ গুটিকতক পদ্মফুল হাতে লইয়া প্রণাম করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ফুল চাহিয়া লইয়া প্রবোধবাবু পেছনে পেছনে ঢুকিলেন। প্রকাশ মহারাজ মার পাদপদ্মে ফুল দিয়া প্রার্থনা করিলেন, মা, আমাকে আর ঘুরোবেন না। মা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পাল্লে, আমি একটু ঘুরব নি?

কলিকাতা হইতে মা জয়রামবাটীতে যাইবেন, কিন্তু একের পর অন্যের অসুস্থের জন্য কেবল বাধা পড়িতেছে মা ঠাকুরকে বলিতেছেন, জয়রামবাটী চল, জয়রামবাটীর বড় পুকুরের জল আর তুলসী কি মনে লাগে না তোমার? [ই][11]

শেষোক্ত ঘটনায় শ্রীশ্রীমার আচরণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করিয়া কথা কহিতেছেন। বাস্তবিক, ঠাকুরকে তিনি আমাদের মত ছবিমাত্র দর্শন করিতেন না, সাক্ষাৎ ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁহার মিলন ও কথাবার্তা হইত। কলিকাতায় নিজবাটীতে যখন মা প্রথম শুভাগমন করেন সেই সময়ে ঠাকুরঘরের পাশের ঘর তাঁহার শয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়। তাহা দেখিয়াই মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুরকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? আমাকে ঠাকুরঘরেই দাও। [আ]

---

[10] রোহিণী ঘোষ-কথিত।

[11] জয়রামবাটীতে ফুল অনেক সময়ই বড় একটা পাওয়া যাইত না বলিয়া শ্রীশ্রীমা শুধু তুলসী-পাতা ও জল দিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন। তথায় অবস্থান-কালে মার পূজার ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য শরৎ মহারাজ গণেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়া কোন দিন শিহড়ে, কোন দিন আমোদরতীরে যাইতেন। শিহড়ে কাঞ্চনগাছে ও আমোদরতীরে গুলঞ্চগাছে চড়িয়া গণেন্দ্রনাথ ফুল পাড়িতেন, শরৎ মহারাজ নীচে থাকিয়া কুড়াইতেন। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে মার পূজার ফুল যোগাড় করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত রাত্রি চারিটায় উঠিয়া শিউলিতলায় চাদর বিছাইয়া রাখিতেন। [গ]

মেজমামা কালীকুমার যে জায়গায় বাড়ী করেন পূর্বে তথায় অনেক ফুলের গাছ ছিল; মা তখন নিজহাতে ফুল তুলিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন। [ই]

মহাদেবানন্দ মোটা দুইগাছি গড়ে মালা গাঁথিয়া কোয়ালপাড়া হইতে বিদ্যানন্দের হাতে পাঠাইয়াছেন। মা সেই মালা ঠাকুরকে পরাইয়া কহিলেন, মতিকে বোলো, এত ভারী মালা যেন না দেয়, ঠাকুরকে ভারী লাগবে।

নিবেদিত অন্নাদি ঠাকুর গ্রহণ করেন কিনা তাহাও শ্রীশ্রীমা দেখিতে পাইতেন। যে নৈবেদ্য ঠাকুর গ্রহণ করিলেন না দেখিতেন, তিনি নিজে তাহা খাইতেন না। কতবার সেই অগৃহীত ভোজ্য পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কেশ, মৃত কীট ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, কিংবা উহার অগ্রভাগ অপরে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। জয়রামবাটীতে পেটের অসুখ হওয়ায় লালবিহারী সেন খিচুড়ি খাইতে আপত্তি করেন, তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, একটু খাও, স্বয়ং ঠাকুর খেয়েচেন। লালবিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়? মা বলিলেন, হ্যাঁ; আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিচুড়ি আর ছ না খেতে চান। অসিতানন্দ জগদম্বা-আশ্রমে মাকে বলেন, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন করি, কিন্তু তিনি খান কিনা কিছুই বুঝতে পারি না। মা উত্তর দেন, খান বইকি বাবা, প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন কল্লে নিশ্চয়ই খান, আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদর করে ডাকি তখনই দেখি, গোপাল নূপুর-পায়ে ঝুন্‌ঝুন্ করে এসে হাজির হয় আর আব্দার করে খায়।

শ্রীশ্রীমা বলিতেন, দেবতার চক্ষু হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া নিবেদিত ভোজ্যবস্তু চুষিয়া দেখে বা উহার সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করে; তাঁহার অমৃতস্পর্শে উহা আবার পরিপূর্ণ হয় বলিয়া কমে না। সরল বিশ্বাস ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় নিবেদিত অন্নাদি ঠাকুর স্থূলভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন। স্নেহলতা সেনকে মা বলিয়াছিলেন: এক ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে যাওয়ার সময় নিজের পাগলাটে ছোট ছেলেকে বলিলেন, তুই আজ ঠাকুরের পুজো করিস, ভোগ দিস কেমন, পারবি তো? ছেলে বলিল, হ্যাঁ— খুব পারব। পুজো শেষ হইলে তাহার মা থালায় ভোগ বাড়িয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ছেলেটি দরজা বন্ধ করিয়া জোড়হাতে ঠাকুরকে খাইতে বলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া 'খাও ঠাকুর, খাও ঠাকুর' বলা সত্ত্বেও গোপালঠাকুর কিছুতেই খান না দেখিয়া তাহার রাগ হইল ও লাঠি হাতে করিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর খাবে তো খাও, তা না হলে এই লাঠি দিয়ে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব। তখন ঠাকুর একটি ছোট ছেলের বেশ ধরিয়া মূর্তি হইতে বাহির হইলেন ও আসনে বসিয়া খাইতে লাগিলেন। সমস্ত ভোগ নিঃশেষে ভোজন করিয়া বলিলেন, আমি যে খেয়েচি, কাকেও বলিস নি; বল্লে ভাল হবে না। বলিয়াই মূর্তির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। দরজা খুলিতেই মা প্রশ্ন করিলেন, কিরে, ঠাকুরকে খাইয়েচিস? ছেলে উত্তর করিল, হুঁ, এবার আমাকে খেতে দাও। ব্রাহ্মণী দেখিলেন থালায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। পাগল ছেলে ঠাকুরঘরে বসিয়াই ঠাকুরের ভোগ খাইয়াছে মনে করিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং খানিক পরে ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিতেই সেকথা বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই ঠাকুরকে ভোগ দিয়েচিস ঠাকুরকে খাইয়েচিস? ছেলে বলিল, হ্যাঁ,—খুব ভাল করে খাইয়েচি। ধমক দিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, ঠাকুরকে খাইয়েছিস, না নিজে খেয়েছিস? ছেলে তখন নিরুপায় হইয়া বলিল, না বাবা, আমি খাই নি- ঠাকুর নিজে খেয়েচেন, কাকেও বলতে মানা করেচেন

--মূর্তি থেকে বার হয়ে খেয়ে আবার মূর্তিতে ঢুকে গেছেন। বলিবামাত্র রক্ত বমন করিয়া ছেলেটি মারা গেল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাছে পড়িয়া, আমার একমাত্র ছেলেটিকে নিলে ঠাকুর! বলিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ভগবান যখন আসেন তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়াই আসেন।

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিতেছেন, তাঁহার খুড়ী বলিলেন, সারদা, আবার এসো। মা বলিলেন, আসব বইকি, এবং ঘরের মেজেয় হাত দিয়া বারবার স্পর্শ করিয়া ও সেই হাত বারবার মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। [বি]

শ্রীশ্রীমার খুড়তুতো ভাই সূর্যনারায়ণ কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে দেশে যাইতে-ছিলেন। বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া দেখা গেল, সূর্যনারায়ণ কোন জিনিস ভুলক্রমে কলিকাতায় ফেলিয়া গিয়াছেন। জিনিসটি পরবর্তী গাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে তার করা হইল; মা তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে একাকী রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, সুজ্যি কি আমার পর? [ম]

তন্ময়ানন্দ একবার জয়রামবাটীতে যাইয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন। প্রণাম করিতেই বলিলেন, কামারপুকুরে রামলালের অসুখ, রামময়কে দেখতে পাঠিয়েচি, সে এখনো ফিরে আসে নি—কি জানি অসুখ বেশী হল কিনা!

গয়লাবৌ আহ্লাদিনী ঘোষ শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুরঝি বলিতেন। তিনি কখন কখন মার হাত-পা টিপিয়া বা চুল আঁচড়াইয়া দিতেন। মা খুশী হইয়া বলিতেন, কুসুমের মত আমার মাথাটি আঁচড়ে দিলে বৌ! কুসুমের হাত এমনি ঠাণ্ডা ছিল। গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যখন কলকাতায় থাকি, যোগেন, গোলাপ, শরৎ—এদের কাছে বারো বছরের বহুড়ীর মত ভয়ে ভয়ে থাকি।

শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলেরই ঘরের সংবাদ রাখিতেন ও অসময়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাহারা জানিত, মার কাছে আসিয়া জানাইতে পারিলেই তাহারা শোকে সান্ত্বনা পাইবে, রোগে তাহাদের ঔষধপথ্যেরও ব্যবস্থা হইবে। তাহারা একাধিকবার দেখিয়াছিল, তিনি গ্রামে থাকিতে অন্যত্র দুর্ভিক্ষ হইলেও তথায় অন্নাভাব হয় না; তাঁহার উপস্থিতিতে অনাবৃষ্টি দূর হইয়া যায়। একবৎসর বাঁকুড়ার রিলিফ-কার্য হইতে আসিয়া বরদানন্দ লোকের অন্নাভাবজনিত দুর্গতি বর্ণনা করিতে থাকিলে মা চারিদিকে হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাবা, মা-সিংহবাহিনীর কৃপায় এইটুকুর মধ্যে ওসব কিছু নাই; বাঁকুড়াবাসীর চারপো হয়েচে, ভাগ্যবান তারা যে, ঠাকুর তাদের শাস্তি ক্ষয় করিয়ে দিচ্ছেন। বরদানন্দ কহিলেন, মা, আপনি আছেন বলেই এখানে কিছু নাই, সিংহবাহিনী তো বুঝি না। মা একথার উত্তর দিলেন না।

শ্রীশ্রীমার প্রভাব নিত্য দর্শন করিয়াও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কিছুতেই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তিনি চিরকাল তাহাদের মাসী পিসী দিদি ইত্যাদি থাকিয়া

গিয়াছেন।[১২] একদিন গ্রামের কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূরদেশ থেকে আসচে। আমরা তোমাকে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না কেন? মা বলিলেন, তা নাই বা বুঝলে, তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী। [সু] প্রবীণবয়স্ক চৌকিদার অম্বিকাচরণ বাগ্‌দি একদা মাকে বলিয়াছিল, লোকে তোমাকে দেবী, ভগবতী কত কী বলে; আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। মা উত্তর দেন, তোমার বুঝে দরকার নাই; তুমি আমার অম্বিকে-দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন। সীতাবিজয়া দশমীর দিন দেখা যাইত, সন্ধ্যা হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে, আর তিনি সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া সকলকেই আশীর্বাদ করিতেছেন। ভিন্নগ্রামবাসী হইলেও প্রতিমাশিল্পী কুঞ্জমিস্ত্রীকে মা কুঞ্জকাকা সম্বোধনে বহু আদরযত্নে আপ্যায়িত করিতেন। [স]

দেশ-বিদেশের সংবাদ শ্রীশ্রীমা নানাস্থান হইতে আগত সন্তানদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন; কখন বা পত্রিকা পড়াইয়া শুনিতেন। মহাযুদ্ধের সময় অনেকদিন পত্রিকা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। নারীদের বা দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের লাঞ্ছনার কথা শুনিলে তিনি বিচলিত হইতেন।[১৩]

---

[১২] স্বরূপ-গোপনের সহজ প্রবৃত্তিই শ্রীশ্রীমাকে পরিজন ও প্রতিবেশিগণের নিকট দুর্জ্ঞেয় করিয়াছিল।

একবৎসর জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সেজ মামা বরদাপ্রসাদ যখন অন্ন পরিবেষণ করিতেছিলেন, আশুতোষ মিত্র তাঁহার কপালে হোমের ফোঁটা দেন। আহারের পর গ্রামের মুখ্য যোগেন্দ্র বিশ্বাস বলিলেন, উইলসনের হোটেলে খাওয়া হল! আর কি জাতফাত রইল? ইহা লইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে এবং স্থির হয়, মাকে ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। সেই টাকা দিয়া তাহারা যাত্রাগান শুনিয়াছিল। মার কাছে সহজেই আদায় করিতে পারা যায় দেখিয়া যেকোন ছলছুতা ধরিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করা হইত আর মা আন্দোলনকারীদিগকে টাকা-পয়সা, গরদের কাপড় ইত্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন॥ একদিন বলিয়াছিলেন, আমি এসব সহ্য কচ্চি, আমার ছেলেরা করবে না। শ্রীশ্রীমা যখন জগদম্বা আশ্রমে ছিলেন, সেবকরা জয়রামবাটীতে ঠাকুরের উৎসব করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের হাতে পাঁচটি টাকা দেন। উৎসবে কীর্তন, বাদ্যভাণ্ড ও প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, আমি থাকতে থাকতে এত জাঁকজমক কেন রে বাপু? আমাকে মন্তে তর্ দে।

[১৩] প্রথম মহাযুদ্ধ চলিবার সময় সুরমা দেবী দেশের পরাধীনতাজনিত দুর্গতি, অত্যাচার, শোষণ, দুর্ভিক্ষ, বিধবার অশ্রু ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করেন। মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুর যখনই আসেন তখনই এরূপ হয়ে থাকে। আরো কত কী হবে—ওদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নারীর আদর্শ

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনী সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহাতে পারিবারিক সম্পর্কের চারিটি প্রধান অভিব্যক্তিই দৃষ্ট হয়,— সেবাপরা কন্যা, স্নেহশীলা ভগিনী, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী ও সন্তানবৎসলা জননী। কন্যা, ভগিনী, জায়া ও জননী নারীজীবনের এই চারিটিই মুখ্য প্রকাশ। নারীমাত্রেই এই সম্পর্কগুলির কোন না-কোনটির দ্বারা অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকেন। অন্যান্য বিশিষ্ট সম্পর্ক এই মুখ্য সম্পর্কগুলির অবান্তর ভেদমাত্র এবং এইগুলি হইতেই কল্পিত হইয়াছে।

দরিদ্র অথচ ভক্ত মাতাপিতার সংসারে শ্রীমতী সারদা জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে সামর্থ্যানুযায়ী কাজকর্ম করিতে হইয়াছে, আর তিনি সানন্দে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া জননী ও জনকের শ্রম-লাঘব করিয়াছেন। পিতৃবিয়োগের পর যখন সংসারে অভাব দেখা দিয়াছিল, তিনি পরিবারস্থ লোকের অন্নের সংস্থান করিতে জননীকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছেন। জননীকে তিনি কাশী-বৃন্দাবন ও পুরী-তীর্থ করাইয়াছিলেন; অবিবাহিত জরাগ্রস্ত খুল্লতাতকে আমৃত্যু পরিচর্যা করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মাতাপিতার গুণাবলী তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে কীর্তন করিতেন।

সহোদরদিগকে তিনি কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পড়াইয়া উপযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অনাথা পত্নী ও কন্যার সমগ্র ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নিয়াছিলেন। অন্যান্য ভাইদের সংসারেও তিনি সকলের জন্য আজীবন খাটিয়াছেন, অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

দরিদ্র মাতাপিতার বা ভ্রাতৃগণের বৃহৎ সংসারে আজীবন কর্মনিরতা কন্যা বা ভগিনীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কিন্তু যাহাদিগকে ঐরূপ পরিশ্রম করিতে হয় তাহারা প্রায়শঃ অবস্থার অধীন হইয়াই উহা করে এবং করিতে করিতে বা করিবার পরে শত বার অনুযোগ করে, কিংবা অন্যের কাছে উহা কীর্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে, দেখা যায়। তাহাদের অন্তর প্রতিদান-লিপ্সাবর্জিত নহে। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনালোচনায় স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কন্যা ও ভগিনীরূপে তাঁহার কার্য ঐজাতীয় কন্যা ও ভগিনীগণের কার্য হইতে স্বতন্ত্র। সকল সময়ে তিনি অবস্থাধীন হইয়াই চালিত হন নাই; কর্তব্যবোধে বা হৃদয়ের প্রেরণাতেই কাজ করিয়াছেন, আর ঐরূপ করিবার জন্য জীবনে একটিবারও অনুযোগ বা আত্মশ্লাঘা-কীর্তন করেন নাই।

তাঁহার পাতিব্রত্য জগতে অনুপমেয়। অল্প কথায় ইহার আভাসও দেওয়া চলে না। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে এই চিরসীমন্তিনীর পাতিব্রত্যের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টামাত্র হইয়াছে। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে মাতৃবৎ এবং ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে ও ঠাকুরে বাৎসল্যরতিসম্পন্না গোপালের মাকে শ্বশ্রূবৎ সম্মান ও সেবা করিয়াছেন। একদিন রাত্রিতে ঠাকুরের বাল্যসহপাঠী

কামারপুকুরের বৃদ্ধ গণেশ ঘোষাল মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটীতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বৃদ্ধ 'সে কী, সে কী, আমার মা, আমার মা, এতে অকল্যাণ হয় আমার'—এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। [আ]

তাঁহার মাতৃত্ব তাঁহার অন্যান্য ভাবকে ছাপাইয়া লোক-সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছে। দেহসম্পর্কে জননী না হইয়াও সহস্র পুত্রকন্যার হৃদয়ের ভক্তিসিক্ত মা-ডাক শ্রবণ আর কোনও ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে ইতঃপূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ঠাকুরের সম্পর্কে তিনি যেমন নিত্যসীমন্তিনী, ঠাকুরের ভক্তসংসারের অগণিত পুত্রকন্যার সম্পর্কে তেমনি নিত্যজননী।

নারী বা পুরুষ মাত্রেরই বিশেষসম্বন্ধহীন মানব-সাধারণের সঙ্গে একটা শান্ত-ভাবের সম্পর্ক অল্পাধিক বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে জগতের এক অনুন্নত অখ্যাত কোণে নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে বাস করিয়াও শ্রীশ্রীসারদা দেবী মানুষের প্রগতিমূলক কার্যমাত্রে যেরূপ প্রেরণা দিতেন, তাহার তৃপ্তিতে হর্ষপ্রকাশ ও দুঃখে দুঃখানুভব করিতেন তাহাতে মানবসাধারণের সঙ্গে তাঁহার যোগ যে কিরূপ নিবিড় ও গভীরতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অনেক বিদুষী মহিলা কেবল শিক্ষা দ্বারা এমন অবস্থা লাভ করেন যাহাতে সুশিক্ষিত ও মার্জিত-সমাজভুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আর্যাবর্তবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসী, পুরুষ ও নারী সকলের সহিতই সমভাবে মিশিতে পারেন। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি উদার অধ্যাত্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহা হইলে ঐসকল মহিলারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সকলের সহিত সমভাবে মিশিতে বা সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারেন না। আক্ষরিক শিক্ষায় অনেকটা বঞ্চিতা হইলেও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর উদার অধ্যাত্ম শিক্ষার চরম ফল 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধা' ছিল বলিয়া তিনি এই বিষয়েও শিক্ষিত নারীগণের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যবাসী নরনারীর সঙ্গে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সকলপ্রকার কল্যাণভাব-সমন্বিত শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনের মহোচ্চ আদর্শ অন্ধকারে আলোকস্তম্ভের ন্যায় জগতের নারীসমাজকে পথ প্রদর্শন করিতেছে। আন্তরিকতার সহিত সেই পথ অনুসরণ করার উপরেই যে ভবিষ্যৎ মানবজাতির কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আর ভোগৈকলক্ষ্য জটিলতাময় বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষে তথাকথিত প্রগতির ফলে ও অর্থনৈতিক কারণে আজ ভারতীয় নারীর জীবন যতই সমস্যাময় হইয়া উঠুক না কেন, শ্রীশ্রীমার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়াই একদিন তাহাকে আত্মস্থ হইতে হইবে।

অতঃপর আমরা শ্রীশ্রীমার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে, ক্ষুদ্রবৃহৎ ব্যাপারে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত অথবা স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, যথাজ্ঞান তাহার উল্লেখ করিব।

বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ না পাইলেও শ্রীশ্রীমা অধ্যবসায়-বলে পড়িতে শিখিয়া-ছিলেন ও অবসর সময়ে রামায়ণাদি পুস্তক পড়িতেন। তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে

সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ; তাহাদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ পড়াইয়া শুনিতেন, চিঠিপত্র লিখাইতেন। উচ্চ আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নশীল বিদুষী মহিলারা তাঁহার স্নেহের পাত্রী ছিলেন।[১]

সূচিকর্মাদি শিল্পকার্যে শ্রীশ্রীমা উৎসাহ দিতেন ; নিজের প্রয়োজনীয় সেলাইয়ের কাজ স্বহস্তে করিতেন। তাঁহাকে দিবার বা দেখাইবার জন্য কেহ কোন সূচিশিল্প আসন, দেবতার প্রতিকৃতি ইত্যাদি লইয়া গেলে তিনি আনন্দিত হইতেন আর প্রশংসা করিয়া সকলকে দেখাইতেন। প্রফুল্লমুখী বসু কার্পেটে উলের মন্দির তৈয়ার করিয়াছিলেন ; তাহাতে ঠাকুরের, মার ও স্বামিজীর সাতখানি ফটো বসানো ছিল। মা উহা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, পূর্ববঙ্গের মেয়েরা বড় গুণী, বড় ভক্ত। কী চমৎকার সব তারা তৈরি করে—বড় ভক্ত, বড় গুণী।

পরিধের বস্ত্রাদির বাহুল্য শ্রীশ্রীমা পছন্দ করিতেন না ; ভক্তগণের আনীত কাপড়ের প্রায় সমস্তই সাধু, ভক্ত ও স্বজনগণকে বিলাইয়া দিতেন। তিনি সেমিজ বা জামা পরিতেন না। একবার শীতে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে জামা পরিতে সম্মত করা হয়। গণেন্দ্রনাথ দশটাকা দিয়া একটি সিল্কের গেঞ্জি কিনিয়া আনিলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া গায়ে দিলেন এবং তিনদিন ব্যবহার করিবার পর কহিলেন, বাবা, আমি তো তিনদিন পরলুম ; মেয়েমানুষ জামা পরলে লোকে কী বলবে ? এখন থাক্, দেশে গিয়ে পরব।

শ্রীশ্রীমা সঙ্গীত ভালবাসিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন, কখন কখন পুরুষদের অসাক্ষাতে মৃদু গলায় গানও গাহিতেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গাহিতে শুনিয়া ঠাকুর উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জয়রামবাটীতে গিরিশবাবু সকলের অনুরোধে দুইখানি স্বরচিত গান গাহেন। একবারমাত্র শুনিয়াই মা গান দুইটি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন ; কোন ভক্তসন্তানের পীড়াপীড়িতে একটি গানের কিয়দংশ গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।[২] [আ] বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন দোতলার ঘরে বা ঠাকুরঘরের দোতলার বারান্দায় বসিয়া তিনি একমনে কালীকীর্তন শুনিতেন। ভক্তদিগকে গাহিতে শুনিয়া কোন গান বিশেষ পছন্দ হইলে লিখাইয়া রাখিতেন।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে আছে, তিনি বলিতেছেন : মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশবাইশ বছর বয়স, বিয়ে হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেচে। আর আমাদের ? এখানে পোড়া দেশের লোকে আট বছর হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।' মাদ্রাজের যে দুইজন মেয়ের মা প্রশংসা করিয়াছিলেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এগারো কিংবা বারো বছরের কোন কুমারীর অভিভাবককে মা বলিয়াছেন,

---

[১] কোয়ালপাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : এদেশের মেয়েরা সব পশুর মত দেখচি। আমার একএক সময় ইচ্ছা হয় এদের শিখাবার ব্যবস্থা করি ; কিন্তু করি কী করে ? শিখাবার লোক আনতে গেলে পূর্ববঙ্গ থেকে আনতে হয় ; তাতে হিতে বিপরীত ফল হবে। মানুষের স্বভাব এই যে, তারা মন্দটা আগে শিখে। তাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে সে সব নিতে পারবে না, বাবুয়ানাটি আগে নেবে আহা, এদেশের মেয়ে সেরকম শিক্ষিত হয়। [প্র]

[২] 'হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।'

আর বড় করা ভালো নয়, এবার বিয়ের চেণ্টা দেখ। নিজের পালিতা কন্যাকেও তিনি ঐরূপ বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। জোর করিয়া কন্যাকে অবিবাহিত রাখার পরিণাম সম্বন্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবৃত্তি সংযত রাখিয়া কাজকর্ম শিখিয়া সদ্ভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে যাহারা সমর্থ তাহাদের চিরকৌমার্য তাঁহার অনভিমত ছিল না; জোর করিয়া তাহাদিগকে সংসারী করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

এদেশে বিধবারা ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেন, প্রচলিত বিধান মানিয়া দিন-বিশেষে নির্জলা উপবাসও করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা শরীরধ্বংসকারী কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহাকে কখনও নিরম্বু উপবাস করিতে দেখা যায় নাই। শিবরাত্রির দিনও তিনি ঠাকুরের প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করিতেন।[৩] একাদশীর দিন ভাত না খাইয়া লুচি খাইতেন; তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, 'খেয়ে দেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ভগবানকে ডাক। না করবে চুরি, না করবে দারী, খাওয়াদাওয়ায় কিছু দোষ নাই।' [ই] বালবিধবা শবাসনা দেবী একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে চাহিলে মা বলিয়াছিলেন, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কী হবে? আমি বলচি, তুই জল খা।[৪] বিধবা হইয়া সুরবালা বাকি জীবন হবিষ্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা বলিয়াছেন, আত্মা যদি কোন কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে দোষ হয়, অপরাধ হয়; আত্মা কাঁদে— আমাকে দিলে না বলে। [ই]

সধবার বেশে থাকিলেও শ্রীশ্রীমা মৎস্যাহার করিতেন না। তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয় অন্ধ কাকা, ভজনানন্দের সাক্ষাতে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন: ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, বেদাচার মেনে চলো, লোকাচার মেনে চলো না। আমি মাছ খাই না কেন, আমার জ্ঞানী ছেলেরা সেকথা বলতে পারে বটে, কিন্তু আমাকে সমাজে ভাইদের সঙ্গে থাকতে হয়; আমি যদি মাছ খাই, এদের উপর অত্যাচার হবে। কালীঘাটে মা-কালীর প্রসাদ পাইতে বসিয়া একটু চচ্চড়ি মুখে করিয়াই মা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে মাছের মুড়ো দেওয়া আছে। তিনি চচ্চড়ির বাটিটা সরাইয়া রাখিলেন, কিন্তু হাত বা মুখ ধুইলেন না। [গ] শেষবার অসুখের সময় মাকে মাগুর মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছিল; তিনদিন খাওয়ার পর আর খাইতে অসম্মত হন।

বালবিধবা প্রমীলা বসুকে প্রথম সাক্ষাতের দিন শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'সতী হও মা।' আর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, বেশ ঠাণ্ডা মেয়েটি, অবীরা বিধবা অনেকদিন বাঁচতে হবে; ওকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে যেয়ো না।

স্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হইয়াও চিরকাল শ্রীশ্রীমা বাহিরের পুরুষমানুষের কাছে অবগুণ্ঠনবতী থাকিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। বাহিরের পুরুষেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইয়া তাঁহার চরণদ্বয় ব্যতীত আর কোন অঙ্গই দেখিতে পায় নাই। ঠাকুরের

[৩] একবার শ্রীঅন্নপূর্ণাপূজায় কিরণবাবুদের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—অন্নপ্রসাদ না খেলে আমার শরীর ভাল থাকে না, তোমরা সেদিন ঠাকুরকে অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা করবে।

[৪] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: লক্ষ্মীর একাদশী শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে; আর থান ধুতি যেন রাক্ষসে বেশ। [নি]

সময়কার যেসকল ত্যাগী বা গৃহী ভক্তের সম্মুখে আসিতে তিনি পূর্ব হইতে অভ্যস্ত ছিলেন না তাঁহাদের নিকটেও চিরকাল অবগুণ্ঠনবতীই থাকিয়া গিয়াছেন; ঐশ্বরিক ভাবের আবেশে কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের ভক্ত যাঁহারা তাঁহাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া মাতৃদর্শনে আসিতেন, বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রদীক্ষিত সন্তান তাঁহাদের সম্মুখে তিনি অবগুণ্ঠনবতী থাকেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা আপনি কি সকলের সামনে বের হন না? মা বলিলেন, বাবা, যাদের মনে পুরুষভাব প্রবল, আমি কেবল তাদের সামনে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না।

কলিকাতায় একদিন সুরেনবাবু ও তাঁহার পরিবারের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা কথা কহিতে-ছিলেন এমন সময়ে একটি তরুণ যুবক প্রণাম করিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই মা ঘোমটা টানিয়া দিলেন এবং সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তুমি এখন এস—দেখচ না, বৌমা এখানে রয়েচে? সুরেন্দ্র রায় মেসে বসিয়া সঙ্গীদের সাথে কখন কখন মার কথা আলাপ করিতেন। একদিন মা তাঁহাকে বলিলেন, মেসে বসে মেয়েলোকের কথা আলাপ করিস কেন? পীতাম্বর নাথ তৈলচিত্র আঁকিতে পারিতেন; মার তৈলচিত্র বিক্রয় করিয়া অর্থার্জন করার বাসনা তাঁহার মনে ছিল। মা তাহাকে বলিয়াছিলেনঃ তুমি নাকি বাছা, ছবি আঁকতে পার--আমার ছবি আঁকতে ইচ্ছা করেচ? তা আঁক, কিন্তু তোমার মায়ের ছবি এঁকে বাজারে বিক্রী কোরো না। তোমার মায়ের ছবি বাজারের লোকে দেখে এমন ইচ্ছা থাকাটাও তোমার উচিত নয়।

চালচলনে ও আচরণে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জ ভাব শ্রীশ্রীমা কোন কালে সমর্থন করেন নাই। ভাইঝি নলিনীকে লোকসমক্ষে গঙ্গার এক-বুক জলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে দেখিয়া এবং রাধুকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠাইয়া বসিতে দেখিয়া তিনি তিরস্কার করিয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে মা কোন ভক্তবধূকে বলিয়াছিলেনঃ বৌমা, নাই বা স্নান কত্তে গেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবে গায়; পুরুষগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, যেন তাদের সমাধি হয়ে গায়! (বি)

একটা বয়স পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে ও মেলামেশায় স্ত্রীলোককে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, মন্দচরিত্র স্ত্রীলোক হইতেও দূরে থাকিতে হয়। আপন ভাইপো রামলালকেও ঠাকুর এক সময়ে মার কাছে বেশী যাইতে দিতেন না। পূর্বজীবনে বেশ্যা এক বৃদ্ধা শেষ জীবনে হরিনাম করিত; সে কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বসিয়া হরিকথা আলাপ করিত। একদিন ঠাকুর দেখিতে পাইয়া ঐরূপ লোকের সঙ্গে কথা কহিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন আর সেকথা উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, ঠাকুর এত করে আমাকে রক্ষে কত্তেন। কোয়ালপাড়ায় দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কমলা ঘোষ অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, অমুকের মেয়েকে বার করে নিয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়া আলোচনা চলিয়াছে, পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়াই মা কমলাকে ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, বৌমা, ওখানে কী কচ্চ?

আপন পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জননী তাহার সঙ্গে বাৎসল্যসুলভ মাখামাখি পরিত্যাগ করেন। ইহাতে বাৎসল্যের অভাব বুঝায় না। বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলেন,

মা, আপনি রাখুকে ভালবাসেন, আমাদের ভালবাসেন না। মা ঈষৎ হাসিয়া করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর দেন, সত্যিই তোমাদের ভালবাসি। 'তা হলে এমন করে দিন যাতে ষোল আনা মন আপনার দিকেই যায়।' তাঁহার এই প্রার্থনার উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, বাবা, এ যে মানুষের ছাল।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় আছে, কোন শিষ্যাকে শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন : পুরুষ-জাতকে কখনো বিশ্বাস কোরো না—অপরের কথা কী, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না; এমনকি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না। যাহাকে মা ঐরূপে সাবধান করিয়াছিলেন তিনি প্রথম-বয়সে বিধবা, রূপবতী, স্বামী-পরিত্যক্ত বহু সম্পত্তির অধিকারিণী। ঐরূপ অবস্থাপন্ন অবলার যে পিতা বা সহোদরের নিকট হইতেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ যদি নিজের অতৃপ্ত বাসনার প্রাবল্য থাকে, বাস্তব জগতের ঘটনা ইহা অস্বীকার করে না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই যে মার এই সাবধান-বাণী তাহা ঐ শিষ্যার প্রতি অন্যান্য উপদেশ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। মা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'দেখো যেন আমায় ডুবিয়ো না, শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়।' 'কারো সঙ্গে মিশবে না, কোন কিছুতেই থাকবে না।' 'ঘড়ীর কাঁটার মতন ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।' আবার, 'ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে আসেন' ইত্যাদি কথায় পরম পুরুষ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন অভিপ্রেত নহে। এই শিষ্যাকেই মা পুরুষদেহ ঠাকুরের সেবা-পূজা-ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পুরুষ মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপ করিয়া ও নিকটতরভাবে মেলামেশা করিতে গিয়া প্রবৃত্তির ছলনায় অনেক নারী যে প্রতারিতা হন, তাঁহাদের বাৎসল্য যে 'তাচ্ছল্যে' রূপান্তরিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পুরুষভক্তকেও মা বলিয়াছেন, মেয়েমানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না, মেয়েমানুষ সব কত্তে পারে। [অ]

নববধূ অমিয়বালা মহারাজকে দর্শন করিতে যাইবেন কিনা একথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, রাখালকে দেখবে না? রাখালকে দেখে মানবজন্ম সার্থক করুক।

স্বভাবতঃ সতীলক্ষ্মী, কিংবা সাংসারিক কামনায় উদাসীন, দেবচরিত্রা নারীর দর্শনে মানুষের মন পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়, শ্রদ্ধায় অবনত হয়। সর্বাবস্থায় তাঁহারা নিজেদের মহিমাতেই নিজেরা সুরক্ষিত থাকেন এবং একটা পবিত্রতাময় পরিবেশ রচনা করিয়া সংসারে বিচরণ করেন। সভ্যসমাজে তাঁহাদের প্রতিপদে সাবধান থাকিবার প্রয়োজন হয় না। আদর্শ-রক্ষার খাতিরে লোকাচার মান্য করিয়া চলা কর্তব্য হইলেও দেশকাল-পাত্রভেদে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে ও হইয়া থাকে। পুরুষভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন শুনিয়া সুখবালা ঘোষ অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেখান হইতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মা বলিয়াছিলেন, তোমাকে যেতে হবে না, তুমি থাক। তেমনি আবার মা তাঁহার কোন যুবক-সন্তান সম্বন্ধে স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা এর কাছে কোন সঙ্কোচলজ্জা কোরো না; একে তোমাদেরই একজন মনে করবে।

নরনারীর পরস্পর মেলামেশার সমস্যা আজিকার জগতে, বিশেষতঃ ভারতে, অন্যতম প্রধান সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণজাত অবাধ মেলামেশা ও তথাকথিত স্ত্রী-

স্বাধীনতা যে ভারতের ধর্মভিত্তিক সভ্যতার পরিপন্থী এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে উহাকে সমূলে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীশ্রীমার জীবনে কিংবা উপদেশে এই জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় না।

দুর্বলতাময় মানুষের জীবনে, প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে নৈতিক বিচ্যুতি সহজেই ঘটিতে পারে। উহা পুরুষের বেলায় যেমন, নারীর বেলায়ও তেমনি ঘটে, আর সামাজিক দৃষ্টিতে উভয়স্থলেই নিন্দার্হ বিবেচিত হয়। তথাপি সমষ্টি-সমাজের উচ্চতম আদর্শের রক্ষা ও অভিব্যক্তির বিশেষভাবে পরিপন্থী বলিয়াই বোধ হয়, পুরুষ অপেক্ষা নারীর নৈতিক বিচ্যুতি অধিকতর দূষণীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। কোন ভক্তের সাময়িক বিচ্যুতির কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: কী ই বা হয়েচে? বেটাছেলে, মেয়ে তো নয়? মেয়েদের হলে দোষ। বেটাছেলের অমন হয়, কত বড় বড় মহর্ষি পড়ে গেল।

নারীর নৈতিক বিচ্যুতি দোষের বলিয়া মন্তব্য করিলেও শ্রীশ্রীমা পতিতার প্রতি অকরুণ ছিলেন না। যেমন পাপকর্ম করিয়া অনুতপ্ত পুরুষকে, তেমনি অনুতপ্তা নারীকেও তিনি সমভাবে শ্রীপদে স্থান দিয়াছেন। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'শ্রীম' বলিয়াছিলেন: হাঁড়ির ভাত একটি টিপলেই বুঝতে পারা যায় হয়েচে কিনা। মা-ঠাকরুণের একটি কথাতেই বুঝতে পারা যায় তিনি কে ছিলেন। তাঁর কাছে বেশ্যারা আসত বলে সাধুরা তাদের বারণ করেছিল। মা শুনে বলেছিলেন,—ওদের যদি আসতে না দাও আমি এখানে থাকব না, ঠাকুর কি এবার শুধু রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?

শ্রীশ্রীমা সকলকেই, বিশেষভাবে স্ত্রীলোককে, কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। সর্বদা কর্মে লিপ্ত থাকিলে মনের সমতা রক্ষিত হয়, আর কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন কাটে। রাজলক্ষ্মী দেবীকে মা বলিয়াছেন: মেয়েমানুষের কাজই লক্ষ্মী। আমার মা বলতেন, যে খুব ভাল করে রেঁধেবেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণা অচলা হয়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, তাই বুঝি মা তুমি এসেছিলে তাঁর ঘরে? মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, আমি কে মা, ঠাকুরই সব।

স্বামীর দুশ্চরিত্র ও দুর্ব্যবহারের জন্য পতিনিষ্ঠ থাকিয়া জীবন-যাপন অনেক সুচরিতা নারীর পক্ষেও অসম্ভব হইয়া ওঠে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন কোন স্ত্রীলোককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, তোদের মানুষ-স্বামী। দুটি পেটের ভাতের জন্যে তো? এখানে কি দুটি ভাত মিলে না? পতি কর্তৃক নিপীড়িতা অথবা পরিত্যক্তা, বালবিধবা এবং কোন কারণে যাহার বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এরূপ কুমারী—ইহারা সকলেই যাহাতে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে এবং মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় করিতে পারে সেই দিকে মার লক্ষ্য ছিল, যত্ন ছিল এবং তিনি সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লমুখী বসু লিখিয়াছেন: ১৩২১ সালে দেবীর বোধনের দিন শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। মা আমাকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। জানি না কেন তখন আমার সমস্ত প্রাণ আকুল করিয়া চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। তখন

আমাকে বিধবা বলিয়া চেনা সহজ ছিল না চওড়া পাড়ের শাড়ী, গহনা সবই পরা ছিল। মা কিন্তু প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোর স্বামী নাই? আশৈশব সকলের আদরে পালিত হইয়াছি, তথাপি আমার মনে হইয়াছিল অমন স্নেহমাখা কথা কখনও শুনি নাই। চেষ্টা করিয়াও একটি কথা কহিতে পারিলাম না। মা আস্তে আস্তে বলিলেন: ভয় কী মা, তোমাদের ঠাকুর আছেন; তিনি দেখবেন তিনিই তোমাদের শান্তি দেবেন, আনন্দ দেবেন। তোমাদের দ্বারা তিনি অনেক কাজ করাবেন। কোন ভয় নাই মা, কোন ভাবনা নাই মা।

প্রমীলাবালা বসু লিখিয়াছেন: শ্রীশ্রীমা যখন ৺কাশীতে ছিলেন আমি জব্বলপুর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। একদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে এখানে এলে, টাকাপয়সা কোথা থেকে পেলে? আমি বলিলাম, আমি ভাইদের সংসারে খরচ-পত্র করি তা থেকে মাঝে মাঝে কিছু বাঁচে। মা বলিলেন, ভাইরা নিজেদের সংসারের মত টাকা দেয়, তা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা আর কোরো না, তা হলে আরো সংসারে আসক্তি বেড়ে যাবে, তাদের খরচার টাকা থেকে বাঁচালে তাদের বঞ্চিত করা হয়। আমার ভগিনীর একটি কন্যাকে প্রতিপালন করিতেছি জানিয়া মা কহিলেন, আমাকে দেখেও কি তোমার চৈতন্য হল না? আমি রাধুকে নিয়ে কী কষ্টে পড়েছি তা তো দেখছ।

পতিব্রতা নারীর জীবন সংসারে সর্বমঙ্গলের আকাবস্বরূপ। 'তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'- শ্রীবিবেকানন্দের স্বহস্তলিখিত এই বাক্যে যে তিনজন মহীয়সী নারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই পাতিব্রত্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনৈক ভক্ত একসময়ে মনকে ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মে সর্ববিষয়ে তাঁহার মুখাপেক্ষিণী পত্নীই ইহার প্রধান বিঘ্নস্বরূপ। স্ত্রীর সর্বদা 'ঠেস্ দিয়া থাকা'র ভাবটি দূর করিবার জন্য তিনি নানা উপায়ে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই বুঝিলেন না দেখিয়া একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তুমি আমাকে চাও, না ভগবানকে চাও? স্ত্রী নিরুত্তর হইলেন এবং মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। মা সস্নেহে কহিলেন, কেন মা, তুমি কেন বলতে পার নি? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না, আমি তোমাকেই চাই।

অশেষবিধ কষ্টের মধ্যেও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া যাহারা পতির সেবায় অবহিতা ও পতিতে অনুরক্ত তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমা বিশেষ স্নেহ করিতেন, অযাচিতভাবে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, আদর্শে অবিচলিত থাকিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। অশ্রুমতী সেনকে বলিয়াছিলেন, স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজঅট্টালিকা। আর তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো; দুজনে যেখানেই থাক সেখানেই রামরাজ্য।

পীতাম্বর নাথ বলেন: আমার শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক। তিনি কৌশলে নিজের মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইতে না পারিয়া নানাপ্রকারে আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে থাকেন। অতিষ্ঠ হইয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহার কন্যাকে নিয়া আর সংসার করিব না। কোন নারী-আশ্রমে রাখিয়া দিবার জন্য স্ত্রীকে নিয়া কলিকাতায় আসিলাম ও গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম।

স্নান করিয়া যেমন গঙ্গায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইব, দেখিলাম পাশের ঘাটে শ্রীশ্রীমা স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতেছেন। পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় না দিয়া মার পাদপদ্মে দিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, এখানে নয় বাছা, লোকে কী মনে করবে? ঘরে এস। স্ত্রীকে ঘাটে বসাইয়া রাখিয়া মার বাড়ীতে গেলাম। প্রণাম করিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে আর কে আছে? আমি বলিলাম, স্ত্রী। মা বলিলেন, তাকে কেন আন নি। যাও, এখুনি নিয়ে এস। মার কাছে স্ত্রীকে পেঁছাইয়া দিয়া তাঁহার আদেশে নীচে নামিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে উপরে যাইয়া দেখি, স্ত্রী তাঁর চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে আর মা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। আমাকে বলিলেন ওর কোন দোষ নাই, ও আমাকে সব বলেচে। তুমিও জান না, ওর বাবা তোমাকে মারবার জন্যে কী ষড়যন্ত্রই না করেছিল, ও তা কত্তে দেয় নি। তোমার ধর্মপত্নী, ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সংসার কর। তারপরে স্ত্রীকে বলিলেন, দেখ মা, স্ত্রীর কাছে স্বামী সকলের চেয়ে বড়, তুমি তার সেবা কোরো। পুনরায় আমাকে বলিলেন ও যদি তোমার কাছে কোন দোষ করে, তুমি নিজে তার বিচার না করে আমাকে জানাবে।

গার্হস্থ্য-জীবন শত ঝঞ্ঝাটে পূর্ণ। কিন্তু ইহার মধ্যেই কোনরূপে একটু অবসর করিয়া লইয়া যে ভগবানকে ডাকিতে পারে ভগবান তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সুগন্ধা দেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ যারা সংসারে একধারে স্বামী আর একধারে ছেলে নিয়ে থেকে, তাদের সেবা করেও ঠাকুরকে ডাকতে পারে তারা নিশ্চয়ই ঠাকুরকে পাবে—তাদের বরং শীঘ্র হবে। কমলা ঘোষকে বলিয়াছিলেনঃ কারো কাছে কিছু চেয়ো না—বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। লোকের দেওয়া জিনিস কি থাকে গো? ঠাকুর যখন দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না, ঠাকুরের দেওয়া জিনিস ফুরতে জানে না। যে চায় সে পায় না, যে চায় না সে সব পায়। তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ো না।

ছোটবড় সকল কাজেই শ্রীশ্রীমা স্ত্রীলোকের শিষ্টাচার মান্য করিয়া চলিতেন। বিভূতিবাবু বলেনঃ কোয়ালপাড়ায় একদিন মা মঠ হইতে জগদম্বা-আশ্রমে যাইবেন; আমি পেছনে যাইতেছিলাম, বলিলেন, আগে যাও। তিনি পেছনে পেছনে আসিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে একদিন মা গাড়ী হইতে নামিবেন; ডান পা বাড়াইয়াছেন মাত্র, অমনি সংশোধন করিয়া লইলেন—ডান পা পিছাইয়া দিয়া বাম পা বাড়াইলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

গৃহীর আদর্শ

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও শ্রীশ্রীমার জীবন একই ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত হইলেও দুইয়ের বাহ্য অভিব্যক্তিতে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ঠাকুরের জীবন সন্ন্যাসভাব-প্রধান ; মার জীবন গার্হস্থ্যভাব-প্রধান। প্রমাণস্বরূপ ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লিখিত হইতে পারে ঃ

(১) ঠাকুর পরিণত জীবনের অধিকাংশ সময় আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে দেবমন্দিরে অতিবাহিত করিয়াছেন ; মা জীবনের অধিকাংশ সময় আত্মীয়স্বজনকে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিয়াছেন ;

(২) মুদ্রাস্পর্শে ঠাকুরের হাত বাঁকিয়া যাইত, তিনি শরীরে যন্ত্রণাবোধ করিতেন ; মা টাকা বাক্সে রাখিবার সময় মাথায় স্পর্শ করাইতেন, বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিবার সময়ও স্পর্শ করাইতেন। অথচ, টাকার উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। তাঁহার এই অনাসক্তি ও সঞ্চয়-বুদ্ধির একান্ত অভাব দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন, 'বানরের চুল হলে বাঁধতে জানে না।' [বি] টাকা মাথায় ঠেকাইবার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, লক্ষ্মী।' [ন]

(৩) জগৎকল্যাণে নিম্নভূমিতে মন রাখিবার জন্য ঠাকুর 'তামাক খাব', 'জল খাব', ইত্যাদি তুচ্ছ বাসনা অবলম্বন করিতেন ; মা তজ্জন্য একটি কন্যা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

এই সকল কারণে, ঠাকুরের জীবন হইতে সন্ন্যাসীরা এবং শ্রীশ্রীমার জীবন হইতে গৃহস্থেরা যে সমধিক শিক্ষা লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়রামবাটী হইতে প্রত্যাগত ভক্তগণকে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা দেখে তো এলে, রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজচেন, চাল ঝাড়চেন, এমনকি, ভক্তছেলেদের এ'টো পর্যন্ত পরিষ্কার করচেন। মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট করচেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্যে। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য !

গৃহস্থের ভাবে ভাবিত ছিলেন বলিয়াই শ্রীশ্রীমা সন্ন্যাসীকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সন্ন্যাস দিয়া নিজেরই এক শিষ্যকে নমস্কার করিয়াছিলেন। জয়রামবাটীতে একদিন শরৎ মহারাজ আহারের পর আসন ত্যাগ করিলে মা সেই আসনখানি উঠাইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে থাকেন। বিস্মিত হইয়া নলিনবাবু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন ঃ কত ভাগ্যে গিরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধুলো পড়ে। সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী, আমাদের এই তো ধর্ম।

একদিন কৃষ্ণলাল মহারাজ আসিয়া বলিলেন, মা, গঙ্গায় নাইতে যাবে কি ? শ্রীশ্রীমা বলিলেন, আজ যাবার ইচ্ছা নাই। সেদিন কী একটা পর্ব ছিল, খানিক পরে গোলাপ-মা আসিয়া বলাতে মা গঙ্গায় যাইতে প্রস্তুত হইয়াই বলিলেন, ওমা, কী হবে গো,

সাধুর কাছে মিছে কথা হল কেস্টলালকে বল্লুম, যাব না ' মেয়েরা কহিলেন, তা তোমার আর কী হবে তাতে ? 'সে কী মা, তা কি হয় ?' মা উত্তর করিলেন।[১]

কৈবল্যানন্দ বলেন : একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, যাঁরা ঠাকুরের কৃপা পেয়েচেন গৃহস্থই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, তাঁরা তো সকলেই সমান—সকলেরই তো একই গতি হবে ? মা জোরে উত্তর দিলেন : তা কি কখনো হয় ? দেখতে পাচ্চ না, আমি এদের সব নিয়ে আছি বলে তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্চি না ? সন্ন্যাসীতে গিরস্তে আকাশপাতাল তফাত। গেরুয়া পরেচে, সংসার ছেড়েছে ভগবানের জন্যে ; আর এরা সব নিয়ে আছে বলে ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না।

তীর্থ ঘুরিয়া মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ কোন্ জায়গা ঘুরে এলে ? আমি বলিলাম, কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী এই সব। মা তীর্থের উদ্দেশে বারবার জোড়হাতে প্রণাম করিয়া কহিলেন : আহা পুণ্যতীর্থ সব ! সাধু কি কম গা—কত সব জায়গা ঘুরে ! যেখানে যেখানে গিয়েছ, আমাকে একএক অঞ্জলি জল দিয়েচ তো ? যেখানে যেখানে যাও, আমাকে তিনতিন অঞ্জলি জল দিয়ো।

তখন আমার পৈতায় একটি দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ ছিল, মা আমাকে ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এখন বিরজাহোম করিবার আদেশ পাইয়া বলিলাম, এটি কি আর রাখব ? 'তাই তো, সন্ন্যাসী !' —বলিয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। আমি তখন রুদ্রাক্ষটি গলা হইতে খুলিয়া পাদপদ্মে অর্পণ করিতেই বাধাসূচক 'হাঁ হাঁ' উচ্চারণ করিয়া দুইহাতে তুলিয়া নিজের মস্তকে বারবার স্পর্শ করাইলেন এবং পূজার সিংহাসনে রাখিয়া বলিলেন, আহা কত তীর্থ হয়েচে, সাধুর গলার জিনিস ! তারপর রাধুকে বলিলেন, রাধু, আয় তো, তোর দাদাকে প্রণাম কর্। 'মা, সে কী, সে কী' বলিয়া আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলেন, দাঁড়াও। (রাধুর প্রতি) সাধু তীর্থ করে এসেচে, প্রণাম কর্ ; তোর সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আমাকে বলিলেন, বাবা, আশীর্বাদ কর, রাধুর যেন সব দুঃখ চলে যায়।

শ্রীশ্রীমা প্রকৃত সাধুকে এইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেও, গৈরিকের অভিমানে স্ফীত হইয়া যদি কেহ কথায় বা আচরণে গৃহী ভক্তকে অবজ্ঞা করিত, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। ঐরূপ কোন গৈরিকধারীর কথায় প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন, বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হলে হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয় ; আর সন্ন্যাসীর রাগ অভিমান থাকলে বেতের বেক (চাল মাপিবার পাত্রবিশেষ) চামড়া দিয়ে বাঁধানো হয়। মঠে একবার কড়াকাড়ি নিয়ম হয়, গৃহস্থ ভক্তেরা সাধুদের বিছানায় শুইবে না। অক্ষয়কুমার সেন ব্যবহার করায় বোধানন্দের বালিশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া মা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। [গ]

প্রকৃত সাধুকে শ্রীশ্রীমা নিজের সাধ্যমত সেবা করিয়াছেন, সেবা করিতে অন্যকে প্রেরণা দিয়াছেন এবং সেবার মহৎ ফলও কীর্তন করিয়াছেন। ঠাকুর অপ্রকট হইলে উৎকলদেশীয় এক বৃদ্ধ সাধু কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মা

---

[১] সরযূ সেনগুপ্ত-কথিত।

গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাঁহার জন্য কুটীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, স্বয়ং তাঁহার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। অল্পদিন পরে সাধুটি ঐ কুটীরেই দেহরক্ষা করেন। চন্দ্রমোহন দত্ত একদিন মাকে প্রণাম করিয়া বলেন, মা, আপনার পায়ে আমার হাতখানা বুলিয়ে দি। তাহাতে মা উত্তর দেন, আমার পায়ে হাত বুলতে হবে না, আমার শরতের পায়ে হাত বুললেই আমার পায়ে হাত বুলনো হবে, যে আমার শরতের পায়খানা সাফ করবে তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে। মার কথায় চন্দ্রমোহন কিছুদিন শরৎ মহারাজের পদসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 'বিভূতি, বশী আর চাবু গুপ্ত-মহারাজের কী সেবাটাই করেচে!' জনৈক স্ত্রীলোকের মুখে এই কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, এরা গুরুর সেবা করেচে, এদের আবার তপস্যা কী?

শ্রীশ্রীমা ব্রাহ্মণের সঙ্গেও সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতেন। জয়রামবাটীতে ৺বিজয়া দশমীর রাত্রে সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা ও এক মোটা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একসঙ্গে খাইতে বসেন। সেই ব্রাহ্মণকে মা খুবই যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। নিজের উচ্ছিষ্ট পাতা গুটাইয়া লইয়া সিন্ধুবাবু ঐ ব্রাহ্মণকেও পাতা গুটাইতে আদেশ করিলে মা বাধা দিয়া বলিলেন, না বাবা, ব্রাহ্মণ উনি, ওঁকে একথা বলতে আছে? (ব্রাহ্মণের প্রতি সবিনয়ে) আপনি মুখ ধুনগে। নিজের বসন্তরোগের চিকিৎসক শীতলার ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া মা তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন; কেহ ঐ ব্রাহ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া পদধূলি গ্রহণে আপত্তি জানাইলে বলিয়াছিলেন, হাজার হোক, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নেওয়াই উচিত। [আ]

শ্রীশ্রীমা বিশেষ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মান দান করিতেন। তাঁহার আদেশে রাধারাণী কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিকে প্রণাম করিয়াছিল।

চারুবালা দেবী বলেন: ১৩১৯ সালে বড়দিনের ছুটিতে আমরা ৺কাশীতে গিয়াছিলাম! শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন আমি ও সর্বমঙ্গলা দেবী ভানুপিসীকে প্রণাম করিয়াছি শুনিয়াই গোলাপ-মা চটিয়া বলিলেন, এদের অল্প বয়েস, ভক্তি দেখ! ব্রাহ্মণ হয়ে গয়লার মেয়েকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা! অমন করলে ওদের অহংকার হয়, ধরাকে সরা জ্ঞান করে। মা একথা শুনিতে পাইলেন এবং আমাদিগকে গোলাপ-মার সম্মুখেই বলিলেন, গোলাপের কাণ্ড দেখ। উৎসবের দিন, সকলে আনন্দ করবে, ও কিনা মনে কষ্ট দিচ্চে। তোমরা কিছু মনে কোরো না মা, ভক্ত-ভাবে সকলকেই প্রণাম করা যায়, তাতে দোষ নাই।

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: মার পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য কত্তে পার, তবেই তো ঠিকঠিক ছেলের কাজ কল্লে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েচ—কত কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করেচেন! তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম জানবে।[২]

মাখনলাল দত্তকে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে কে আছে? বিয়ে হয়েচে কি? তিনি বলিলেন, বাবা আছেন, মা নাই; বিয়ে হয় নাই। মা বলিলেন, তোমার

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

এখন সন্ন্যাসী হওয়া চলবে না, বুড়ো বাপের সেবা কত্তে হবে, বিয়ে না করে থাকতে পাল্লে ঘরে থেকেও সন্ন্যাসী।

কালীকুমার অতি অল্প বয়সে ছেলেদের বিবাহ দেন। ভূদেবের তের বছর ও রাধারমণের এগার বছর বয়সে বিবাহ হয়। রাধারমণের বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতায় যে পত্র যায় তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, পোড়ারমুখো ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্চে, আমার ঠিঁয়ে আদায় করে নিচ্চে, আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না। [ই]

কিশোরীমোহন ভৌমিক শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, মা আমার তো বিয়ে হয়েচে। মা উত্তর দেন: তাতে কী হয়েচে? তাতে ভয় কী? ঠাকুর তো বিয়ে কত্তে মানা করেন নাই, সংসার কত্তে নিষেধ করেন নাই। ঠাকুরের নাম করবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রজনাথ সেনের সন্তান হইয়া বাঁচে না শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, গয়াতে পিণ্ড দিলে এই দোষ সেরে যায়, আর একটি দরগা ধরে থাক। ব্রজনাথবাবু দরগার মানে জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, হিঁদুদের বাড়ীর কাছে কোন ঠাকুর দেবতা থাকে না? তাঁকে আশ্রয় করে থাক।

একমাত্র কন্যা পাঁচ বছর বয়সে মারা গেলে প্রভাসিনী দেবীর পাগলের মত অবস্থা হয়। একদিন রাত্রে দেখেন, শ্রীশ্রীমা জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, তুমি ওর জন্যে শোক কচ্চ কেন? ও তো তোমার নয়, নিজের কর্মফল খণ্ডন কত্তে ও কয়েক জন্ম তোমাদের গোষ্ঠীর ভিতরেই ঘুরে ফিরে আসচে। আত্মীয়দের মধ্যে খবর লইয়া দেখা গেল, কয়েকটি মেয়ের জন্ম ও অল্পবয়সে মৃত্যু ঠিক পর পর ঘটিয়াছে। [ত]

সুবাসিনী দেবী গর্ভধারিণীর মৃত্যুসংবাদে কাঁদিয়া আকুল হইলে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ? জগতের যে মা সেই হল সকলের মা। কা কস্য পরিদেবনা। অক্ষয়কুমার সেনকে মা লিখিয়াছিলেন: সংসারে জন্মমৃত্যু অনিবার্য জানিয়া সহ্য করিয়া যাইবে। পত্রান্তরে লিখিয়াছিলেন: সংসারে এমত সুখদুঃখ আছেই। তবে কেন অনর্থক ভেবে মনকে দুর্বল করা।

স্বজনবন্ধুহীন হংসেশ্বর নায়েককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, যার কেউ নাই তার হরি আছেন।

পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া নিতে অভিলাষিণী মাখনবালা দেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা বড় ভাগ্যের কথা! লোকে একটা পিতলের বাটির মায়া ছাড়তে পারে না, আর সংসার ত্যাগ করা কি সোজা কথা? তোমার ভাবনা কী? তুমি আমার ছেলেকে পেটে ধরেচ, মানুষ করেচ। তোমার মরণের সময় সে কাছে থাকবে। [প্র]

মহেশ্বরানন্দ বলেন: রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি; একটি জোনাকি পোকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলোয় পড়িতে যাইতেছিল, কেহ হাত দিয়া সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করাতে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, ওটা মেরে ফেল, আর অত দয়ায় কাজ নাই। সারদেশানন্দ

[ত] ভবদেব ঘোষাল-কথিত।

একটি তেঁতুলে-বিছা মারিয়া ফেলিলে মা বলিয়াছিলেন, বিছেটার কী ভাগ্য, সাধুর হাতে মারা গেল।

জয়রামবাটীতে বাবুরাম মহারাজ ও খোকা মহারাজ খাইতে বসিয়াছেন। একটি বিড়াল খোকা মহারাজের পাত হইতে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করিলে তিনি এক থাপ্পড় বসাইয়া দেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,- খোকা, করলি কী, করলি কী? মেরে বসলি? মার বাড়ীতে কোন্ দেবদেবী কী বেশে আছে কে জানে। শ্রীশ্রীমা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হয়েচে? বাবুরাজ মহারাজ বলিলেন, খোকা বেরালটাকে মেরেচে। মা বলিলেন, বেশ করেচে, ও বড় দুষ্টু হয়েচে। [সু]

শ্রীশ্রীমা বলিতেন, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়। তরকারির খোসাটিও তিনি নষ্ট না করিয়া গরুকে দিতেন। তাঁহার দরজায় ভিখারী বিমুখ হইত না। সারদারঞ্জন দত্তগুপ্ত মার বাড়ীতে বসিয়া আছেন এমন সময় একটি ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল; কিন্তু এক সাধু তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মা জানিতে পারিয়া লোকটিকে ফিরাইয়া আনিতে নীচে বলিয়া পাঠাইলেন এবং কয়েকজন ছুটাছুটি করিয়া লোকটিকে খুঁজিয়া লইয়া আসিলে স্বয়ং ভিক্ষা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

তাঁহার মুখে ঠাকুরের এই উক্তিটি শুনা যাইত, 'যার আছে সে মাপো, যার নাই সে জপো।'[১] সৎকাজে মুক্তহস্ত লোককে তিনি ভালবাসিতেন, কিন্তু অপচয় সহ্য করিতেন না; বলিতেন, অপচয়ে মা-লক্ষ্মী কুপিতা হন। অকারণে তরকারির খোসাটাও পুরু করিয়া ছাড়াইতে নিষেধ করিতেন।

একবার জয়রামবাটী হইতে যাওয়ার সময়ে শ্রীশ্রীমা জ্ঞানানন্দকে বলিয়াছিলেন, বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে, যেন কারো বাড়ী যায় না—গাল দেবে বাবা! [ই]

দুর্গাদেবী বলেন: জয়রামবাটীতে একটি লোক মসুরকলাই বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিয়া বলিলাম, আমি আট আনার মসুরকলাই নেব। মা বলিলেন, বেশ তো, আমি বলে দিচ্চি। তাহা শুনিয়া উনি বলিলেন, মার কাছে এসে কী চাইতে কী —মসুরকলাই চাচ্চে। মা বলিলেন, বাবা, মেয়েমানুষ ওরা, ওদের সংসার কত্তে হবে, সব রকম চাই—ওদের নীলবড়ী থেকে, শশাবীচি থেকে, সমুদ্রের ফেনা থেকে সমস্ত যোগাড় করে রাখতে হয়, ওদের সংসার কত্তে হবে।

অতিমাত্রায় চা-পানে অভ্যস্ত এক সেবককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: ঠাকুর আমাকে শিখিয়েছিলেন শরীরকে সামশীতলে রাখতে। কেবল গরম জিনিস না খেয়ে মিছরির পানা, ডাবের জল এসব খাওয়া ভাল। [আ]

---

[১] শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতায় আসিতেন, রাত্রে কোয়ালপাড়া হইতে রওনা হইয়া সকালে প্রায় আটটার সময় বিষ্ণুপুরের দুইতিন মাইল আগে তাঁতিপুকুরে গাড়ী থামাইয়া ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, কে ভাগ্যবান তাঁতি যে এই পুকুরটি দিয়েচে, এত লোক জল খেয়ে বাঁচে। শেষবার কলিকাতায় আসার সময় তাঁতিপুকুরের পার্শ্বস্থ অশ্বত্থবৃক্ষকে মা 'মহাবৃক্ষ' বলিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। [বি]

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন : কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই। কাল সকাল থেকেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল : মনে বল্লুম স্নান করব না। তারপর ভাবলুম, জন্মতিথি—স্নানটা করি। বাবা, প্রথম-মনের কথা শুনতে হয় ; সেই ঠিক বলে। প্রথম-মন বল্লে, স্নান কোরো না ; দুষ্ট মন বল্লে, জন্মদিন—স্নানটা কর। স্নান করেই জ্বর !

গৃহস্থবাড়ীতে পূজার অঙ্গরূপে ও শান্তিস্বস্ত্যয়নে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা বিধিপূর্বক না হইলে হিতে বিপরীত ফল হয়। এক সময়ে শ্রীশ্রীমা আপনা হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—মঠে চণ্ডীপাঠ ঠিক হচ্ছে না, বন্ধ কর। মঠের চণ্ডীপাঠ তাহাতে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরে মা একদিন মঠে যান, মঠ তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেইদিন ব্যক্তিগতভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন ; তাঁহার পাঠ শুনিয়া মা বলিলেন, হরি চণ্ডী পড়তে পারে। সেই অবধি মঠে পুনরায় চণ্ডীপাঠ হইতে থাকে। [আ]

প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেন : আমার দীক্ষার পর শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, লোকে বলে, ব্রাহ্মণশরীর হলেও যদি মড়াকাটা ইত্যাদি করে, তার হাতে দেবতারা পূজা নেন না, পিতৃপুরুষেরা পিণ্ড গ্রহণ করেন না, তা কি সত্যি ? মা বলিলেন, হ্যাঁ। আমি পিতার একমাত্র ছেলে অথচ ডাক্তারি শিখিতে আমাকে মড়াকাটাদিও করিতে হইয়াছে, তাই কাতর হইয়া বলিলাম, তা হলে কী হবে মা ? মা বলিলেন, আর কোন ভয় নাই, এখন হতে সকল পূজায় অধিকার হল। কোনও সময়ে আমাকে মা ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়া বলিলাম, মুখে পান রয়েচে, কী করে যাব ? মা বলিলেন, পান পবিত্র—এস।

প্রবোধবাবু বলেন : আমাদের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে নিজের প্রসাদ দিয়াছিলেন। বিকালে যখন সকলে তাঁহার কাছে বসিয়াছি মা বলিলেন, অন্নপ্রাশন তো হল বাবা, হল কিন্তু রবিবারে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিবারে হলে কী হয় মা ? মা বলিলেন আর কিছু হয় না, একটু গরীব হয়। তারপরে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে একটু বৈদিক কার্য কত্তে হয়, সংস্কার কিনা, বাড়ীতে গিয়ে একটু ঘি পুড়িয়ো।

ইন্দুমতী দেবী বলেন : বিজয়ের ভাতের সময় উনি বলিলেন, দিদি, ছেলের ভাত হবে নি, ও তো বাঁচবে নি দিদি, আমি পয়সা খরচ করব শুধু শুধু ? মা বলিলেন, সে কী রে ? ধানের আগড়া ভেসে যায়, মানুষের আগড়া থেকে যায় করাবি বইকি।

কমলা ঘোষ বলেন : আটমাস বয়সে লক্ষ্ণৌয়ে আমার ছেলের অসুখ হয়। ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিলেন ও যেন নিজে ছেলেকে কোন ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। সে ভাল হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে সেই কথা বলিবার উপক্রম করিতেই কহিলেন, আমাকে শুনিয়ো না, স্বপ্নাদ্য ওষুধ বলতে নাই।

শ্যামাচরণ চক্রবর্তীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, তোমার মাছমাংস যা খেতে মন চায় খাবে, তবে ঠাকুর বলতেন, আদ্যশ্রাদ্ধের, সংস্কার-বিবাহের আর প্রায়শ্চিত্তের অন্ন খেতে নাই।

জয়রামবাটীতে আহারের সময় কাছে বসিয়া শ্রীশ্রীমা কৈবল্যানন্দকে বলিলেন: সংস্কার কি সহজে যায়? ঠাকুরের ঘরে মা-কালীর প্রসাদী অন্ন একথালা রোজ আসত আর তার সঙ্গে ছোট বাটিতে একবাটি ঘিও আসত। ঠাকুর পেটরোগা, অতটা ঘি খেতে পারতেন না। আমাকে বলতেন, ওগো, ঘিটা আলগোছে ঢেলে রাখ না; অতটা ঘি তো খেতে পারব না। আমার ভাতে ছোঁয়া ঘি তুলে রাখতে সংকোচ হত। মনে হত, এঁটোটা রাখব? ঠাকুর মনের কথা বুঝতে পেরে বলতেন, না না গো, ঘি তেল ভাতে ছোঁয়া গেলেও সকড়ি হয় না, পাত্রান্তর কল্লেই শুদ্ধ হয়ে যায়। ঠাকুরের কথা শুনে রেখে দিতুম বটে, কিন্তু মন খুঁতখুঁত কত্ত। এমনি সংস্কার!

গণেন্দ্রনাথ যে কাপড় পরিয়া শৌচে গিয়াছিলেন সেই কাপড়ে শ্রীশ্রীমার কাছে আসাতে নলিনী একটু কিন্তু করিতেছিল। মা বলিলেন, বেটাছেলে সদামুক্ত ওদের আর শুচি অশুচি কী? [বি]

সুরমা রায় বলেন: প্রথম যেবার শ্রীশ্রীমার কাছে যাই তখন আমার মেয়ে পেটে। মা বলিয়াছিলেন, তুমি আস্ত জিনিস, লাউ কি কুমড়ো, কেটো না। সন্ধ্যার পর কাপড় বাহিরে শুকাইতেছিল। পোয়াতীর কাপড় সন্ধ্যার পর বাইরে রাখতে নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া মা নলিনীকে কাপড় উঠাইয়া না রাখার জন্য বকিলেন। নলিনী বলিল, পিসীমা, তুমি আমাদের বকলে, বৌদিদিকে তো বকলে না? মা বলিলেন, ওদের কাপড় বাইরে থাকলে কিছু হবে না, ওরা যাঁর নাম নিয়ে বেরিয়েচে তিনিই রক্ষে করবেন। কামারপুকুরে যাওয়ার সময় আমবাগান, ভূতির খালের শ্মশান ইত্যাদি স্থানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াছিলাম। নলিনী শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো পিসীমা, শুন বৌদিদি কী বলচে! মা হাসিয়া বলিলেন, ওদের কিছু হবে না; ঠাকুর ওদের সর্বদা রক্ষে কচ্চেন।[৫]

কমলা ঘোষ বলেন: যখন আমার প্রথম ছেলে পেটে, বাপের বাড়ী যাওয়ার কথায় শ্রীশ্রীমা ওঁকে বলিয়াছিলেন, প্রথম পোয়াতী বাপের বাড়ীতেই প্রসব হওয়া ভাল—গীতা চণ্ডী নতুন কাপড়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবে, মা-চণ্ডী রক্ষে করবেন। মেয়ে পেটে, তৃতীয়বার যখন জয়রামবাটী যাই তখন শ্রাবণের শেষ নদী বাঁধা। নদীর ধারে শ্মশান। আমি নদীর ধারে বালির উপর শুইয়া পড়িয়াছিলাম শুনিয়া মা বলিলেন, করেচ কী গো! পরদিন স্নান করিতে যাওয়ার সময় মা আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ৺সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা সিংহবাহিনী, বৌমা কিছু জানে না, তোমাকে দেখতে এসেচে, ওকে রক্ষা কর। সেই অবস্থায় মা আমাকে কাহারও ঘরে খাইতে দিতেন না; বলিতেন, পোয়াতী মানুষকে যার তার ঘরে খেতে নাই। ফিরিবার সময় মা শিয়াকুলের কাঁটাসুদ্ধ ডাল আমার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, শেঁকুলের কাঁটা ধরব তো ছাড়ব না। আমার মা পোয়াতীকে শেঁকুলের কাঁটা যাত্রাকালে দিতে বলতেন।

একবার কলিকাতায় একাদশীর দিন কিছু না খাইয়া মাসীবাড়ী যাই। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাত পেয়েছিলে কি? আমি বলিলাম,

[৫] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: যোগেন্দ্রের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা—শ্মশানের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ায়। তারা গরীব, ভগবান তাদের রক্ষে করেন। [বি]

ভাত পাই নি। মা বলিলেন, একাদশীর ফল পেলে, আর তোমাকে একাদশী কত্তে হবে না। মাছ খাইয়াছি শুনিয়া কহিলেন, বেশ করেচ, একাদশীর দিন ব্রয়োদশী-মানুষ, রাত্রে দুটি ভাত আর একটু মাছ মুখে দেবে।

কৈলাসকামিনী রায়কে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ খোসাটা আর চালটা লোকনিন্দা হল বাইরের খোসা। নরেনকেই লোকে কত নিন্দা করেচে! কৈবল্যানন্দকে বলিয়াছিলেন ঃ লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ করে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়। গোলাপ-মাকে বলিয়াছিলেন ঃ অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।

রাধুর মার সঙ্গে একটি সদ্গোপের মেয়ের ঝগড়া হইতেছিল। শ্রীশ্রীমা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়, হেটেল মারলেই পাটকেল খেতে হয়। নলিনীর সঙ্গে সুবাসিনী দেবীর ঝগড়া হইয়াছিল, চিঠিতে সেই কথা জানিয়া মা সুবাসিনীকে লিখিয়াছিলেন,—সময়ে সবই সহ্য করিতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়। উমেশবাবুকে লিখিয়াছিলেন, তুমি ঠাকুরের সন্তান, তুমি শত্রুর সঙ্গে মিত্র ব্যবহার করিবে, ইহাতে ঠাকুর তোমার মঙ্গল করিবেন।

অদ্বৈত দাসের সঙ্গে কোন প্রতিবেশীর বিবাদ হয়। প্রতিবেশীরই যত দোষ ছিল, তথাপি অদ্বৈত ঝগড়া বিবাদ ধর্মপথের বিঘ্ন মনে করিয়া হীনতা স্বীকার করিয়াও সদ্ভাব-স্থাপনে ইচ্ছুক হন ও শ্রীশ্রীমাকে তাহা জানান। অরূপানন্দ বলিলেন, সে চাচ্চে না, তবু তুমি গায়ে পড়ে ভাব করতে যাচ্চ? সঙ্গে সঙ্গে মাও বলিলেন, হঁা বাবা, ঠিকই তো বলেচে, এতে কি তোমার মনুষ্যত্ব থাকে?

শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন ঃ পৃথিবীর মতন সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্চে, অবাধে সব সইচে; মানুষেরও সেই রকম চাই।

মহেশ্বরানন্দ বলেন ঃ আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, বাবা, তোমার দুখানা কাপড় আমার কাছে আছে, নিয়ে যেয়ো।[৬] আদেশ করা হিসাবে তাঁহাকে কিছু বলিতে শুনি নাই। 'বাবা, এটা কল্লে ভাল হয় না?'—এইরূপ তাঁহার বলিবার রীতি ছিল।

কখন কখন তাঁহাকে আদেশ করিতেও দেখা গিয়াছে। যেমন, বালবিধবার অতিরিক্ত কঠোরতা-প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য বলিতেছেন, 'আমি বলচি, তুই জল খা।' এই আদেশের মধ্যে জননীর কল্যাণমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নাই।

কেহ তাঁহার অনভিমত কথা বলিলে তিনি প্রথমতঃ উহা মানিয়া লইতেন, তারপরে ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্য বলিয়া ক্রমশঃ তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতেন। তাঁহার বাক্যে রূঢ়তা ছিল না, কাহারও কথার উপর অবজ্ঞা প্রকাশ পাইত না।

শ্রীশ্রীমার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ জীবিকার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন এবং তাঁহার দেশের লোক অক্ষয়কুমার সেনও কলিকাতায় থাকিতেন। মা তাঁহাকে

---

[৬] প্রভাকর মুখোপাধ্যায় দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে জয়রামবাটী গিয়াছেন। মা বলিলেন ঃ মন্ত্র নেবে; বেশ তো! তোমাদের জিনিস আমার কাছে মজুত আছে।

লিখিয়াছিলেন, 'মধ্যে মধ্যে তুমি উহাদের বাসায় যাইবে। কেননা দিন খেন খারাপ, তোমাদের ভরসা অনেক করি।'

এক ব্রাহ্মণী কলিকাতায় তাঁহার পুত্র-পুত্রবধূর দীক্ষার দিন তাহাদের সঙ্গে আসেন। আহারে বসিবার পূর্বে তিনি মাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দিষ্ট আসনের নিকট দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কেহ আপত্তি করিলে উত্তেজিত হইয়া বলিতে থাকেন,—আমরাও কুলীন বামুনের মেয়ে, জপতপ করে থাকি, মা আমাদেরও। এমন সময় মা আসিয়া তাঁহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, কিছু মনে কোরো না দিদি। ব্রাহ্মণী অমনি জল হইয়া বলিলেন, আমার ছেলেকে আপনাকে দিলুম। [ত]

দুর্গাপদ ঘোষ ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যান। সেই সময় জিবটার কোন স্ত্রীলোকের পেটে ফোড়া হওয়ায় তাঁহাকে দেখাইতে লইয়া যায়। ফোড়াটা তিনি কাটিয়া দিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া মা বলিলেন, তাই তো বাবা, কেটে দেবে ; তারপরে ভালমন্দ যদি কিছু হয়, লোকে তো আমাকেই দুষবে। ফোড়া আর কাটা হইল না, কয়েকদিন পরে আপনা হইতেই ফাটিয়া গেল।

রাজেন্দ্র দত্ত বলেন ঃ জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে আছেন। বাঁকুড়া হইতে যাইয়া আশু মহারাজ তাঁহাকে পূর্বদিন দর্শন করিয়াছিলেন, আমিও এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া দর্শন করিতে গেলাম। খানিক কথাবার্তার পর আমরা চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই মা বলিলেন, আশু কাল গামছা ভুলে ফেলে গেছে, তুমি নিয়ে যাও। আশু মহারাজ আমাকে গামছাখানা আনিতে বলিয়াছিলেন, আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মা গামছা তুলিয়া রাখিয়াছেন, আমাকে দিতেও ভুলিলেন না।

জয়রামবাটীতে রাত্রে আহারের পর উমেশবাবু এক গ্লাস খাবার জল চাহিলে শ্রীশ্রীমা ঐ জল দিয়া কী হইবে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, ভোর বেলায় নাক দিয়ে জল টানার অভ্যাস আছে। ইহার পর যতবার তিনি মার বাড়ী গিয়াছেন, রাত্রে আহারের পর মা বলিতেন, বাবা, তোমার জলটি মনে করে নিয়ে রেখো।

শ্রীশ্রীমা বলিতেন ঃ সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান ? যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। নিশিকান্ত মজুমদারকে বলিয়াছেন ঃ মনে করবে এ ঠাকুরের সংসার, তুমিও ঠাকুরের · ঠাকুরের সংসারে ঠাকুরের কাজ করছ। বাসুদেবানন্দ এক সময়ে মার বাড়ীতে ঠাকুরপূজা করিতেন, কিন্তু হট্টগোলের জন্য কখন কখন বিরক্তও হইতেন। একদিন আরতির সময় ভয়ানক গোলমাল হইতেছে আর তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, কী বিপদেই পড়া গেল। তখনই মা যেন রাধুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হরিঠাকুর যেখানে রাখেন সেখানেই থাকতে হয়।

মানিকতলা বোমার মামলার আসামী শচীন (চিন্ময়ানন্দ) আজীবন পুলিসের কড়া নজরে ছিলেন। উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীমার কাছে প্রতিকারপ্রার্থী হইলে মা বলিলেন, ঝড়ের এঁটোপাত হয়ে থাক—তোমার অস্তিত্ব থাকবে, ব্যক্তিত্ব থাকবে না, তা হলে তোমার সব জ্বালা যাবে। শচীন পরে বলিতেন, পুলিশ পূর্ববৎ পীড়া দিতে থাকলেও একেবারে উদাসীন ভাব এসে গেল, তাদের কোন ব্যবহারই মনে রেখাপাত করত না --তাদের সব কথা সব কাজ দেখচি শুনচি বটে, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নাই।

সংসার কর্মক্ষেত্র। শ্রীশ্রীমা আজীবন অবিশ্রান্ত কর্ম করিয়া মানবকে কর্মশিক্ষা দিয়াছেন। কুসুমকুমারী দেবী বলেন: রাধুর জন্মের পর হইতে জয়রামবাটীতে মাঝে মাঝে যাইয়া দুই তিন মাস করিয়া থাকিতাম। রোজই মনে করিতাম মাকে কোনও কাজ করিতে দিব না, কিন্তু তিনি তাহা একটি দিনের জন্যও হইতে দেন নাই। রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া মা শৌচে গিয়াছেন, আর আমি তাড়াতাড়ি বাসনপত্র পুকুরের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি; মা শৌচ হইতে আসিয়াই পুকুরে সেই বাসন দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি যাইয়া জলে বাসনের অনুসন্ধান করিতেছি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধোয়া বাসন দেখাইয়া দিয়াছেন।

সংসারে মার কত খাটুনি ছিল। একে তো বৃহৎ পরিবার, তাহার উপর তিনজন মুনিষ ও একজন রাখাল ছিল, সকলের রান্নাই মা স্বহস্তে করিতেন। বৌরা তখন কাজে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতেন না, গর্ভধারিণীর কষ্ট হইবে বলিয়া মা তাঁহাকেও রাঁধিতে দিতেন না। রাধুর জন্মের দুই বৎসর পরে একজন ব্রাহ্মণীকে রাখা হয়, তিনি কেবল সকালবেলা রাঁধিতেন। রাত্রে রুটি তরকারি এবং মামাদের জন্য গরম ভাত মা নিজেই রান্না করিতেন। ভক্তেরা আসিলে তাহাদের জন্য তরকারি মা নিজহাতে করিয়া দিতেন। দিবারাত্র কাজ করিয়াও তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখি নাই।

গ্রীষ্মকাল সারাদিন খাটিয়া মা সন্ধ্যার সময় তাঁহার জননীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-মূলে গিয়া বসিতেন। বসিয়াই বলিতেন, আঃ বাঁচলুম, ঠাণ্ডা হলুম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, আপনারও সংসারের তাত লাগে! উত্তর দিলেন, লাগবে না মা? আগুনের ভিতর থাকলে তাত সকলেরই লাগে। ওখানে মা ঘণ্টাখানেক বসিয়া ধ্যান করিতেন, শরীরে হুঁশ আছে বলিয়া বুঝা যাইত না।

শ্রীশ্রীমার এই কর্মশীলতা শরীর সম্পূর্ণরূপে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্বহস্তে পূজার যোগাড় করিয়া ঠাকুরপূজা এবং আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তগণের সেবা তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। শেষাশেষি তাঁহাকে রন্ধন করিতে না হইলেও স্বহস্তে তরকারি কুটিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেন, শরীর সুস্থ থাকিলে পরিবেশন করিয়াও খাওয়াইতেন। যতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল স্নানের পর কলসীতে করিয়া জল আনিয়াছেন, সংসারের অন্যান্য কাজেও সাহায্য করিয়াছেন। প্রশান্তানন্দ একদিন দেখিয়াছিলেন, মা খোঁড়া-পায়ে কলসীতে করিয়া খাবার জল লইয়া আসিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হয়, ইহার পর যে কয়দিন তিনি ওখানে ছিলেন নিজেই জল আনিয়া দিতেন। আর একদিন তিনি দেখতে পান, মা ছোট মামীর সঙ্গে ধান বা অন্য কিছু কুটিতেছেন। তজ্জন্য অনুযোগ করায় বলিলেন, সামান্য একটু কাজ বাকি ছিল, করবার আর কেউ ছিল না, তাই ঢেঁকিতে উঠেছিলুম।

শেষবার কলিকাতা আগমনের অল্পকাল পূর্বে একদিন মা তেল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুকুরে না যাইয়া কোথায় যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন বুঝিতে পারা গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর যামিনী দেবী দেখিতে পাইলেন, মা গোয়ালের পেছনে যাইয়া গোবর চটকাইয়া ঘুঁটে দিতেছেন। এত লোক থাকিতেও দুর্বল শরীরে পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া যামিনী দুঃখ প্রকাশ করিলে মা কহিলেন, সবাই তো কাজকর্মে আছে মা, আমিই দিয়ে দি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভক্তবৎসলা ও নিত্যলীলাসঙ্গী

শ্রীশ্রীমার মর্ত্যলীলার শেষের কয়েক বৎসর যেমন কর্মে নিবিড় তেমনি করুণায় মহীয়ান। একদিকে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যদিকে আশ্রিত ও আশ্রয়-প্রার্থী ভক্তগণের ভিড় লাগিয়াই আছে শারীরিক, মানসিক কোন কাজেরই বিরাম নাই। রাত্রিকালেও তিনি একটুকু বিশ্রামের সময় পান না, ভক্ত-কল্যাণে জাগিয়া সারানিশি জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করেন। জপ করেন শিষ্য সন্তানগণের হইয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত মহামন্ত্রগুলি, আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেন, ধ্যান করেন তাহাদেরই চিন্ময় রূপ যাহা মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইষ্টে চিরসম্বন্ধ, চিরমিলিত।[১] তাঁহার ধ্যানে ভক্তগণের স্বরূপ ফুটিয়া না উঠিলে ভক্তেরা লুপ্তজ্ঞান স্বরূপের সন্ধান পাইবে কেমন করিয়া? তিনি স্বরূপের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়াই তো তাহারা ব্যাকুল হইয়া, অধীর আগ্রহে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। নিজমুখে তিনিই তো কতজনকে বলিয়াছেন, 'ঠাকুরের দয়া পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ'

এমনি ভাবেই যদি চিরকাল ভক্ত-ভগবানে খেলা চলিত! কিন্তু তাহা হইবার নহে। 'নরলীলা নরবৎ' হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমার বয়োধর্মে ক্ষীয়মাণ শরীর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল; দেশের নিদারুণ ম্যালেরিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া উহাকে আরও জীর্ণ শিথিল করিয়া তুলিল, স্বজনবিয়োগ-জনিত আঘাত তাহাতে সহায়তা করিল।

১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীমার দেহ আমবাতে আক্রান্ত হয়। এই আমবাত একএক সময়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত ও তজ্জন্য তেল মালিশ করিতে হইত। তিন বৎসর তিনি এই অসুখে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীমার শরীরে সামান্যভাবে জ্বর দেখা দেয়। চিকিৎসা সত্ত্বেও উহা ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে এবং তাঁহার দেহের অবস্থা শঙ্কাজনক করিয়া তুলে। ৫ই মাঘ বিশ্বেশ্বরানন্দ-প্রেরিত তারে সেই সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, ভূমানন্দ, দয়ানন্দ ও সরলাকে সংগে নিয়া জয়রামবাটী যান। কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় নিরাময় হইয়া মা ১৫ই মাঘ অন্নপথ্য গ্রহণ করেন। [দি] তিনি কলিকাতায় আসিতে সম্মত না হওয়ায় শরৎ মহারাজ তাঁহার সেবার জন্য সরলাকে জয়রামবাটীতে রাখিয়া আসেন।

ফাল্গুনের শেষে কোয়ালপাড়ায় যাইয়া শ্রীশ্রীমা পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হন ও সেই জ্বর ক্রমে ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করে। ২২শে চৈত্র কোয়ালপাড়া হইতে তার পাইয়া শরৎ মহারাজ সেইদিনই ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ভূমানন্দ ও পরমেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করেন;

---

[১] ইন্দুভূষণ সেনগুপ্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, তোমার চিন্তা কী বাবা, তুমি আমার অন্তরে রয়েচ, তোমার জন্যে আমিই কচ্চি!

এবং নিজে অত্যাবশ্যক কাজগুলির যথাসম্ভব সত্বর ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী ও যোগীন-মাকে নিয়ে কোয়ালপাড়া অভিমুখে রওনা হন। বিষ্ণুপুরে একখানি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া সেই গাড়িতে ৪ঠা বৈশাখ কোয়ালপাড়ায় পৌঁছেন। [দি] পরদিন জ্বর ছাড়িয়া যায়।

এই জ্বরে শ্রীশ্রীমা দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। জ্বরের ঘোরে, উহা বৃদ্ধি পাইবার মুখে প্রায়ই বলিতেন, কই শরৎ এল, আহা তার হাত কী ঠাণ্ডা, আমার সব দেহ জ্বলে গেল! জয়রামবাটীতে ফিরিয়া বিভূতিবাবুর সঙ্গে তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ 'বিভুতি, তুমি আমাকে বারণ কল্লে না, তুমি বারণ কল্লে তো আমি যেতুম না। আমজেদ বলছিল, বিভূতিদাদা শুনলেন টিক্‌টিকি টক্‌টক্ কল্ল, অথচ তিনি আপনাকে বারণ কল্লেন না।' 'না মা, আমি শুনি নাই।' 'আমজেদ বলছিল তুমি শুনেচ। তুমি বারণ কল্লে আমি যেতুম না, আমার এত কষ্ট হত না।'

কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীশ্রীমা ১৫ই বৈশাখ জয়রামবাটী চলিয়া যান এবং তথা হইতে ২২শে যাত্রা করিয়া, শরৎ মহারাজের সঙ্গে ২৪শে রাত্রি আটটার সময় কলিকাতায় আসেন। [দি] কোয়ালপাড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত মা ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীমার জীবনে একটি বেদনার দিন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-লীলাসহচর, চিরশুদ্ধ আধার বাবুরাম মহারাজ ঐদিন মর্ত্যলীলা সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান। পূর্ববঙ্গে উপর্যুপরি কয়েকবার ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে যাইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও বিজাতের লোকের সংস্পর্শে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর যাইতে মা কাঁদিয়া আকুল হন। এই ঘটনার মাত্র দুইদিন পূর্বে বাবুরাম মহারাজের অন্যতম সেবক মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মা, আপনি বলুন যাতে বাবুরাম মহারাজ সেরে উঠেন। তাহাতে মা উত্তর দেন, আমি কি তা বলতে পারি? ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে।

শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা রাধু অন্তঃসত্ত্বা হইয়া অসুস্থ হয়। সে কোলাহল সহ্য করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মা তাহাকে নিয়া কতকটা নির্জনে বাস করিবার জন্য ১৬ই পৌষ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-বাড়ীতে গমন করেন। [দি] এখানে কাকের আওয়াজে সে কষ্ট বোধ করিত, কাক তাড়াইবার কাজে মাকেও সারাদিন ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তিনি কলিকাতা হইতে দেশে চলিয়া যান এবং ১৭ই মাঘ হইতে কয়েক মাস কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা-আশ্রমে বাস করেন। [দি] এখানে রাধুকে নিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার দিনগুলি কাটিত, তদুপরি ভক্তসমাগমেরও বিরাম ছিল না। ১৩২৬ সালের ৫ই বৈশাখ মাকুর পুত্র ন্যাড়ার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আর একটি আঘাত প্রাপ্ত হন। [দি]

শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী যাইবেন, পালকিও আসিয়াছে, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকায় যাইতে পারিলেন না। বাহিরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে জোড়হাতে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর, আমাকে কি যেতে দেবে না? ঠাকুর,

আমাকে কি যেতে দেবে না ? ঠাকুর, আমাকে কি যেতে দেবে না ? গলার স্বর করুণ যেন একটু অভিমানমিশ্রিত। কতক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। পরদিন ৮টা শ্রাবণ সকালে দইচিড়া ফলার করিয়া মা যাত্রা করেন। উ।

২৭শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি। ঐদিনের কথায় যামিনী দেবী বলিয়াছেন ঃ মা স্নান করিয়া ভক্তদের দেওয়া অনেকগুলি কাপড়ের ভিতর হইতে শরৎ মহারাজের দেওয়া কাপড়খানি বাহির করিয়া পরিলেন। আমি মার কপালে সিঁদুর চন্দন, গলায় ফুলের মালা ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, তাঁহার আগেকার রূপ যেন নাই, চকিতের মধ্যে এক ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব, অমানব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে রূপের বর্ণনা ভাষায় দিতে পারি না। খানিক পরেই তিনি পূর্বের মত হইয়া গেলেন, আমাকে বলিলেন, এস মা, প্রণাম কর।

জন্মতিথির দিন হইতে শ্রীশ্রীমার অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে। মাঝে মাঝে জ্বরের বিরাম হইলেও ক্রমাগত ভুগিতে ভুগিতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এই অসুস্থতার মধ্যেও কিন্তু দীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল না। শরীরে জ্বর লইয়াও তিনি দূরদূরান্তর হইতে আগত ভক্ত সন্তানগণকে শ্রীপাদে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন। 'জীবে দয়া' এই কালে তাঁহাকে আত্মহারা করিয়াছিল।

এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে উপেন্দ্র রায়ের এইরূপ কথাবার্তা হয় ঃ 'মা তোমার শরীর কেমন আছে ?' 'একটু একটু জ্বর হচ্চে, শরীর দুর্বল এ শরীর আর বইচে না।' 'তোমার জীবনটা তো কষ্টে কষ্টেই গেল দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থেকে, অনেকদিন ধরে কত কষ্টই না সহ্য করেচ।' 'সে তো বাবা, ভালই গিয়েচে। তখন এমন হয়েচে যে আজকের হাগা কালকে হেগেচি, তাতেও গায়ে লাগে নি। এখন আর এ শরীর বয় না।' মার কথার ভাবে উপেনবাবুর মনে হইল, নূতন শরীর না হইলে তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছেন না।

শ্রীশ্রীমার অসুখের সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য ভূমানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ ও বশী সেনকে পাঠাইলেন। ১২ই ফাল্গুন জয়রামবাটী হইতে রওনা হইয়া, পথে কোয়ালপাড়ায় একরাত্রি ও বিষ্ণুপুরে দুইদিন থাকিয়া ১৫ই রাত্রি প্রায় নয়টার সময় মা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। [দি] জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিবার দিন তিনি পুণ্যপুকুরের ঘাটে পড়িয়া যান। সুবাসিনী দেবী হলুদজলে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন,—প্রত্যেক বারই যাত্রার সময় তিনি ঐরূপ করিতেন—তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বড় বৌ, তুমি আর হলুদজল নিয়ে এসো নি ; হরিপ্রেমের হাতে দাও, সে ধুইয়ে দেবে।

শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শরৎ মহারাজ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, এলোপ্যাথি—সকল মতেই চিকিৎসা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কেবল কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসায় ৭ই চৈত্র হইতে পনর দিন জ্বর বন্ধ ছিল।[২] অবশেষে ডাক্তার প্রাণধন বসু কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।[৩]

[২] স্বামী সারদানন্দের পত্র হইতে সংগৃহীত।

[৩] চিকিৎসার ক্রম ও চিকিৎসকগণের নাম স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে এইরূপ পাওয়া যায়:

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী: H. M. [Holy Mother] under Dr. Kanjilal's [ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল] treatment.

২০শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ: H. M. better and free from fever.

২২শে „ ৫ই „ H. M. had fever up to 101° temp. in the afternoon.

২৯শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ: H. M.'s fever rose higher. Syamadas Kaviraj's [কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি] treatment begun.

২৬শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল: H. M. not better with Kavirajee treatment—so Dr. Bipin [ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ] took up Her case from today.

২৮শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল: H. M. suffering from pain in the stomach Dr. Haran's [ডাঃ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] medicine relieved Her.

৩০শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল: Bipin (Dr.) absent at Ghatsila—so Drs. Durga [ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ], Satish [ডাঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী] and Kanjilal treated Mother.

২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল: Dr. Bipin returned from Ghatsila, came to see H. M. and altered prescription with Durga.

১৮ই বৈশাখ, ১লা মে: Dr P. D. Bose [ডাঃ প্রাণধন বসু] called for H. M.

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে: P. D. declared H. M's case to be K—azar and talked about injection······

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে: Sponging given with rice diet—fever rose to 100° in the evening.

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে: Swamin injected by Dr. Syamapada [ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়] at 11-30 A. M.

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন: Doctors seemed to have come to their tether's end with regard to the case of Holy Mother. So Kaviraj Rajendranath [কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন] was called today and given charge of Her case.

কিছুদিন কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন চিকিৎসা করেন। ঐ সময়ে কবিরাজ কালীভূষণ সেনও দেখিতে আসিতেন। তারপরে কবিরাজ শ্যামাদাসকে পুনরায় আনয়ন করা হয়। তাঁহার ছাত্র কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক নিত্য আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতেন ও স্বহস্তে ঔষধ তৈয়ার করিয়া দিতেন। শেষ দুই দিন ডাঃ কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিলেন। একদিন ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও একদিন নীলরতন সরকারকে আনয়ন করা হইয়াছিল। ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত মার রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য শরৎ মহারাজ কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিলেন না। কেবল মানবীয় চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়া তিনি দৈবপ্রতিকারও আরম্ভ করাইলেন। ৩১শে বৈশাখ হইতে কিছুদিন ধরিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। [দি][৪]

স্বস্ত্যয়ন সুনিষ্পন্ন হইল, কিন্তু শ্রীশ্রীমার দেহের অবস্থার উন্নতি হইল না। এই অসুখের মধ্যেও, পাহারায় নিযুক্ত সেবকগণকে বুঝিতে না দিয়া, কিংবা তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি ভক্ত-সন্তানগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন কাহাকেও ইষ্টদর্শন করাইয়া দিয়াছেন, কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, সেবা গ্রহণ করিয়া কাহাকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। দুর্গেশ দাস ১৩২৬ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার আত্মীয়া প্রিয়ংবদা মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া আসিলে মা প্রিয়ংবদাকে অপরের নিষেধ সত্ত্বেও মন্ত্রদান করেন।

চপলা বসু এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণ-মানসে আসাযাওয়া করিতেন; 'ও যে দূরদেশ থেকে এসেচে'—এই বলিয়া, সেবকের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। লক্ষ্মীদেবীর কাছে তাঁহার দীক্ষার কথা হইতেছে শুনিয়াই মা বলিলেন, না, না, আমিই তোমাকে মন্ত্র দেব, স্বামী-স্ত্রীর এক গুরু করতে হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে মা তাঁহাকে মন্ত্রদান করেন।

মহামায়া মিত্র তাঁহার বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হিরণ্ময়ী ঘোষকে দীক্ষিত করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তিনি ঠাকুরের সময়কার লোক, নূতন সাধুদের বাধানিষেধ তেমন মান্য করিতেও চাহিতেন না। শ্রীশ্রীমা যেন উভয়দিক রক্ষা করিতে গিয়াই বলিলেন, তা লক্ষ্মীর কাছে নিলেই হবে। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র তাহার মস্তকে করপদ্ম স্থাপন করিয়া অন্যের অশ্রুতভাবে তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন!

মাখনলাল সেন লিখিয়াছেন : বিনয়বালা সেনের বাড়ী ঢাকা—সোনারং গ্রামে। স্বামিগৃহে থাকাকালে সে ঠাকুরের কথা জানিতে পারে এবং শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। মা কলিকাতায় আছেন জানিয়া সে কোনরূপে কলিকাতায় তাহার পিতার কাছে চলিয়া আসে, পিতা কালীঘাটে থাকিতেন। সে শুনিয়াছিল মা উদ্বোধন আপিসের বাড়ীতে থাকেন। উহা কোথায় বা কোন্ পথে সেখানে যাইতে হয় কিছুই না জানিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পাড়ার একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়া

[৪] বিশ্বেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন : শ্রীশ্রীমার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ যত স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন তাহার সকলগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। মার বাড়ীতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলাত্মিকা—এই পাঁচটি মহাবিদ্যার অর্চনা আর পাঁচটি গ্রহপূজা হয়। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে শতরূপ চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। সর্বশেষ বারাসতের শ্মশানে একটি স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। কোন স্বস্ত্যয়নেই কোনরূপ ত্রুটি বা বিঘ্ন হয় নাই। চপলা বসু বলেন : মাকে একটা দৈব ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। উপরে যাইতেই মা আমাকে বলিলেন, মা, কিন্তু জিজ্ঞাসা কোরো নি, এরা কী ওষুধ দিয়েচে তার গুণ থাকবেক নি। শরৎ মহারাজ আগেই আমাকে সেকথা বলিয়া দিয়া দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে মানা করিয়াছিলেন।

ট্রামে উঠিয়া পড়িল। ট্রামে দুইএক জনকে উদ্বোধন আপিসের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক সংবাদ পাইল না, বীডন বাগানের কাছে নামিয়া পড়িল। সেখানে দুইচারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে আবার ট্রামে উঠিল। এইরূপে উদ্বোধন আপিসে গিয়া যখন পেঁাছিল তখন বৈকাল হইয়া গিয়াছে। মার বাড়ীতে এই সময়ে পাহারা ছিল, সকলকে উপরে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু বিনয়বালা যখন যায় তখন কেহ পাহারায় ছিল না। সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল। মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, তুমি মা আমার কাছে মন্ত্র নিতে এসেচ, ওখানে কলঘর আছে, তুমি গিয়ে হাত পা ধুয়ে এস তোমাকে মন্ত্র দেব। বিনয়বালা বলিল, মন্ত্র নিবার জন্য আমি তো কিছুই নিয়ে আসি নাই! মা বলিলেন, তোমার ওসব কিছু লাগবে না। যখন দেহরক্ষার পূর্বে মার কঠিন পীড়া হয় তখন একদিন বিনয়বালা মার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তখন এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা যে, প্রবীণ ভক্তেরাও উপরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ঘটনা এমনই হইল, বিনয়বালা যখন যায়, পথে বা সিঁড়িতে কেহই পাহারায় নাই। সে সোজা মার ঘরে চলিয়া গেল। মা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, মা এসেচ? বস মা, বস। এবার এমন অসুখ হয়েচে যে আর শরীর থাকে না! তুমি এসেচ, ভাল হয়েচে। দেখ মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে বলা যায় না; আমার পাটা একটু টিপে দাও তো - কেমন ব্যথা হয়েচে। মার অশেষ কৃপা পাইয়া বিনয়বালা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। বিনয়বালাকে তারপর যখনই দেখিয়াছি, তাহার মুখে কেবলই ঠাকুর ও মার কথা, যেন আনন্দে বিভোর হইয়া আছে।

এই অসুখের মধ্যেও শ্রীশ্রীমাকে স্বজনবিয়োগ-জনিত তিনটি আঘাত পর পর সহ্য করিতে হইল। ১৩২৭ সালের ১১ই বৈশাখ তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের সেবক লাটু মহারাজ ৺কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করেন; ৩১শে বেশাখ তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ও পরমভক্ত রামকৃষ্ণ বসু কলিকাতায় এবং ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার সহোদর বরদাপ্রসাদ নিউমোনিয়া-জ্বরে জয়রামবাটীতে দেহরক্ষা করেন। তিনটি সংবাদ শুনিয়াই মা অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন।

সময় নিকট জানিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহার মায়িক অবলম্বন রাধারাণীর উপর হইতে মন তুলিয়া নিলেন। রাধুকে কেবল একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'তুই আমার কী করবি, আমি কি মানুষ?'[৫] তারপরে শরৎ মহারাজকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার অদর্শনে যাহারা নিরাশ্রয় বোধ করিবে তাহাদের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিলেন। বিভূতিবাবু বলেন: দেহরক্ষার প্রায় সাতদিন পূর্বে সকাল আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মা আমাকে বলিলেন, বিভূতি, শরৎকে ডেকে নিয়ে এস। আমি নীচে গিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলাম, মহারাজ, মা আপনাকে ডাকচেন। মহারাজ বলিলেন, যাচ্চি। আমি তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখি, মা অপলক নেত্রে চাহিয়া আছেন। দুইতিন

[৫] লেখককে রাধু বলিয়াছিল,—আমি তো তাঁকে নিজের পিসীমা বলেই জানতুম। আমি কি জানতুম যে তিনি মানুষ নন, দেবতা? ঐ কথাটি বলে তিনি আর আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দেন নাই, অজ্ঞান (?) হয়ে গেছলেন।

দিন পূর্বে তাঁহাকে মেঝের উপর বিছানায় শোয়ানো হইয়াছে। আমি বলিলাম, মা, মহারাজ আসচেন। মা বলিলেন, তুমি আমাকে জোরে হাওয়া কর। আমি বড় পাখাটা নিয়ে হাওয়া করিতে লাগিলাম। শরৎ মহারাজ আসিলেন, আসিয়াই মার পায়ের তলায় বাঁদিকে হাঁটু গাড়িয়া বুক নীচু করিয়া যেমন মার হাতের উপরে নিজের হাত বুলাইতে যাইবেন, মা অমনি শরৎ মহারাজের ডান হাতটি নিজের বাঁ হাতের নীচে রাখিয়া বলিলেন, 'শরৎ, এরা সব রইল।' সেই সময়ে মার মুখ খুব কাতর দেখা গেল। তিনি হাত সরাইয়া নিলেন; মহারাজ আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া পেছন দিকে হাঁটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দেহরক্ষার পাঁচদিন পূর্বে অন্নপূর্ণার মা দেখিতে আসেন। তিনি দুয়ারে বসিয়াছিলেন, হাতের ইসারায় শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। অন্নপূর্ণার মা কাঁদিয়া বলিলেন, মা, আমাদের কী হবে? ক্ষীণ কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া মা কহিলেন: তুমি ঠাকুরকে দেখেচ, তোমার আবার ভয় কী? তবে একটি কথা বলি যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।[৬]

প্রথম প্রথম কেবল সরলা ও মন্দাকিনী শ্রীশ্রীমার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু যখন মার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল ও সর্বদাই নিকটে লোক থাকা আবশ্যক বিবেচিত হইল তখন সুধীরার বন্দোবস্তে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মেয়েরা পালাক্রমে সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৭]

সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, চিকিৎসা-সূত্রে আগত ডাক্তার-কবিরাজদিগকে দর্শনাদি দানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীশ্রীমা সন ১৩২৭ সাল বা ১৮৪২ শকাব্দে, সৌর শ্রাবণের চতুর্থ দিনে, মঙ্গলবারে, রাত্রি ১৬ দণ্ড ৫৩ পল সময়ে স্থূলদেহে লীলা সম্বরণ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কমলা ঘোষ স্বপ্ন দেখিলেন, মা বলিতেছেন, বৌমা, আমার কায়া গেছে, ছায়ার মতন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। ইহার পরের বৎসর দেবীপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উমেশবাবুকে লিখিয়াছেন: সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম মা বলিতেছেন, 'তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখিয়াছিলে, সে দেহ মায়িক; এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি!'

শ্রীশ্রীমার জনৈক সন্ন্যাসী সন্তান বলিয়াছেন: কলিকাতায় মার বাড়ীর অতি নিকটে বাস করিলেও শেষের দিকে দীর্ঘকাল আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই। কেবল একদিন মাত্র মহারাজের দেওয়া দুইটি আম তাঁহাকে দিতে গিয়াছিলাম। তারপর মা দেহরক্ষা করিলেন, মহারাজেরও শরীর গেল—নিজেকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রে মা একজনকে দেখা দিয়া বলিলেন,—(আমার নাম

---

৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

৭ সুধীরা ও মীরা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মার কাছে থাকিতেন। অতঃপর চপলা রাত্রি ২টা পর্যন্ত ও প্রফুল্ল ভোর ৫টা পর্যন্ত থাকিতেন। বাণী, মালতী প্রভৃতি কম বয়সের মেয়েরা দিনের বেলা থাকিয়া বীজন করিতেন। সাতু ও বরদা (অসিতানন্দ ও ঈশানানন্দ) প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করিবার জন্য দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকিতেন।

করিয়া) অমুক তোমার কাছে আছে, তুমি ওকে দেখো। ও বড় অভিমানী, আমাকে ভাবে আমি নিষ্ঠুর! ও জানে না, ঠাকুর পর্যন্ত আমাকে বলতেন, দয়াময়ী। এই কথা কহিয়া মা অজস্র ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, ওর এই অভিমানের জন্যে আমার যে কত কষ্ট হয় তা সে একেবারেই বুঝে না। যাহাকে মা এই স্বপ্ন দিয়াছিলেন ইহজীবনে সে-ই আমার একমাত্র বন্ধু।

১৩৩৯ সালে দোলপূর্ণিমার আবীর-খেলায় কোন ছেলের অসাবধানতাবশতঃ সুরমা দেবীর কানের ঠিক পেছনে রঙের ঘটীর আঘাত লাগে, তিনি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া যান। কান দিয়া দুইএক দিন জল পড়িবার পর রক্ত ও পুঁজ পড়িতে আরম্ভ করে, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। জন্মাষ্টমীর রাত্রে যন্ত্রণা ভীষণাকার ধারণ করিল, এবং ঘা মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রাত্রের মধ্যেই একটা কিছু হইয়া যাইবে এইরূপ নিশ্চিন্ত অভিমত দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে রোগিণী অনবরত ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—আমার ঘাড়ের উপর কে বসল? আমি কি এত ভার সইতে পারি? আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্চে, শীগ্‌গির আলো জ্বাল, দেখি। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, মা এসেছিলেন, তাঁর পরণে লাল নরুন-পেড়ে কাপড়। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন! পরদিন ডাক্তার আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, রোগ সারিয়া গিয়াছে; কানের ভিতর আঁচড়ের দাগের মত দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। তিনচারি দিন পরে তাহাও আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

প্রমীলাবালা বসু লিখিয়াছেন: আমার ভাই প্রবোধ সিংহ তখন বয়স কুড়ি-একুশ বৎসর হইবে—বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার নামক স্থানে ছিল, সেখানে সে প্রত্যহ বিকালে নদীর তীরে বসিয়া গীতাপাঠ করিত। একদিন হঠাৎ একটা গরু নদীর ওপার হইতে আসিয়া তাহার কাছে শুইয়া পড়ে। সে নিজের ভাবেই গীতাপাঠ করিতেছিল আর গরুটা থাকিয়া থাকিয়া তাহার কোলের উপর মুখখানা তুলিয়া দিতেছিল। সে কোল হইতে উহার মুখ বারবার নামাইয়া দিলেও, গরুটা নিবৃত্ত না হওয়ায় একটু বেশী জোরে মুখখানা সরাইয়া দেয়, আর অল্পক্ষণ পরেই গরুটা মারা যায়। হিন্দুর ছেলে হইয়া গোহত্যা করিলাম ভাবিয়া সে কাঁদিতে থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরিয়া কাহারও সহিত দেখা করিল না, এক নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিয়া গোহত্যাজনিত পাপ মোচন করিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। ভোর-রাত্রে মা তাহাকে দেখা দিয়া কহিলেন, বাবা, তুমি গোহত্যা কর নাই, গরুটার তিনদিন থেকে অসুখ ছিল, তোমার মুখে গীতা শুনে সে গোজন্ম থেকে মুক্ত হল। পরদিন সে যখন নদীর তীরে গীতাপাঠ করিতে বসিয়াছে, একটি রাখাল ওপার হইতে আসিয়া বলিল, আমাদের একটা গরু কাল বিকালে ওপার থেকে এসে মারা গেছে—গরুটা তিনদিন কিছুই খায় নি, মরে যাবে মনে করে মালিক তার গলার দড়ি খুলে রেখেছিল। ধারোয়ারে যখন এই ব্যাপার ঘটে শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। পরে কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিলাম, মা, ভক্ত কাতর হয়ে ডাকলে আপনি কোথায় না যান? মা হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: তিনি (ঠাকুর) শতবৎসর সূক্ষ্মশরীরে ভক্ত-হৃদয়ে বাস

করবেন বলেছেন,[৮] আর তাঁর অনেক শ্বেতাঙ্গ ভক্ত আসবে। স্বামী বিবেকানন্দ 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন : 'শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ-শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূলশরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে।

শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুর হইতে অভিন্না। ঠাকুর হইতে তাঁহার ভিন্নরূপ অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। তিনিও আজ সূক্ষ্মদেহে ভক্তহৃদয়বাসিনী। জীবনের বিশেষ সঙ্কট-মুহূর্তে ও মনের অতিব্যাকুল অবস্থায় ভক্ত-সন্তান তাঁহার দর্শনাদি লাভ করিয়া যেরূপে কৃতার্থ হইতেছে, উপরিধৃত ঘটনাগুলি তাহার নিদর্শন।

নরলীলায় অবলম্বিত স্থূলসূক্ষ্ম উভয়বিধ দেহ পরিত্যক্ত হইলেও শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ বিনষ্ট হয় না। সে চিন্ময় বিগ্রহ নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যকাল বর্তমান থাকিয়া রাসরসে বিভোর। ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি,—লীলাও সত্য।

নিম্নোক্ত ঘটনায় ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার নিত্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। বলরাম-বাবুর বাড়ীর ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে একদিন মা সমাধিস্থ হন। পরে বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছিলেন : দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমাকে কত আদরযত্ন কচ্চে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েচে। ঠাকুর রয়েচেন সেখানে, তাঁর পাশে আমাকে আদর করে বসালে। সে যে কী আনন্দ বলতে পারিনি। একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েচে। তখন ভাবচি, কী করে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পাল্লুম ও দেহে হুঁশ এল।[৯]

শতবৎসর ভক্তহৃদয়ে বাস করিয়া ঠাকুর পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন; শ্রীশ্রীমাও সঙ্গে আসিবেন। নলিনবাবু একদা জিজ্ঞাসা করেন, মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেচেন? মা উত্তর দেন, হ্যাঁ ব্যবা।

আশুতোষ রায় নামে এক ব্যক্তি কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি খর্বকায় ছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ঝুনো সরষে' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার হাত তৌল করিয়া বলিয়াছিলেন, তোর হবে, তবে একটু দেরিতে। তিনি শিলঙে সরকারী কাজ পাইয়াছিলেন, তাঁহার বাসাস্থিত হরিসভায় ও অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের ভক্তগণ মিলিত হইয়া কথামৃত-পাঠ ও কীর্তনাদি করিতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম যুক্ত হইয়া আপিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হইলে ভক্তদের প্রায় সকলেই ঢাকায় আসিলেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলোচনাদি একরূপ বন্ধ রহিল। তখন

---

[৮] শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিতে শুনিতে বলিলাম, 'মা, ঠাকুর শরীর ধারণ করে জগৎকে এলেন, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম নাই।' তাহাতে মা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন 'এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমি তোমার ভিতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।'

—কেশবানন্দ-লিখিত 'শ্রীশ্রীমার অস্ফুট স্মৃতি।'

[৯] শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

ঢাকায় মোহিনীবাবুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবাদি হইত, ভক্তেরা উহাতেই যোগদান করিতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম বিচ্ছিন্ন হইয়া ঢাকার আপিস উঠিয়া গেলে ঐ দলের অনেকে রাঁচিতে বদলি হইলেন; সেই সময়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনাদি বন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় রাঁচিতে গভীর রাত্রে কাহার ডাক শুনিয়া আশুবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি 'ও ঝুনো সরষে!' আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠেন। ঠাকুর ব্যতীত তাঁহার ঐ নাম আর কেহ জানিত না। মাঘী পূর্ণিমা, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। দরজা খুলিয়া দেখেন ঠাকুর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া—পরিধানে গৈরিকবস্ত্র, পায়ে খড়ম, হাতে চিমটা। ঠাকুর আশুবাবুকে বলিলেন: এখানকার কিছু কথা হত। তা ঢাকায় না হয় দরকার না ছিল, এখানে ওটি বন্ধ কেন কল্লে? 'উটি কোরো না।' বলিয়াই ঠাকুর অন্তর্হিত হন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে অন্নপানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়: 'খড়ম-পায়ে, চিমটে-হাতে কেন দেখলে?' 'সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেচেন। বাউল বেশ - গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি। বল্লেন,—বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে হাগবে, হয়তো ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে, ভাঙ্গা পাথর-বাসন হাতে, ঝুলি বগলে; যাচ্চেন তো যাচ্চেন, খাচ্চেন তো খাচ্চেন—কোন দিক্-বিদিক্ খেয়ালই নাই!' 'বর্ধমানের রাস্তা কেন?' 'ঐ দিকে দেশ।' 'তবে কি বাঙ্গালী?' 'হ্যাঁ বাঙ্গালী। আমি শুনে বল্লুম, ও কী গো, তোমার এ কী সাধ? তিনি হেসে বল্লেন, হ্যাঁ, তোমার হাতে হুঁকো-কল্কে থাকবে। যখন বৃন্দাবনে যাই, ছেলেরা সবাই রেল থেকে নেমে চলেচে, পেছনে আমরা। গোলাপ সকলকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছিল। আমার হাতে লাটুর হুঁকো-কল্কে দিয়েছে—ওরা ফেলে গেছে। লক্ষ্মী বলচে, এই তোমার হুঁকো-কল্কে ধরা হয়ে গেল। আমিও ঠাকুর, ঠাকুর, এই আমার হুঁকো-কল্কে ধরা হয়ে গেল—বলেই অমনি ফেলে দিয়েচি।'

নিকুঞ্জদেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: একদিন [ঠাকুর] বল্লেন, 'তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেচি, তোমাদের বলব না। তোমার ধার শোধবার জন্যে আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে নেব।'

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা আরও বলিয়াছিলেন: লক্ষ্মী বলেছিল, আমাকে তামাক-কাটা কল্লেও আর আসচি না। তিনি হেসে বল্লেন,—আমি যদি আসি তো থাকবি কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।

তারকনাথ রায়চৌধুরী শ্রীশ্রীমাকে এই মর্মে পত্র লিখেন,—'মা, আমার জন্মভূমি শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থান হইতে বহুদূরে; তাঁহার লীলা দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমার সাধ, ঠাকুর যখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আবার আসিবেন তখন যেন আমি তাঁহার নরলীলা দেখিতে পাই।' উত্তরে মা লিখিয়াছিলেন, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী

জন্ম-শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৮।৩০

জন্ম—৮ই পৌষ, ১২৬০ সাল ; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ ; বৃহস্পতিবার।

সূর্যোদয় হইতে জন্ম দং ২৮।৩০ ; রাত্রি জন্ম দং ২।৯ পল।

কৃষ্ণা সপ্তমী (চান্দ্র অগ্রহায়ণ), সিংহরাশি, পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র, নরগণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, আয়ুষ্মান যোগ, মিথুন লগ্ন।

বিং—শুক্র ০।৫।১৮   অঃ—মঙ্গল ২।৮।২৬

জন্মসময়ে গ্রহস্ফুট

রবি	৮।৮।৫৩
চন্দ্র	৪।২৬।১৮
মঙ্গল	৪।২১।৪৯
বুধ	৭।১৭।১৬
বৃহস্পতি	৮।১২।৫৮
শুক্র	৯।২৬।১৫
শনি	১।৪।১৩ (বক্রী)
রাহু	১।১৭।৩৬
কেতু	৭।১৭।৩৬
লগ্ন	২।১৯।৪
দশম	১১।১০।৪
অয়নাংশ	২১°৪৮′

পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার সমগ্র ভারতের জন্য ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখের অয়নাংশ ২৩° অংশ ১৫′ কলা প্রবর্তন করিয়াছেন। তদনুসারে ১২৬০ সালের (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অয়নাংশ ২১° অংশ ৪৮′ কলা হয়। তাঁহার কোষ্ঠীতে পূর্বে গৃহীত অয়নাংশ ২১° অংশ ২২′ কলা স্থলে এক্ষণে ২১° অংশ ৪৮′ কলা গ্রহণ করা হইল। এই ২৬′ কলা প্রভেদ হেতু তাঁহার জন্মকালীন চন্দ্রস্ফুট সিংহের ২৬° অংশ ৪৪′ কলা স্থলে ২৬° অংশ ১৮′ কলা হওয়ায় তাঁহার প্রচলিত জন্মনক্ষত্র উত্তরফল্গুনী স্থলে পূর্বফল্গুনী হইল।

তিরোভাব—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল ; ২০শে জুলাই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ; মঙ্গলবার রাত্রি ১টা ৩০ মিঃ কলিকাতা। শুক্লা ষষ্ঠী, কন্যারাশি হস্তানক্ষত্র, শিবযোগ।

শ্রীশ্রীমার ছয়খানি জন্মপত্রিকা পাওয়া গিয়াছে। জন্মতারিখ ও সময়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

জন্মপত্রিকা	জন্মতারিখ ও সময়
১। বেলুড় মঠে রক্ষিত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-প্রণীত	…শকাব্দাদি ১৭৭৪।৮।৭।২৮।৩০
২। জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে রক্ষিত	·· শকাব্দাদি ১৭৭৩।৮।৭।২৯।৪৮
৩। স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতা আশুতোষ মিত্রকে প্রেরিত	· শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৯।৪৮।১৬
৪। গণেন মহারাজের নিকট রক্ষিত	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৯।৪৮।১৬
৫। শ্রীশচন্দ্র ঘটক-প্রেরিত	…শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৬।২১
৬। কালীকুমার সিংহ-প্রণীত ও অক্ষয় কুমার সেন কর্তৃক স্বামী সারদানন্দের নিকট প্রেরিত এবং সাপ্তাহিক ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত	…শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২২।১৮।১৬

এই জন্মপত্রিকাগুলিতে জন্মতারিখ ও রাশিচক্রে গ্রহসংস্থান সম্বন্ধে মতভেদ নাই, কিন্তু জন্মসময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১নং কোষ্ঠীতে ১৭৭৪ শকাব্দ গতে অর্থাৎ ১৭৭৫ শকাব্দ বুঝিতে হইবে। ২নং কোষ্ঠীতে ১৭৭৩ শকাব্দ ভুল আছে। এই কোষ্ঠীতে রাশিচক্রে ১৭৭৫ শকাব্দের গ্রহসংস্থান দেওয়া আছে। কোষ্ঠীগুলিতে দিবামান দং ২৬।২৩ দেওয়া আছে। এই দিবামান অনুসারে ৬নং কোষ্ঠীতে জন্মসময় দং ২২।১৮ সূর্যাস্তের প্রায় ৪ দণ্ড পূর্বে পড়ে এবং বৃষলগ্ন হয়। বৃষলগ্নের সপ্তমভাব অত্যন্ত পীড়িত থাকে এবং শ্রীশ্রীমার স্বামিসৌভাগ্য, দাম্পত্যজীবন ইত্যাদির মিল হয় না। এইজন্য এই জন্মসময় গ্রহণ করা যায় না। ৫নং কোষ্ঠীতে জন্মসময় দং ২৬।২১ ঠিক সূর্যাস্ত সময়ে পড়ে। ইহাতে রবিস্ফুট ধনুর ১২° অংশ ও লগ্নস্ফুট মিথুনের ১২° অংশ দেওয়া আছে। ৮ই পৌষ সূর্যাস্তকালে রবি বা লগ্নের স্ফুট ১২° অংশ হইতে পারে না।

২নং, ৩নং ও ৪নং এই তিনখানি কোষ্ঠীতে একই জন্মসময় দং ২৯।৪৮।১৬ অর্থাৎ রাত্রি দং ৩।২৬ দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে ৪নং কোষ্ঠীখানি তুলট কাগজে লেখা, অতি পুরাতন ও জীর্ণ। ইহা বর্তমানে সকল কোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং শ্রীশ্রীমার বাল্যকালে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। রাত্রি জাত দং ৩।২৬ সময়ে লগ্ন মিথুনের ২৭° অংশ উদিত হয় এবং ৪নং কোষ্ঠীতে লিখিত শুক্রের দ্রেক্কাণ, বৃহস্পতির নবাংশ ও ত্রিংশাংশ ও শনির দ্বাদশাংশ এই সকল বর্গ এবং বৃহস্পতির যামার্ধে রবির দণ্ড পায় না। লগ্নের এই ভুল বর্গগুলি ৩নং কোষ্ঠীতেও দেওয়া আছে। কোষ্ঠীগুলিতে রাত্রিমান দং ৩৩।৩৭ অনুসারে দং ২।৭ হইতে দং ৩।৯ মধ্যে বৃহস্পতির যামার্ধে রবির দণ্ড পাওয়া যায় এবং রাত্রি ২ দণ্ডের পর মাত্র কয়েক পল সময়ের মধ্যে জন্ম হইলে উক্ত ত্রিংশাংশ ভিন্ন অন্য বর্গগুলির মিল হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া, এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবনকথা পর্যালোচনা করিয়া ৺নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের প্রণীত

তাঁহার জন্মপত্রিকায় যে রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল জন্মসময় লিখিত আছে তাহা গ্রহণ করাই সংগত মনে করি।

শ্রীশ্রীমার জন্ম ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল সময়ে মিথুন লগ্নের ১৯° অংশ ৪' কলা উদিত ছিল। তখন লগ্নের তৃতীয়ে চন্দ্র মঙ্গল, ষষ্ঠে কেতু বুধ, সপ্তমে রবি বৃহস্পতি, অষ্টমে শুক্র এবং দ্বাদশে শনি রাহু অবস্থিত ছিল।

পরাশর মতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণপতির যোগ বিশেষ শুভফলপ্রদ, কিন্তু ইহারা দুঃস্থানপতির অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম বা একাদশ স্থানের অধিপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে এই যোগ ভঙ্গ হয়। লঘুপারাশরী মতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণপতি স্বয়ং দুঃস্থানপতি হইলেও সম্বন্ধ হেতু বলবান হইয়া যোগকারক হন। দেখা যায়, লগ্ন বা চন্দ্র হইতে প্রত্যেক ভাবের যোগকারক সেই ভাব হইতে কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকিলে ভাবটি বলবান হয় এবং তাহার শুভফলের বৃদ্ধি ও অশুভফলের হ্রাস হইয়া থাকে।

লগ্ন বা চন্দ্র হইতে বা উভয় স্থান হইতে জন্মকুণ্ডলীর বিচার করা হয়; বিশেষতঃ এস্থলে চন্দ্র আত্মকারক। শ্রীশ্রীমার জন্মকুণ্ডলীতে রবি-বৃহস্পতির যোগ সিংহ ও ধনু রাশির যোগকারক। চন্দ্র-মঙ্গলের যোগ মেষ ও বৃশ্চিক রাশির যোগকারক। চন্দ্র-বৃহস্পতির যোগ মেষ রাশির, মঙ্গল-বৃহস্পতির যোগ মেষ, সিংহ ও ধনু রাশির, শনি-বুধের যোগ বৃষ ও কুম্ভ রাশির এবং শনি-শুক্রের যোগ বৃষ ও মকর রাশির যোগকারক। লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, একাদশ ও দ্বাদশ এই সাতটি ভাব এবং চন্দ্র হইতে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম এই সাতটি ভাব যথাক্রমে সিংহ, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মেষ ও বৃষ রাশিতে পড়িয়াছে। এই সকল ভাবের যোগকারক থাকায় তাহারা বলবান এবং তাহাদের শুভফলের বৃদ্ধি ও অশুভ ফলের হ্রাস হইতেছে। জন্মকুণ্ডলীতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণগুলি বলবান থাকায় এবং গ্রহদিগের যেরূপ স্থিতি ও পরস্পর সম্বন্ধ দেখা যায় তাহাতে শ্রীশ্রীমার জীবনের গতি যে সাধারণ মানবের মত নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জন্মকুণ্ডলীর তৃতীয় স্থান হইতে মানবের সহজ ভাব, পরাক্রম, ধৈর্য ইত্যাদি বিচার করা হয়। লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট চন্দ্র-মঙ্গল অবস্থিত। বৃহস্পতি জ্ঞানদাতা, সিংহরাশিস্থ চন্দ্র শান্ত ও আত্মসমাহিত ভাবের কারক এবং মঙ্গল সাহস ও পরাক্রমের কারক। মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বগলামুখী। বৃহস্পতির দৃষ্টিতে চন্দ্রের শান্তভাব পরিপুষ্ট ও মঙ্গলের উদ্দামভাব সংযত হইতেছে—আত্মসমাহিতা সরস্বতীর অতিশান্ত রূপে বগলার সংহাররূপটি সংযত অবস্থায় ছিল।

লগ্নের সপ্তমে যোগকারক দুইটি সাত্ত্বিক গ্রহ রবি ও বৃহস্পতি অবস্থিত। এই শুভ যোগের ফলে তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের ন্যায় যুগাবতারের পত্নী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং বিবাহ হেতু তাঁহার জীবন পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে এইরূপ অনুকূল পরিবেশও পাইয়াছিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন। রবি মহত্ত্ব, শুচিতা, সংযম ইত্যাদির কারক। লগ্নের সপ্তমে এই দুইটি গ্রহের প্রভাবে এবং চন্দ্র বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট ও শুক্র অষ্টমে থাকায় শ্রীশ্রীমা কামনাশূন্য ও পবিত্রচিত্ত ছিলেন। সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় স্বামী লইয়া সংসার তিনি করেন নাই, স্বামীর সহিত

দৈহিক সম্বন্ধও তাঁহার হয় নাই। ঠাকুর তাঁহাকে অভিষেকপূর্বক ৺ষোড়শী মহাবিদ্যা-রূপে পূজা করেন। তখন শ্রীশ্রীমার বয়স ১৯ বর্ষ ৫ মাস এবং বিংশোত্তরী সিংহরাশি-গত মঙ্গলের দশায় মঙ্গলের দশমস্থ বৃষরাশিগত শনির অন্তর্দশা চলিতেছিল। মঙ্গল সিংহরাশির এবং শনি বৃষরাশির যোগকারক। এইরূপ মঙ্গলের দশা ও শনির অন্তর্দশা সকলের পক্ষেই গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নতির সময়।

লগ্ন হইতে পাঁচটি গ্রহ বুধ, কেতু, শুক্র, শনি ও রাহু দুঃস্থানগত অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থানগত। ইহা রোগ, শোক, বৈধব্য, দারিদ্র্য ইত্যাদির কারক। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদের ন্যায় তিনি বহু দুঃখকষ্ট পাইয়াছেন। শ্রীশ্রীমার রাহুর দশায় পাপদৃষ্টযুক্ত বুধের অন্তর্দশা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইবার কথা; এই সময় ঠাকুরের দেহত্যাগ হইয়াছিল।

লগ্ন, চন্দ্র ও বৃহস্পতির পঞ্চম স্থান হইতে সন্তানভাবের বিচার হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চমপতি শুক্র নিধনস্থানে থাকায় কয়েকজন ভক্ত সন্তানের মৃত্যু হেতু তিনি দুঃখ পাইয়াছেন। চন্দ্র হইতে এবং বৃহস্পতি হইতে পঞ্চম স্থান বলবান ও শুভফলপ্রদ থাকায় পরমহংসদেবের লোকান্তরের পর শ্রীশ্রীমার মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বাহিরের জনসমাজেও ছড়াইয়া পড়ে। অপূর্ব দাম্পত্যজীবন ও অপার্থিব মাতৃভাবের আদর্শ তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জননীর স্নেহ পাইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই কৃতার্থ হইয়াছে।

এই মহীয়সী নারী ৬৬ বর্ষ ৭ মাস বয়সে বিংশোত্তরী শনির দশায় শুক্রের অন্তর্দশায় এবং অষ্টোত্তরী শুক্রের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশার দেহত্যাগ করেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুখ্য ঘটনাবলীর সময়নির্দেশ

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৬০, ৮ই পৌষ (কৃষ্ণা সপ্তমী)	১৮৫৩, ২২শে ডিসেম্বর	শ্রীশ্রীমার জন্ম।
১২৬৬, বৈশাখের শেষ	১৮৫৯, মে	বিবাহ, শ্বশুরালয়ে গমন।
১২৬৭, অগ্রহায়ণ	১৮৬০	২য় বার শ্বশুরালয়ে।
১২৭১	১৮৬৪	দেশে দুর্ভিক্ষ।
১২৭৩	১৮৬৬	৩য় ও ৪র্থ বার গমন।
১২৭৪	১৮৬৭	৫ম বার গমন; পতিসম্মিলন।
১২৭৮, ১১ই চৈত্র	১৮৭২, ২৩শে মার্চ	দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮০, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৭৩, ২৫শে মে	ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা।
১২৮০, কার্তিক	১৮৭৩	জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।
১২৮০, ১৪ই চৈত্র	১৮৭৪, ২৬শে মার্চ	পিতা রামচন্দ্রের দেহত্যাগ।
১২৮১, বৈশাখ	১৮৭৪, এপ্রিল	২য় বার দক্ষিণেশ্বরে।
১২৮২, আশ্বিন	১৮৭৫	রোগাক্রান্ত হইয়া জয়রামবাটী।- ৺সিংহবাহিনী-জাগরণ।
১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন	১৮৭৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী	চন্দ্রমণির গঙ্গাপ্রাপ্তি। মার প্লীহা-চিকিৎসা।
১২৮২, ৫ই চৈত্র	১৮৭৬, ১৭ই মার্চ	৩য় বার দক্ষিণেশ্বরে।
১২৮৩, ১০ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৭৬, ২২শে মে	সাবিত্রীব্রত।
১২৮৩	১৮৭৬	ঠাকুরের সঙ্গে দেশে গমন।
১২৮৪, ৩০শে কার্তিক	১৮৭৭, ১৪ই নভেম্বর	প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজা।
১২৮৪, মাঘ	১৮৭৮	ডাকাত বাবার ঘটনা।
১২৮৭, ফাল্গুন বা চৈত্র	১৮৮১	দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন,	১৮৮২	" "
১২৯০, মাঘ	১৮৮৪	" "
১২৯১, ফাল্গুন	১৮৮৫, মার্চ	" "
১২৯২, ভাদ্রের শেষাশেষি বা আশ্বিনের আরম্ভ হইতে	১৮৮৫, সেপ্টেম্বর হইতে	শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবা।
১২৯২, ২৭শে অগ্রাহয়ণ হইতে	১৮৮৫, ১১ই ডিসেম্বর হইতে	কাশীপুরে। ঠাকুরের সেবা।
১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ	১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট	ঠাকুরের তিরোভাব।
১২৯৩, ৬ই ভাদ্র	১৮৮৬, ২১শে আগষ্ট	কাশীপুর ত্যাগ।
১২৯৩, ১৫ই ভাদ্র	১৮৮৬, ৩০শে আগষ্ট	৺বৃন্দাবন যাত্রা। রাধাভাবে সম্বৎসর।
১২৯৪, ভাদ্র	১৮৮৭	কলিকাতা হইয়া কামারপুকুর

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৯৫, কার্তিক পর্যন্ত ৬ মাস	১৮৮৮	বেলুড়ে। নির্বিকল্প সমাধি।
১২৯৫, ২১শে কার্তিক	১৮৮৮, ৫ই নভেম্বর	৺পুরী যাত্রা।
১২৯৫, ২৯শে পৌষ	১৮৮৯, ১২ই জানুয়ারী	কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।
১২৯৫ মাঘ-ফাল্গুন	১৮৮৯, ফেব্রুয়ারী	আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর।
১২৯৬, ২১শে ফাল্গুনে	১৮৯০, ৪ঠা মার্চ	কলিকাতায় আগমন।
১২৯৬, চৈত্র	১৮৯০, মার্চ	গয়া যাইয়া পিণ্ডদান।
১২৯৭, ১লা বৈশাখ	১৮৯০, ১৩ই এপ্রিল	বলরাম বসুর দেহত্যাগ।
১২৯৭, জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র	১৮৯০	ঘুসুড়ীতে। রক্তামাশয়।
১২৯৭, আশ্বিন	১৮৯০	বরাহনগরে
১২৯৭, কার্তিক	১৮৯০, অক্টোবর	দেশে প্রত্যাবর্তন।
১৩০০, আষাঢ় হইতে কয়েক মাস	১৮৯৩	বেলুড়ে। পঞ্চতপা।
১৩০০, শেষভাগ	১৮৯৪	কৈলোয়ারে দুইমাস।
১৩০১, ভাদ্র-আশ্বিন	১৮৯৪, সেপ্টেম্বর	বেলুড়ে।
১৩০১, আশ্বিনের শেষভাগ	১৮৯৪, অক্টোবর	দুর্গোৎসবে আঁটপুরে।
১৩০১, ফাল্গুন হইতে		
১৩০২, বৈশাখের প্রথম ভাগ	১৮৯৫	২য় বার কাশী-বৃন্দাবন।
১৩০২, বৈশাখের শেষভাগ	১৮৯৫, মে	মাষ্টারের কলুটোলার বাসায়।
১৩০৩, প্রথমভাগে ৫।৬ মাস	১৮৯৬	সরকারবাড়ী লেনে। একমাস ৫৯-২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে।
১৩০৪, শেষভাগ হইতে		
১৩০৬, শ্রাবণ	১৮৯৮, মার্চ—'৯৯, আগষ্ট	১০-২ বোসপাড়া লেনে।
১৩০৫, ২৮শে কার্তিক	১৮৯৮, ১৩ই নভেম্বর	বেলুড় মঠে স্বহস্তে ঠাকুরপূজা।
১৩০৫, ১৫ই চৈত্র	১৮৯৯, ২৮শে মার্চ	যোগানন্দের মহাসমাধি।
১৩০৬, ১৮ই শ্রাবণ	১৮৯৯, ২রা আগষ্ট	অভয়ের দেহত্যাগ।
১৩০৬, ১৩ই মাঘ	১৯০০, ২৬শে জানুয়ারী	রাধারাণীর জন্ম।
১৩০৭, কার্তিক হইতে কয়েক মাস	১৯০০, নভেম্বর হইতে	১৬ বোসপাড়া লেনে।
১৩০৮, ১—৫ কার্তিক	১৯০১, ১৮—২২ অক্টোবর	৺পূজা উপলক্ষে বেলুড়ে।
১৩০৯, ২০শে আষাঢ়	১৯০২, ৪ঠা জুলাই	বিবেকানন্দের মহাসমাধি।
১৩১০, মাঘ হইতে		
১৩১২, জ্যৈষ্ঠ	১৯০৪—৫	২-১ বাগবাজার ষ্ট্রীটে।
১৩১১, অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ। হইতে মাঘের প্রথম ভাগ	১৯০৪—৫	২য় বার পুরীধামে।
১৩১১, চৈত্র	১৯০৫	নীলমাধবের দেহত্যাগ।
১৩১২, মাঘের ১ম সপ্তাহ	১৯০৬, জানুয়ারী	শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৩১৩, ২৪শে আষাঢ়	১৯০৬, ৮ই জুলাই	গোপালের মার গঙ্গাপ্রাপ্তি।
১৩১৪, আশ্বিনের শেষভাগ হইতে ২৪শে কার্তিক	১৯০৭, অক্টোবর-নভেম্বর	গিরিশবাবুর ৺পূজা উপলক্ষে বসু-ভবনে।
১৩১৫, ফাল্গুনের শেষভাগ	১৯০৯, মার্চ	কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে।
১৩১৬, ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৯শে কার্তিক	১৯০৯, ২৩শে মে হইতে ১৫ই নভেম্বর	কলিকাতার নিজ বাড়ীতে। বসন্তরোগ।
১৩১৭, ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘের শেষ	১৯১০, ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯১১, ফেব্রুয়ারী	কোঠারে
১৩১৭, মাঘের শেষ হইতে ২ মাস	১৯১১	দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ; রামেশ্বর-দর্শন।
১৩১৭, ১০—১২ চৈত্র	১৯১১, ২৪—২৬ মার্চ	বাঙ্গালোরে।
১৩১৭, ২৮শে চৈত্র	১৯১১, ১১ই এপ্রিল	পুরী হইতে কলিকাতা।
১৩১৮, ৩রা জ্যৈষ্ঠ	১৯১১, ১৭ই মে	জয়রামবাটী যাত্রা।
১৩১৮, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ	১৯১১, ১০ই জুন	রাধারাণীর বিবাহ।
১৩১৮, ৪ঠা ভাদ্র	১৯১১, ২১শে আগষ্ট	রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি।
১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ	১৯১১, ২৪শে নভেম্বর	কলিকাতায় আসা। পথে কোয়ালপাড়ায় ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা।
১৩১৯, ৩০শে আশ্বিন হইতে ৫ই কার্তিক	১৯১২, ১৬-২১ অক্টোবর	৺দুর্গোৎসবে বেলুড়ে।
১৩১৯, ২০শে কার্তিক হইতে ১লা মাঘ	১৯১২, ৫ই নভেম্বর হইতে ১৯১৩, ১৪ই জানুয়ারী	৩য় বার কাশীতে।
১৩১৯, ৩রা মাঘ হইতে ১০ই ফাল্গুন	১৯১৩, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী	কলিকাতায়।
১৩২০, ১৩ই আশ্বিন	১৯১৩, ২৯শে সেপ্টেম্বর	দেশ হইতে কলিকাতা।
১৩২২, ৬ই বৈশাখ	১৯১৫, ১৯শে এপ্রিল	শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেশে যাত্রা। [দি
১৩২২, ভাদ্র	১৯১৫	কোয়ালপাড়ায় ১৫ দিন।
১৩২৩, ২রা জ্যৈষ্ঠ	১৯১৬, ১৫ই মে	জয়রামবাটীতে গৃহপ্রবেশ।
১৩২৩, ২২শে আষাঢ়	১৯১৬, ৬ই জুলাই	শরৎ মহারাজের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা। অর্পণনামা রেজিস্ট্রী।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৩২৩, ১৭—২০ আশ্বিন	১৯১৬, ৩—৬ অক্টোবর	দুর্গোৎসবে বেলুড়ে।
১৩২৩, ১৮ই মাঘ	১৯১৭, ৩১শে জানুয়ারী	কলিকাতা হইতে যাত্রা। [দি] বিষ্ণুপুরে ২ দিন।
১৩২৪, ২০শে পৌষ হইতে মাঘের মাঝামাঝি	১৯১৮, ৪ঠা জানুয়ারী হইতে সমগ্র মাস	জয়রামবাটীতে ভীষণ জ্বর।
১৩২৪, ফাল্গুনের শেষ হইতে		
১৩২৫, ১৪ই বৈশাখ	১৯১৮	কোয়ালপাড়ায় ভীষণ জ্বর।
১৩২৫, ২৪শে বৈশাখ	১৯১৮, ৭ই মে	শরৎ মহারাজের সঙ্গে কলিকাতা।
১৩২৫, ১৪ই শ্রাবণ	১৯১৮, ৩০শে জুলাই	প্রেমানন্দের মহাসমাধি।
১৩২৫, ১৬ই পৌষ	১৯১৮, ৩১শে ডিসেম্বর	নিবেদিতা-স্কুলের বোর্ডিংএ। তথায় কয়েকদিন।
১৩২৫, ১৩ই মাঘ	১৯১৯, ২৭শে জানুয়ারী	দেশে যাত্রা। [দি]
১৩২৫, ১৩ ১৬ মাঘ	১৯১৮, ২৭—৩০ জানুয়ারী	বিষ্ণুপুরে। [দি]
১৩২৫, ১৭ই মাঘ হইতে	১৯১৯, ৩১শে জানুয়ারী	
১৩২৬, ৩রা শ্রাবণ	হইতে ১৯শে জুলাই	কোয়ালপাড়ায়।
১৩২৬, ৫ই বৈশাখ	১৯১৯, ২০শে এপ্রিল	ন্যাড়ার মৃত্যু।
১৩২৬, ২৫শে অগ্রহায়ণ	১৯১৯, ১০ই ডিসেম্বর	জন্মতিথি হইতে জ্বর।
১৩২৬, ১২ই ফাল্গুন	১৯২০, ২৪শে ফেব্রুয়ারী	কলিকাতা যাত্রা।
১৩২৬, ১৫ই ফাল্গুন	১৯২০, ২৭শে ফেব্রুয়ারী	কলিকাতায় আগমন।
১৩২৭, ১১ই বৈশাখ	১৯২০, ২৪শে এপ্রিল	অদ্ভুতানন্দের মহাসমাধি।
১৩২৭, ৩১শে বৈশাখ	১৯২০, ১৩ই মে	বলরাম বসুর দেহত্যাগ।
১৩২৭, ৬ই জ্যৈষ্ঠ	১৯২০, ২০শে মে	বরদাপ্রসাদের দেহত্যাগ।
১৩২৭, ৪ঠা শ্রাবণ	১৯২০, ২০শে জুলাই	তিরোভাব।

ভানুপিসীর কথা

জয়রামবাটী-অঞ্চলে বিরল যেসব ভক্তেরা ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ভানুপিসী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। সুদীর্ঘকাল তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কাটাইয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা, কাশী ইত্যাদি স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন।

পরবর্তী কালে, ১৩১৭ সালের কাছাকাছি, ভানুপিসীকে ভক্তেরা যখন দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৬০ বৎসর। পাতলা, সরলতামাখা চেহারা, সদা সহাস্য মুখ আর নিঃসঙ্কোচ ভাব ভিতরের আনন্দ যেন বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

ভানুপিসী জয়রামবাটীর ক্ষেত্র বিশ্বাসের কন্যা, জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁহার ফুলুই গ্রামে বিবাহ হয়। একটি কন্যা জন্মিবার পর প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেন। কন্যাটি পূর্বেই মারা গিয়াছিল। কচিৎ কখন শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরটি ইন্দুমতী দেবীর হাতে দিয়া বলিতেন: মা, দুটি করে তুলসী তুলবে। 'তুলসীপত্রং রামকৃষ্ণায় নমঃ' বলে ঠাকুরের পাদপদ্মে দেবে।

ভানুপিসী ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা ছিলেন। হাতমুখ নাড়িয়া, নাচিয়া, গাহিয়া কথা কহিতেন; ভক্তদের কাছে ঐশ্বরিক প্রসঙ্গ করিয়া আর শেষ হইত না। যাঁহারা দুইচারি দিন জয়রামবাটীতে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, পিসীর কাছে ঠাকুর ও মার কথা শুনিয়া আনন্দে তাঁহাদের অবসরকাল কাটিত। সময়বিশেষে কাহাকেও কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পিসী প্রসাদী পান[১], কড়াই-ভাজা, তালবড়া ইত্যাদি খাওয়াইয়া ভক্তসেবা করিতেন। ভক্তদের সকলেই ছিলেন তাঁহার নাতি; কাহাকেও 'বড়লাতি' কাহাকেও বা বন্ধু সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। সুবেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, বড়লাতি এক গিরিশবাবুকে বলতুম আর তোমাকে বলচি। গিরিশবাবুর

---

[১] ঠাকুরকে পান-ভোগ দেওয়ার ইতিহাস: ঠাকুর জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গরস ও সঙ্গীত একটি আনন্দের হাট সৃষ্টি করিয়াছে। জনৈকা রমণী তাঁহার শ্রীঅঙ্গে একগাছি ফুলের মালা দিবামাত্র তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং মধুরকণ্ঠে 'যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে একেবারে গভীর সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। বাড়ীতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ অনুমান করিল মালার ফুলের মধ্যে থাকিয়া বিষধর সর্প দংশন করিয়াছে। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা অতীত হইলে পরদিন সমাধি-ভঙ্গ হইল। এই ঘটনার পরে আর কাহাকেও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভানুপিসীর বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি সারাদিন ঘরে বসিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার মনে হইল ঠাকুরকে একটা পান খাওয়াইতে পারিলেও সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষা কতকটা তৃপ্ত হইত। বিকালে ঠাকুর বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পিসীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, একটা পান দেবে? বলিয়াই তালপুকুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পিসী কয়েকটি পান সাজিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর তালপুকুরের ধারে আপন মনে পাদচারণ করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন, পান এনেচ? বেশ, আজ থেকে আমাকে পান খাওয়াবে। [নীলকান্ত চক্রবর্তী-লিখিত]

মত তিনিও থিয়েটার করিতে ভালবাসেন শুনিয়া পিসীর কি আনন্দ! কেননা নামকরণ ঠিকঠিক হইয়াছে। শ্রীশ ঘটক ছিলেন বন্ধু।

শিলং হইতে কতিপয় ভক্ত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা থেকে আসচ? ভক্তেরা বলিলেন, অনেক দূর। পিসী বলিলেন, তা হবে না? বিষ্টুপুর, তমলুক থেকে লোক আসে, আর আমাদের পোড়া দেশের কিছু হল না—প্রদীপের নীচে আলো হয় না।

ভূদেব মুখুজ্যে-প্রমুখ ভক্তেরা ভানুপিসীর ঘরের বারান্দায় বসিয়া ঠাকুরের কথা কিছু শুনিতে চাহিলে কতক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, চোখে জলের ধারা, পিসী বলিতে লাগিলেন: নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ী এসেচেন, আমার এখানে এলেন। আমি আসন পেতে বসতে দিলুম এই বারান্দায় বাঁধারে। মুখে মা-মা ধ্বনি। দেখি শরীর স্থির, নীলবর্ণ হয়ে গেছে; ভয়ে মরে যাই। কিন্তু জানতুম এইরকম মাঝে মাঝে হয়। আমরা রাশি রাশি ফুল এনে তাঁর শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলুম, আর নাম-সংকীর্তন হতে লাগল।

ভানুপিসী শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমার, মার গর্ভধারিণীর ও নিজের কথা ভক্তদের কাছে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন:

ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী এলে জয়রামবাটীর লোকেরা তাঁকে খ্যাপা জামাই বলত। তিনি কখন কখন লাফ দিয়ে উঠে বলতেন, 'এবার যবন চণ্ডাল আদি করি কাকেও বাকি রাখব না।' তা শুনে তারা বলত, কী খ্যাপা গো, কী খ্যাপা!

আমার ঠাকুরের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। ঠাকুর যখন জয়রামবাটী আসতেন, তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটে ছুটে যেতুম। তাঁকে দেখতে পাড়ার যত মেয়েরাও এসে জড় হত; মেয়েদের দেখে ঠাকুর এমন সব কথা কইতেন যে হেসে হেসে তাদের পেট ছিঁড়ে যেত আর লজ্জায় পালাত। তখন ঠাকুর বলতেন, 'দেখলে গা, আগড়াগুলো সব উ-উড়ে গেল। এবার তোমরা বস, কথা হবে।'

তখন কম বয়েস, মুখুজ্যেদের পাগলা জামাইয়ের কাছে যেতে আমার বড় ভাই গৌরদাদা নিষেধ কত্ত। কখন কখন ঠাকুর 'ঐ গৌরদাদা এল' বলে ভয় দেখাতেন আর আমি জড়সড় হতুম। আমাকে জড়সড় দেখে ঠাকুর বলতেন, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

তাঁর কাছে আসি বলে আমাকে অনেক সইতে হয় জেনে ঠাকুর বলেছিলেন: যখন গৌরদাদা তোকে শাসাতে আসবে তখন তুই দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে নাচবি আর বলবি, ভজ মন গৌরনিতাই। তা হলে তোকে পাগল মনে করে সে কিছু বলবে না।

একদিন ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তোমার নাম কি? আমি বল্লুম, মানগরবিণী। 'এ তোমার কে হয়?—কী বলে ডাকে?' 'এ কে?' 'সারদা'। 'পিসী।' 'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল, ভানুপিসী।' এই বলে ঠাকুর গান ধরলেন, 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

একবার কামারপুকুর যাবার সময় ঠাকুর আমাকে বল্লেন, 'ওরে তুই খি-খি-খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?' অমনি তাঁর জন্যে কয়েকটি পান সাজতে ছুটে

গেলুম। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি ঠাকুর অনেক দূরে চলে গেছেন। আমি পেছনে ছুটতে লাগলুম। ঠাকুর গোঁভরে চলেচেন, মেয়েমানুষ—সাহস করে তাঁকে ডাকতে পাল্লুম নি। দুই একখানি গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তিনি পেছনে ফিরে দাঁড়ালেন, আর আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, ওরে, তুই এতদূরে এসেচিস? আমি বল্লুম, আপনি পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেচি। ঠাকুর খুব খুশী হয়ে বল্লেন, তোর হবে—তোর হবে—তোর হবে। তারপর পান হাতে করে বল্লেন: মেয়েমানুষ হয়ে এতদূর এলি, এখন বাড়ী ফিরে গেলে তোরে যে ঠেঙ্গাবে। তুই এক কাজ করিস, কুমোরবাড়ী থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ী যাস। তা হলে তারা মনে করবে যে তুই কুমোরবাড়ী গিয়েছিলি।

আমার খুব কঠিন অসুখ করেছিল—মরণাপন্ন অবস্থা। মা দেখতে এসে বল্লেন, পিসী, তুমিও চলে যাবে? আমি কার সঙ্গে কথা কইব? আমি বল্লুম, মা, আমি কী জানি; তুমি ইচ্ছে কল্লেই রাখতে পার। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় দেখি, মা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে, আমার মুখে চরণামৃতের মত কিছু দিয়ে বলচেন, পিসী, খাও - খাও। তার পর হতেই ভাল হতে লাগলুম। সুস্থ হয়ে বল্লুম, মা, তুমি এমন করে আমাকে বাঁচালে? মা বল্লেন, পিসী, ওসব ঠাকুরের ইচ্ছে।

একদিন সাদাচোখে মাকে চতুর্ভুজারূপে দর্শন করেছিলুম। যখন মা সামনের দিকে মুখ করে, তখন দেখেছিলুম ঠিক এমনি মা--দ্বিভুজা মূর্তি; আর যখন আমার দিকে পেছন ফিরে, তখন চতুর্ভুজা মূর্তি।

একদিন মাকে বল্লুম, আমি যেন ঠাকুরের গান শুনতে পাই যখন তুমি গাও। মা বল্লেন, কি জানি বাপু, তুমিই জান। আমি বল্লুম, ঠাকুর তোমার ভিতর আছেন। মা বল্লেন, আমার কি চার হাত দেখতে পাও?

ঠাকুরের শাশুড়ী আগে দুঃখ করে বলতেন, আমার সারদার ছেলেপুলে হবে না। মা এখন বলেন, পিসী, দেখ আমার কত ছেলেপুলে।

ঠাকুরের শাশুড়ী আগে বলতেন, খ্যাপা জামাই গো খ্যাপা জামাই!—আমার সারদার কত কষ্ট হবে। পরে তাঁকে ঠাকুরের পট পুজো কত্তে দেখে বলতুম, এখন কেন গো, আগে যে খ্যাপা জামাই বলতে?[২]

একদিন ভক্তদের সাক্ষাতে ভানুপিসী কহিলেন, মা, লোকে তোমাকে আগে বলত, খ্যাপার বউ। বলিয়াই গান ধরিলেন, 'খ্যাপা খ্যাপা সবে বলত দিগম্বরে, যন্ত্রণা সয়েচ কত ঘরে পরে, দ্বারী নাকি এবার হয়েছে তোমার দ্বারে, দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে—কী আনন্দের কথা উমে।' তারপর বলিলেন: মা, এবার শরৎ মহারাজ

---

২ শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যে বরাবর একটি স্নেহমধুর সম্বন্ধ ছিল, যাহা পরে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কে পরিণত হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: কামারপুকুরে আমার মা আসাতে ঠাকুর কত আদরযত্ন কল্লেন আর বল্লেন, আপনি আচার তৈরি করে খাওয়ান। [নি]

একদিন শ্যামাসুন্দরী ভাত ডেলা পাকাইয়া হাতে রাখিয়া মনে মনে ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ উপস্থিত হইয়া হাত পাতিয়া বলিলেন, দাও আমাকে। ঠাকুর ডেলাটি খাইয়া সরিয়া পড়িলেন। [বি]

তোমার দ্বারী হয়ে বসে আছেন। আর দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে—(ভক্তদের প্রতি) তোমরা সব ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, কত কষ্ট করে মার দর্শন পাচ্চ! শুনিয়া মা ঈষৎ হাস্য করিলেন।

শ্রীশ্রীমা কাশীতে আছেন, মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। নীচের তলায় ভানুপিসীর সঙ্গে দেখা হইতেই ফষ্টিনাষ্টি সুরু হইল, পিসী হাত নাড়িয়া গান ধরিলেন: কালো বেরাল কে পুষেছে পাড়াতে, তোরা ধরে দে গো ললিতে। সেই বেরালকে ধরতে পেলে বাঁধব বেরাল পাটেতে॥ কোন্ ভাতার-পুত-খাগী ও সে বেরাল-সোহাগী, ভাঁড়ে রাখতে দেয় না ঘি; দই খেয়েছে, ভাঁড় ভেঙ্গেছে, মুখ পুঁছেছে কাঁথাতে॥ গান শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হইয়া মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে এত জল ঝরিতে লাগিল যে, গায়ের সম্মুখভাগ একেবারে ভিজিয়া গেল। তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, ভানি, তুই তো সামান্য নস—যে রাখাল মহাসাগর তাকেও উদ্বেলিত করে দিয়েচিস!

জয়রামবাটীতে সুরেনবাবু মাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, রাস্তায় ভানুপিসীর সঙ্গে দেখা। পিসী বলিলেন, ওগো, এখানে বস, আগে বৃন্দার সঙ্গে পরিচয় কর, তবে না রাধার দর্শন পাবে। একদিন তিনি পিসীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছেন, মা রাধুকে পাঠাইলেন তাহাকে ডাকিয়া নিতে। রাধু আসিয়া বলিল, বেলা অনেক হয়েচে, মা আপনাকে এখুনি যেতে বলেচেন। তখনও গল্পের জের চলিতেছিল, যাই যাই করিয়াও যাওয়া হইতেছিল না। বিরক্ত হইয়া রাধু কহিল, আপনি এই পাগলটার সঙ্গে বসে কী গল্প কচ্চেন? পিসী বলিলেন: ওলো কুটিলে, গেলি নি সে বনে, কল্লি নি কৃষ্ণ-সেবনে। তুই কেবল মা মা-ই কচ্চিস, তোর মা কে, তুই জানিস?

আর একবার সুরেনবাবু জয়রামবাটী গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পিসী ছুটিয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত দিয়া গান ধরিলেন: বহুদিন পরে বঁধুয়া এল! ছিল প্রাণ তাই দেখা যে হল॥ দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। মথুরানগরে ছিলে তো ভাল? তোমার বিরহে সহিলাম যত। পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত॥

সুরেনবাবু প্রথম যেবার কলিকাতায় মার বাড়ীতে যান, মা তখন কোঠারে। পিসীর সঙ্গে দেখা হইতে গল্প আরম্ভ হইল, ক্রমে সন্ধ্যা। 'এখন আসি, কলকাতায় নূতন এসেচি, রাস্তাঘাট ভুল হয়ে যাবে।'—একথা শুনিয়াই পিসী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন: সে কী গো, তোমরা যে ঠাকুরের ছেলে! ভুল হলেও তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন। আমি একদিন গঙ্গা-দর্শন কত্তে গিয়েচি, রাস্তা ভুলে গিয়ে কিছুতেই পথ পাই না। তখন ঠাকুর এসে আমার হাত ধরে পেঁাছে দিয়ে গেলেন।

স্বভাবতঃ তাঁহার বায়ুপ্রধান ধাত ছিল। ভক্তদের কাছে বলিয়াছিলেন: সারারাত ঘুম হয় না। তাই ঠাকুরকে বলি, ঠাকুর, তুমি দেখ আর আমি নাচি। এই বলে নাচি আর 'ভজ মন গৌরনিতাই' বলি!

তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না; অনেকবার কঠিন অসুখেও ভুগিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বন্দ্বপূর্ণ জগতের ঊর্ধ্বে ভাবরাজ্যে বাস করিতেন বলিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ তাঁহাকে বড় একটা স্পর্শ করিত না। শ্রীশ্রীমার শরীর থাকিতেই তিনি অভীষ্ট আনন্দলোকে প্রয়াণ করেন।

শ্রীস্বামিজী ও শ্রীমহারাজের কথা

ঠাকুরের দুই প্রধান অন্তরঙ্গ শ্রীনরেন্দ্র ও শ্রীরাখাল (স্বামিজী ও মহারাজ) শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে আসিলে প্রায়ই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।

শরৎ মহারাজকে অতুল চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনারা যে মাকে এত ভক্তি করেন সেটা কি গুরুপত্নী বলে? শরৎ মহারাজ উত্তর দেন: না, তা নয়। ঠাকুর ও মা অভেদ। তবে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করা চলত, মার সঙ্গে চলে না।

স্বামিজী নৌকায় করিয়া হরি মহারাজের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। স্বামিজী বারবার গঙ্গাজল পান করিতেছেন দেখিয়া হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, ঘোলাজল বারবার খাচ্চ, শেষকালে কি সর্দি করে বসবে? স্বামিজী কহিলেন, না ভাই, ভয় করে; আমাদের তো মন – মার কাছে যাচ্চি, ভয় করে![1]

নীলকান্ত চক্রবর্তী-প্রমুখ ভক্তগণকে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলন: স্বামিজী যেদিন মাতৃদর্শনে যাইবেন, পূর্ব হইতেই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। একদিন ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন; পুনঃপুনঃ ডুব দিতে লাগিলেন, যেন কিছুতেই পবিত্রতা আনিতে পারিতেছেন না। শেষকালে যদিও বা উঠিলেন, সেবককে কহিলেন, ওরে আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে। কোনওরূপে মার ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়াছেন, আর চলিতে পারিলেন না; ভাবে বিহ্বল হইয়া গেলেন। মা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার নরেন্দ্রকে তুলিয়া ধরিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

রাঁচিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন: আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামিজী মাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা স্বামিজীর গুণকীর্তন করিয়া কহিলেন তুমি যা করেচ এমনটি আর কেউ করেনি। স্বামিজী কহিলেন: এসব কী ছাইপাঁশ বলচ? এসব আমি করেচি না তুমি করেচ? তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মত লাখো বিবেকানন্দ করতে পার তা আমি জানি না? মা হাসিতে লাগিলেন। [সু]

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: বোসপাড়ার বাড়ীতে আমরা আছি। শুনতে পাচ্চি নীচের তলায় নরেন এসে গোলাপকে বলচে, গোলাপ-মা, আমার বড় খিদে পেয়েচে। গোলাপ গোটাকতক মিছরির টুকরো নিয়ে নরেনের হাতে দিয়েচে। নরেন তো রেগেই খুন। আমি একটা থালায় করে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। নরেন খায় আর বলে: একেই বলি মা। ঠাকুর আঙুলে দেখিয়ে, এইটি আমার বাবুরাম খাবে, এইটি আমার ও খাবে, বলতেন। পুজুরে বামুনের মেয়ে মা কেমন করে এমন হল আমি বুঝতে পাচ্চি না! [বি][2]

---

১ হরানন্দ-কথিত।

২ স্বামীজীর লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ এইরূপ: মায়ের কৃপা আমার উপর লক্ষগুণে বড়—বাপের চেয়ে, মায়ের আশীর্বাদ।…তারকভায়া! আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিলাম, তিনি যেমন আশীর্বাদ দিলেন অমনি হুপ করে সাগর পার। এই বুঝ দাদা! এই শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার দিয়ে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি, মায়ের মঠ হবে বলে।…মায়ের কথা সময় সময় মনে করলে বলি, 'কো রামঃ'—ঐ যে বলছি ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ছিলেন যাহা হয় বল, কিন্তু দাদা, যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও। [সাপ্তাহিক 'ভারত' (১৬ই পৌষ, ১৩৪০) হইতে উদ্ধৃত]

অমৃতানন্দ বলেন: এক বৎসর ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্ত্রীভক্তদের লইয়া মঠে আসিয়াছেন। মহারাজ গেটে দাঁড়াইয়া 'মহামায়ী কী জয়' রবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শঙ্খাদি বাজাইয়া অনুগমন করিল। মা উপরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং নামিয়া আসিয়া, মহারাজের প্রার্থনায় ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনের উপর দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কম্পিতহস্তে রোমাঞ্চিত-কলেবরে ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধুভক্তগণ দুই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং করজোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা তখন চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া—মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে, মহারাজ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে পূর্বাস্য হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—চক্ষে ধারা। সেইদিন মহারাজ, বালকের মত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনটার সময় দেখা গেল, বহুলোক উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর তিনি দুই হাতে তাহাদিগকে আটকাইতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন ও বলিতেছেন, না না, যেতে দেওয়া হবে না—মার কষ্ট হবে। লোকগুলি তাঁহার কথা না শুনিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল, মহারাজের পরিচয় দিয়া বুঝাইয়া বলাতে নিবৃত্ত হইল।

সকালবেলা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, পরদিন মা দেশে যাইবেন। প্রণাম করিয়া মহারাজ নীচে শরৎ মহারাজের ঘরে আসিয়া বসিলেন—ঠিক যেন একটি শিশু। উপর হইতে মিষ্টান্নাদি মার প্রসাদ আসিতেই মহারাজ ভাবের ঘোরে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলেন। সে খাবার নিঃশেষ হইলে মুড়ি-প্রসাদ আসিল। তাহাও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শরৎ মহারাজ সত্বর একথালা কচুরী আনাইলেন। মাকে দেখাইয়া সেই কচুরী মহারাজের সম্মুখে রাখা হইল—মহারাজ খাইয়া যাইতেছেন! তখন 'মহারাজ, আর খেয়ো না, মহারাজ, আর খেয়ো না' বলিতে বলিতে শরৎ মহারাজ সেই প্রসাদ কাড়িয়া লইয়া নিজে খাইতে লাগিলেন এবং অন্য সকলকে তদ্রূপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে সেই প্রসাদ তাড়াতাড়ি নিয়া নিঃশেষ করিলে মহারাজ কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। [ম]

বিভূতিবাবু বলেন: ৺কাশীতে মহারাজ প্রতিদিনই সকালবেলা শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আসিতেন ও উড়িয়া চাকরটির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিতেন। কখনও উপরে মার কাছে যাইতে দেখি নাই। মহারাজ নীচের বারান্দায় আসিলেন, মাও শুনিলেন, ইহার অধিক আর কিছু দেখিতাম না। কেবল একদিন দেখিয়াছি হাওড়া স্টেশনে। মা জয়রামবাটী যাইতেছেন, মহারাজ ভুবনেশ্বরে; প্লাটফরমের একদিকে মার গাড়ী দাঁড়াইয়া, অন্যদিকে মহারাজের; মার গাড়ী সাড়ে নয়টার ছাড়িবে, মহারাজের দশটা ছয় মিনিটে। স্টেশন সাধু ও ভক্তে পরিপূর্ণ। গাড়ী ছাড়িবার একটু আগে মহারাজ মার গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। দাঁড়াইয়া, মার দিকে সম্পূর্ণরূপে না তাকাইয়া—মার তখন মাথায় ঘোমটা—বলিলেন, মা, আপনাকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে, আমি ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের বেশ ভাল মঠ করেচি। মা ঘোমটার ভিতর হইতে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। সে কী দৃশ্য! সে মিলন ধ্যানের বস্তু।

চন্দ্রমোহন দত্ত লিখিয়াছেন : একদিন বৈকালে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতেই হঠাৎ মনে হইল, মহারাজ তো একদিনও এখানে আসিয়া মাকে প্রণাম করেন না। বলিলাম, মা, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ, খোকা মহারাজ, হরি মহারাজ সকলেই আপনাকে প্রণাম করে যান, মহারাজ আসেন না কেন? মা কহিলেন, রাখাল যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমাকে যখন ইচ্ছা করে তখুনি দেখতে পায়।

সুখবালা ঘোষ বলেন : একদিন আমি যখন শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আছি, মহারাজ আসিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া মা দোতলার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ উপরে গেলেন না। তিনি ও শরৎ মহারাজ, দুই বিরাট মহাপুরুষ, উঠানে পাশাপাশি দাঁড়াইলেন ও উপরের দিকে না তাকাইয়া, যুক্তকর নিজেদের মস্তকোপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিয়া চিত্রার্পিতবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। আমার বোধ হইতেছিল সমস্ত বাড়ীখানিই যেন হিমালয়-প্রমাণ গাম্ভীর্যে ভরিয়া গিয়াছে।

যাঁহারা বিবরণ দিয়াছেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধুগণ : অব্যয়ানন্দ, অমৃতানন্দ, অরূপানন্দ, অসিতানন্দ, ঈশানানন্দ, ঋতানন্দ, কেশবানন্দ, কৈবল্যানন্দ, গিরিজানন্দ, গৌরীশানন্দ, জগদানন্দ, জপানন্দ, তন্ময়ানন্দ, তপানন্দ, তারকেশ্বরানন্দ, ত্র্যম্বকানন্দ, ধর্মানন্দ, ধ্রুবানন্দ, নিত্যানন্দ (কানপুর), পরমেশ্বরানন্দ, প্রণবানন্দ, প্রশান্তানন্দ, প্রাণাত্মানন্দ, প্রেমেশানন্দ, বরদানন্দ, বাসুদেবানন্দ, বিশ্বেশ্বরানন্দ, ব্রজেশ্বরানন্দ, ভজনানন্দ, মহাদেবানন্দ (আরারিয়া), মহেশ্বরানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দ, রামানন্দ, শৈলানন্দ, শ্যামানন্দ (রেঙ্গুন), সৎসঙ্গানন্দ, সাধনানন্দ, সারদেশানন্দ, সিদ্ধানন্দ, স্বরূপানন্দ, হরানন্দ।

কাশী : শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, সরযূ সেনগুপ্ত, প্রিয়বালা দেবী।

পাটনা : চারুবালা, জিতেন্দ্র চৌধুরী বি-এ ; উপেন্দ্র রায়।

রাঁচি : শশিভূষণ ঘোষ এম-এ, ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত বি-এ, গৌরীকান্ত বিশ্বাস।

পুরুলিয়া : রাজেন্দ্রলাল দে। সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাগদা। ব্রজেশ্বরী দেবী—পুঞ্চা।

জামসেদপুর : মাখনলাল দত্ত।

ভুবনেশ্বর : তারাসুন্দরী।

কটক : কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ; রাজলক্ষ্মী দেবী। হরিবল্লভ ঘোষ জামালপুর।

সম্বলপুর : সুশীল সরকার।

মেদিনীপুর : মহিমচন্দ্র দত্ত বি-এল। ভূষণচন্দ্র পুইল্যা—দাঁতাল-চাঁদাবিলা। শবাসনা দেবী ; দুর্গাদেবী, ডাঃ নলিনবিহারী সরকার—চন্দ্রকোণা। শম্ভুচরণ মণ্ডল—দেউলকুন্দরা। হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—খড়্গপুর। সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা—খাগড়াবনী। নগেনবালা সিংহ—ছেনিয়াগড়।

বাঁকুড়া : রোহিণী, কমলা, বিভূতিভূষণ ঘোষ বি-এ; রাজেন্দ্র দত্ত; নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কালীকুমার মুখোপাধ্যায়; ইন্দুমতী দেবী, সুবাসিনী দেবী; আহ্লাদিনী ঘোষ—জয়রামবাটী। রাধারাণী, মন্মথ চট্টোপাধ্যায়—তাজপুর। যামিনী দেবী, নন্দরাণী দত্ত, প্রমীলা বসু, হরিপদ মাঝি কোয়ালপাড়া। রাখাল নাগ—কোতুলপুর। গোপালকিঙ্কর সেন বাজে ময়নাপুর।

হুগলী : কৃষ্ণময়ী দেবী—কামারপুকুর। সুগন্ধা, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ শ্যামবাজার। লক্ষ্মণ চট্টোপাধ্যায় নবাসন। ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়-আরামবাগ। তুলসীরাম ঘোষ, শান্তিরাম ঘোষ—আটপুর। গোকুলদাস দে এম-এ -মশাট।

বর্ধমান : ভবদেব ঘোষাল। ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় আসানসোল। উপেন্দ্র সরকার বি-এ—সীতারামপুর। রামচন্দ্র মজুমদার কুমারপাড়া।

হাওড়া : ডাঃ হারাণ মুখোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণপুর।

কলিকাতা : 'শ্রীম' নিকুঞ্জদেবী ১৩-২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। গণেন্দ্রনাথ - ৫-১এ বীরচাঁদ গোসাঁই লেন। কিরণ দত্ত—১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। প্রমীলাবালা বসু—৫৮বি রামকান্ত বসু স্ট্রীট। নরেশ ঘোষ—৫৯-২ রামকান্ত বসু স্ট্রীট। কুসুমকুমারী দেবী ১২ বৃন্দাবন পাল লেন। সুখবালা, অঘোর নাথ ঘোষ এম্-বি পি ২০ নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট। দুর্গাপদ ঘোষ এম্-বি। আশুতোষ মিত্র। নরেশ চক্রবর্তী এম্-এ—৭-১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন। হেমপ্রভা কাঞ্জিলাল—১২২ বি ল্যান্সডাউন রোড। হিরণ্ময়ী ঘোষ—২৫ হিন্দুস্থান রোড।

নদীয়া : ডাঃ রতিকান্ত মজুমদার কুষ্ঠিয়া।

যশোহর : প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার বি-এ—মহেশপুর। চপলা, নলিনীকান্ত বসু—দীঘলিয়া।

খুলনা : অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্র ঘোষ—মহেশ্বরপাশা।

বরিশাল : ডাঃ সুরেন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেন্দ্র সেন, মহেন্দ্র গুপ্ত বি-এস্‌সি। কৈলাসকামিনী রায়। আশুতোষ সেনগুপ্ত বি-এ—ভারুকাঠি।

ফরিদপুর : সুরমা, শ্রীশ ঘটক—বিঝারি। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ—কাশ্যপপাড়া।

ঢাকা : যোগেশ ঘোষ বি-এল। লক্ষ্মীকান্ত দত্ত—৩ ঈশ্বরদাস লেন। নিরুপমা রায়—তেওতা। তারকনাথ রায়চৌধুরী—বালিয়াহাটি। সুশীলা, ডাঃ উমেশ দত্ত—বড়ালিয়া। মাখনলাল সেন বি-এ—সোনারং। অশ্রুমতী, ব্রজনাথ সেন বি-এ—নেত্রাবতী। গিরিজা গুপ্তা—আউটসাহী। স্নেহলতা সেন—মধ্যপাড়া। গুরুনাথ নাথ—পশ্চিমপাড়া। শচীবালা, সুরেন্দ্র সরকার—ধীপুর। চন্দ্রমোহন দত্ত—গাউপাড়া। নিশিকান্ত মজুমদার—মুলচর। জিতেন্দ্র দত্ত এম্-এ—মান্দাইল।

ময়মনসিংহ ঃ ডাঃ নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্ম্মণ—শ্যামগঞ্জ। কাশীনাথ রায়বর্ম্মণ—কুতবপুর। রাজনারায়ণ সাহা—কুল্লাগড়া। ডাঃ বসন্ত সরকার—গফরগাঁও। পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক—জোয়াইর। সুরেন্দ্র, শৌর্যেন্দ্র মজুমদার ; নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী বি-এ—ধারিন্দা। কিশোরীমোহন ভৌমিক বি-এল—খড়িপপাড়া ; প্রিয়ংবদা মজুমদার—ধনকোরা। পীতাম্বর নাথ—মির্জাপুর। সুরেশ ঘোষ—সহস্রাম।

পাবনা ঃ সুরমা, কালীপদ রায় বি-এ ; ডাঃ সারদাকিঙ্কর রায়—সিরাজগঞ্জ। নগেন্দ্র চক্রবর্তী, যতীন্দ্র রায়—বাণীগ্রাম। ধীরেন্দ্র ভৌমিক—কানসোনা।

চট্টগ্রাম ঃ রমণীমোহন চৌধুরী এম্-এ—মলিয়াইস। সুরেন্দ্রনাথ রায়—খৈয়াছড়া।

নোয়াখালী ঃ যদুনাথ মজুমদার—চণ্ডীপুর।

ত্রিপুরা ঃ প্রফুল্লমুখী বসু—কুমিল্লা। সারদারঞ্জন দত্তগুপ্ত বি-এ—পাইকপাড়া।

শ্রীহট্ট ঃ লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী—ঢাকাদক্ষিণ। যতীন্দ্র দত্ত—সুপাতলা। অতুলচন্দ্র চৌধুরী বি-এ—দেবশ্রী। কর্ণাটকুমার চৌধুরী—ব্রাহ্মণডোরা।

শিলং ঃ নগেন্দ্র চৌধুরী এম্-এ।

সারবান গাছ বিলম্বে বাড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। ঈশ্বরাবতার বলিয়া নরদেবগণের প্রভাব সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে খাটে। প্রকটকালে মুষ্টিমেয় তাঁহাদিগকে জানিতে বুঝিতে পারে; কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে, কালপ্রবাহে যুগযুগ লীন হইয়া যায় অতীতের গর্ভে, তাঁহাদের মহিমা ততই উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রতিভাত হইতে থাকে, তাঁহাদের চিন্ময় বিগ্রহ ততই পূজার অর্ঘ্য পাইতে থাকে মানবহৃদয়ে ইষ্টদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া। শ্রীরামচন্দ্রকে বারজন ঋষি মাত্র ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ঈশা বা খ্রিস্টকে বারটি জেলে। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের সম্বন্ধেই একথা সমভাবে সত্য। আর তাঁহাদের চিচ্ছক্তিরূপিণী, তাঁহাদের স্বরূপ হইতে অভিন্না সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া বা শ্রীসারদা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

স্থির শোভন অবগুণ্ঠনে গুণ্ঠিতা যে মাকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটকালে তাঁহার অনেক ভক্তই চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই, বুঝিতে পারা তো দূরের কথা, ঠাকুরের তিরোভাবের পরে তাঁহার স্বরূপের আবরণ অতি ধীরে উন্মোচিত হইতে থাকে। এখনও যে উহা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়াছে একথা বলিতে পারা যায় না; তবে খানিকটা হইয়াছে নিশ্চয়ই, নতুবা আমরা সকলে মিলিয়া সকলকে লইয়া তাঁহার শতবর্ষ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিতে উৎসাহিত হইতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে তাঁহার এক গুরুভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন, 'মা-ঠাকুরাণী যে কি বস্তু তা আজও বুঝতে পারিনি, এখনও কেহই পারচে না, ক্রমে পারবে ভায়া! শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অপমান সেখানে হয় বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' আবার শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে তাঁহাকে অভিন্ন জানিয়া কিংবা যুগলীলা-বিস্তারে, জীবোদ্ধারে বা জাতির সমুন্নয়নে শ্রীরামকৃষ্ণ হইতেও তাঁহার প্রয়োজন সমধিক বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার শ্রেষ্ঠ বাহক স্বামিজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ভাষায় ঐ একই পত্রে লিখিয়াছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। বাপ এসেছিল মায়ের সেবার জন্য, মায়ের ছেলে ডেকে আনতে আবার কি। মায়ের গোলাম বাপ, দাদা! মাপ করবে— দুটো খোলা কথা বলে ফেল্লুম। এ মায়ের দিকে আমি একটু গোঁড়া, মায়ের হুকুম হলেই বীরভদ্র সব করতে পারে।' [সাপ্তাহিক 'ভারত'—১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ হইতে উদ্ধৃত।]

অবতার - জগদ্‌গুরু। আত্মবিস্মৃত মানবকে তিনি সম্বিৎলাভের পথ দেখান, পথে চলিবার শক্তি দেন, নিরলস সাধনায় ভবিষ্যৎ মানবের জন্য প্রচুর পরিমাণে সেই শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখেন। শুদ্ধ আধাররূপ প্রণালীসমূহ দ্বারা বাহিত হইয়া মহাশক্তি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া লোককল্যাণ করিয়া যায়। শাস্ত্রীয় তথ্য হইতে অবতার-জীবনের কার্যপ্রণালীকে মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত করা চলে। একটি— জ্ঞানদানে মুমুক্ষু জীবের মুক্তিসাধন বা ভাগবত-রসাস্বাদন করাইয়া ভক্তের বাসনাপূরণ; অপরটি

সমাজে চারিত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা। প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবনে যে কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয় সহজভাবে, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেও তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যায় আপনা হইতে। ভগবান বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং তাঁহাদের অনুগামী দেশের বা সমাজের রূপায়ণ হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে।

অবতার-পুরুষগণের সমুদয় প্রেরণার আধাররূপিণী হইয়াও তাঁহাদের স্বরূপশক্তিরা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সংস্পর্শে আসেন নাই। শ্রীসীতা-প্রমুখ শক্তিরা পতির তিরোভাবের পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীসারদা দেবীর জীবন বহুলাংশে ইহার ব্যতিক্রম। ঠাকুরের প্রকটকালে সর্বকর্মে—সেবায়, সাধনায়, সাহচর্যে যেমন তিনি তাঁহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধা, তেমনি তাঁহার তিরোভাবের পরেও ইহলোকে থাকিয়া দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তাঁহারই অভিপ্রেত কর্ম-সাধনে নিরতা। সর্বপ্রযত্নে একান্তমনে তিনি সেই কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রেত কর্মটি কী, পূর্ব পূর্ব অবতারশক্তিগণের সহিত ব্যতিক্রমের কারণই বা কী, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন; সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।' আজন্ম মাতৃস্তন্যে মাতৃস্নেহে বর্ধিত জীবকে কেহ মাতৃভাব শিখাইবে, ইহা অর্থহীন মনে হইতে পারে। এখানে মাতৃভাব বলিতে জগৎকারণের বা ঈশ্বরের মাতৃভাব--তাঁহার জগদ্ধাত্রীস্বরূপ।

মানব-সভ্যতার অন্য সকল অঙ্গের ন্যায় উহার উত্তমাঙ্গস্বরূপ ধর্মও ক্রমিক অভিব্যক্তি লাভ করে। শক্তি-সাধনার পীঠভূমি বঙ্গদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ সাধনার যে ক্রমবিকাশ হইতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণে উহার পূর্ণ পরিণতি। এমন বিশুদ্ধ মাতৃভাবের সাধনা জগৎ পূর্বে আর কখনও দেখে নাই। জগন্মাতায় একান্তভাবে নির্ভরশীল বালক মায়েরই ইঙ্গিতে আজীবন চালিত হইয়াছেন, সকল ধর্মের সকল ভাবের সাধনা করিয়া সেই সেই ধর্ম ও ভাবের অনুগামীরা কিভাবে তাঁহারই মাকে ডাকে ও ডাকিয়া পায় জানিয়া লইয়াছেন, সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন, এবং অন্তিমে তাঁহার প্রিয় মাতৃনাম-কালীনাম উচ্চারণ করিয়া মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তাই সর্বভাবসমন্বিত হইলেও মাতৃভাবপ্রধান। শ্রীসারদা তাঁহার সেই দেবীমায়ের মানবী রূপায়ণ--মানবী-মায়ের ভূমিকায় জগন্মাতার অবতরণ।

দুর্বল মানুষ, শতদোষে দূষিত ধূলিকাদা-মলিন কলির মানুষ একান্তভাবে অসহায়। রোগে শোকে কাতর, পাপে তাপে জর্জরিত মানুষকে সকলেই যেখানে পরিত্যাগ করে, এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত, সেখানে গর্ভধারিণী বাঁচিয়া থাকিলে সন্তানকে কোলে নিতে ছুটিয়া আসেন, স্নেহবারি সিঞ্চনে তাহার সকল জ্বালা সকল মলিনতা জুড়াইয়া মুছাইয়া দিতে চাহেন, যদিও তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শক্তির সসীমতার জন্যই পার্থিব জননী সকল অবস্থায় সন্তানের নির্ভরের স্থল হইতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি নিজেও সকল অভাব হইতে নির্মুক্ত নহেন। শিশুর পক্ষে জননীর ন্যায় সর্বাবস্থায় নির্ভর করিবার মত, অথচ সর্বশক্তিসমন্বিত, সকল অভাব দূরীকরণে সমর্থ একটি মায়ের কামনা বুঝি বা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছিল। কালী-মা, দুর্গা-মা, জগদ্ধাত্রী-মা, এমন অনেক দেবী-মাই আছেন; কিন্তু যেহেতু তাঁহারা দেবী,

সেই হেতু সাধারণ মানুষের দুরধিগম্যা, যেহেতু তাঁহারা করাল-মধুরা, সেই হেতু ভয়-ভক্তির পাত্রী। মানুষ নিজে যতক্ষণ দেবত্বলাভ করিতে না পারিতেছেন ততক্ষণ সে দেবতাকে ভক্তি করিলেও ভালবাসিতে পারে না—তাঁহার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কহিয়া, তাঁহাকে নিজের সুখদুঃখের ভাগী করিয়া জড়াইতে পারে না। মানুষের এই চিরদিনের অভাব ঘুচাইবার জন্য, মানবীয় আধারে মানবীর আকারে নিখিল মায়ের মমতা, ধৈর্য ও আকুলতা লইয়া জগন্মাতা তাঁহার স্নেহকোমল বাহু প্রসারিত করিয়াছেন। সহজ বিশ্বাসে, হে মানুষ ভাই, তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কি? কর্মদোষে অবসন্ন হইয়া, মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইয়া একদিন তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারই প্রসাদে সে কাতরতা, সে ভয় কোথায় যে গেল খুঁজিয়া পাই না। আমার অবস্থা যদি তোমার কখনও হয়, আর হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, তখন তুমিও একবার এই মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিবে কি? এই শঠতা-কপটতাপূর্ণ সংসারে তাপিতের প্রকৃত দরদী তোমার পরমাত্মীয়কে চিনিয়া লইবে কি? সহস্র সহস্র নরনারী যাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, ডাকিয়া জুড়াইয়াছে, ইহপরকালের সকল দায় যাঁহাকে দিয়া চিরতরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, এমন আর একটি মায়ের ঐতিহাসিক নজীর দেখাইতে পার? এই মহীয়সী মাতা কালে নিখিল মানবের হৃদয়ে কতখানি পূজার স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশের পূর্ণ পরিণতি কী আকার ধারণ করিবে, তাহা আজ কল্পনায় অনুভবের বিষয়। একবার মাত্র পিতৃ-সম্বোধন করিয়া নরঘাতী দস্যুকে যিনি দেবতায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার দয়াগুণে প্রভাবিত হইয়া তস্করেরা চৌর্যবৃত্তি পরিহার করিয়াছিল, যাঁহার সান্নিধ্যে মন শান্ত হইত, পাপী-তাপী সন্তাপ ভুলিত, যাঁহার দর্শনে ভক্তের অন্তর বিমলানন্দে ভরিয়া উঠিত, তাঁহার কথা তাঁহার মহিমা বলিয়া বুঝাইতে পারি সামর্থ্য কোথায়?*